নতুন জনপদ

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী

প্রথম সংস্করণ : এক হাজার
আশ্বিন, ১৩৭১ : অক্টোবর, ১৯৬৪

প্রকাশক :
ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২
৯৪ সাউথ মালাকা, এলাহাবাদ-১
১১ ওক্ লেন, ফোর্ট, বোম্বাই-১

মুদ্রক :
ভূপেন্দ্রনাথ ভৌমিক
রূবী প্রিন্টিং হাউস
৪০/১বি শ্রীগোপাল মল্লিক লেন
কলকাতা-১২

প্রচ্ছদশিল্পী
গণেশ বসু

উৎসর্গ

মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামের

শহীদ ও সৈনিকদের উদ্দেশ্যে।

লেখকের কথা ঃ

এই 'নতুন জনপদ' উপন্যাস লেখার একটু ছোট্ট ইতিহাস আছে। বেশ কয়েক বছর আগে উপন্যাসটির কিছুটা লিখে ফেলে রেখেছিলাম! বহু অসমাপ্ত কবিতার মত এরও মৃত্যু একান্ত অবধারিত ছিল। এমন সময় ঘটনাচক্রে আমাকে শ্রদ্ধেয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে কলকাতার বাইরে কোথাও যেতে হয়েছিল। এক অবসর মুহূর্তে কথা প্রসঙ্গে আমার এই উপন্যাসটির কথা তাঁকে বলেছিলাম।

উপন্যাসের পটভূমির এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে কিছু নতুনত্ব আছে দেখে প্রেমেনদা উৎসাহবোধ করেছিলেন। তিনি বললেন, লেখাটা একবার দেখাবে ত ?

ভয়ে ভয়ে অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপিটি একদিন তাঁকে দিয়ে এসেছিলাম।

তারও কিছুদিন পরে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, লেখাটার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা ?

তিনি যা বলেছিলেন, তা আমার কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল এবং এই ভূমিকায় তা উল্লেখ করলে, বইটির পক্ষে প্রচার-কার্য হয়ে দাঁড়াবে। যাইহোক, তাঁরই নির্দেশে আমি উপন্যাসটি শেষ করি এবং তাঁকে আবার পড়তে দিয়ে আসি।

একদিন গিয়ে শুনে অবাক হ'লাম, 'বিংশ শতাব্দী' পত্রিকা ধারাবাহিকভাবে এটি প্রকাশ করতে রাজি হয়েছে। আমি যেন ওদের কাছে পাণ্ডুলিপি দিয়ে আসি।

এই দিনটি আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে।

প্রকৃতপক্ষে 'নতুন জনপদ'-ই আমার প্রথম উপন্যাস। রচনাকাল ১৯৫৮-৫৯ সাল। অর্থাৎ আজ (১৯৫৯) থেকে আট ন'বছর আগেকার লেখা। একজন লেখকের জীবনে সময়ের এই পরিধিটুকু আদৌ অনুল্লেখ্য নয়। এই সময়ের মধ্যে জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাধারা ও লেখার আঙ্গিকের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারায় আজও পরিবর্তন ঘটেনি। আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে আপাতঃ ব্যর্থতা সত্ত্বেও আমি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশ্বাসী এবং আশাবাদী। 'নতুন জনপদ' সেই প্রত্যাশা ও প্রতিশ্রুতি বহন করেছে।

বইটি প্রকাশের পূর্বে, প্রকাশক শ্রদ্ধেয় শ্রী ডি. মেহ্‌রা এবং আরো কয়েকজন বিশিষ্ট শ্রোতা সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটি শোনেন। শ্রীযুত মেহ্‌রার কথা : শুধু সাহিত্য নয়, এর মধ্যে দেশকে ভালোবাসার কথা আছে, যা আজকাল প্রায় শোনা যায় না।

তাঁর কাছে আমি সত্যই কৃতজ্ঞ।

॥ ১ ॥

শেষ বাস থেকে যখন নমিতা নামল, তখন কালিনগরের নদী আর দূরের গ্রামগুলিতে অন্ধকার নেমেছে।

উঁচু লোনামাটির পাড়টায় দাঁড়িয়ে যতদূর দেখা যায়, ভাল করে চেয়ে চেয়ে দেখল সে। না, নদীর ধূসর শোভা দেখতে নয়। সে দেখছিল, যদি শেষপর্যন্ত নৌকোটা এসে যায়! কেমন যেন ভয় করতে লাগল তার! পথে আসতে আসতে রাস্তার দু'ধারে এ দেশের যে চলমান ছবি সে দেখেছে, তাতে তাকে নিরাশ হতে হয়েছে। চারদিকে একটা ম্লান, দরিদ্র পরিবেশ। নমিতা ঠিক এ দৃশ্য দেখবে বলে আশা করেনি।

নমিতা আর একবার নদীর দিকে তাকাল। অনেক দূরে একটা নৌকোর ছায়া জোয়ার ঠেলে ঠেলে অন্ধকারে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে না? হ্যাঁ, তাইত!

যাক্। নমিতা নিশ্চিন্ত হল। একটু অবসর পেয়ে ভাবতে লাগল, স্কুল থেকে নৌকোটা না পাঠালে সে এই নদীর ধারে কেমন করে রাত কাটাত? থাকার মধ্যে আছে কেবল একটা চায়ের দোকান। তারও অবস্থা দুর্ভিক্ষের দিনের মত। বড় জোর তাতে খানিকটা চিড়ে-মুড়ি পাওয়া যাবে। এই দিয়ে রাত্রির খাওয়া না হয় হল। কিন্তু থাকা? কোথায় থাকত সে? না, এতদূরে হঠাৎ এইভাবে এই দুর্গম পল্লীতে, তার চাকুরী করতে আসা উচিত হয়নি, যদিও সুযোগটা ভালই। আগের স্কুলের চেয়ে মাইনে অনেক বেশি। 'স্পেশ্যাল পে'ও আছে।

নমিতার আর ভাবতে ভল লাগে না। যাক্ এসব।

আজকের মত অন্তত: সে নিশ্চিন্ত।

নৌকোটা আসছে।

বাস রাস্তার ধারে সেই ছোট্ট চায়ের দোকান। সামনে একটা

১

সরু শীর্ণ বেঞ্চ পাতা। দোকানের কাছে যেতেই এক ভদ্রলোক উ'ঠে দাঁড়ালেন।

'না না, আপনিও বসুন', নমিতা বলল।

'ওটা নির্ভরযোগ্য নয়।'

নড়বড়ে বেঞ্চটাব একধারে আরো কিছু জিনিস ছিল।

নমিতা এই সুদূব মফঃস্বলে এই ভদ্রলোকের মার্জিত উত্তব আব কথা বলাব ভঙ্গী শুনে, কি ভেবে তার দিকে তাকিয়ে দেখল। সুন্দর দীর্ঘ পবিচ্ছন্ন চেহারা। কোথায যেন একটা আকর্ষণীয ব্যক্তিত্ব আছে। না, উনি নিশ্চয়ই শহব থেকে আসছেন। ট্রাউজারেব আভিজাত্য এখনও অক্ষত।

নমিতা দেখল, ভদ্রলোকটি নদীর পাড়ে গিযে দাঁড়াল। দূরে তাকিয়ে কি যেন দেখল। তারপব ফিবে এল দোকানেব দিকে।

নমিতাব চা খেতে সত্যি ইচ্ছে করছিল।

দোকানদাব গোপাল তাব ঘোলাটে কাঁচেব গ্লাসটা দিদিমণিব জন্য ভাল কবে ধুতে লাগল।

খেয়াঘাটেব একটু দূরে এসে নৌকোটা থামতে, নমিতা হোল্ডঅল আব সুটকেশটা কুলিব মাথায চাপিযে নদীতীরে এসে দাঁড়াল।

'এই মাঝি, তুমি নীলাপুর থেকে আসছ না?'

মাঝি যেন আকাশ থেকে পড়ল।

'সে কি?' নমিতা একটা বড় আঘাত খেয়ে থমকে গেল। একবার অসহায় চোখে কুলির দিকেও তাকাল।

এই সন্ধ্যার নদীব অনাত্মীয় অন্ধকারে, একটি নিরাশ্রয়, দুর্বহ রাত্রির কথা ভেবে এই মুহূর্তে নমিতার ভীষণ কান্না পাচ্ছিল।

কুলি তাড়া দিল, 'মালপত্তর কতক্ষণ মাথায় বাখব, মা? যা হয় একটা করে ফেলুন চট্ করে।'

নমিতা কি করবে কিছু বুঝতে পারল না। শুধু বিমূঢ় হয়ে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে রইল।

ভদ্রলোকটি নদীর পাড় থেকে নেমে নৌকোর কাছে আসতে মাঝি বলল, 'মালপত্তর কোথায় ?'

'ওপরে আছে, নিয়ে আয়।'

মাঝি উঠে গেল নৌকো থেকে।

নমিতা অনেক সংকোচের সংগে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, আর কোন নৌকো আসতে পারে না এখন ?'

'বোধহয় না। জোয়াব হয়ে গেছে।'

নমিতা একটু চুপ করে গেল।

'আচ্ছা, ফিরে যাওয়ার বাস বোধহয় সেই ভোব পাঁচটায় ?'

'ঠিক পাঁচটায় নয়, একটু আগে।'

নমিতা অত্যান্ত চিন্তিত হয়ে উঠল। তাহলে এখন কোথায় থাকবে সে ?

ভদ্রলোকটি জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবেন আপনি ?'

'দেখুন,' নমিতা বলল, 'আমি নীলাপুর গার্লস স্কুলের হেডমিসট্রেস। এই নতুন 'অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট' পেয়ে যাচ্ছি। স্কুল থেকে আজ নৌকো পাঠানর কথা। সেক্রেটারীকে লিখেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি'— নমিতা থামল।

মাঝি তাড়া দিল, 'জোয়ার লেগে গেছে। ওদিকে আবার যেতে যেতে ভাঁটা হয়ে যাবে।'

নমিতার দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক কি যেন একটু ভাবল। বলল, 'আমাকে কিন্তু নীলাপুর হয়েই যেতে হবে।'

নমিতা একটু আশার আভাস পেল। কিন্তু সংকোচ কাটিয়ে উঠে বলতে পারল না, তাকে পৌঁছে দিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে কি না তাঁর ?

মেঘলা অন্ধকার জমে জমে নদীতীর ক্রমশঃ নির্জন হয়ে উঠছে এখন।

'দেখুন, আপনার আপত্তি না থাকলে, আপনাকে আমি নীলাপুরে নামিয়ে দিয়ে যেতে পারি।'

নমিতা আশ্চর্য হয়ে তাকাল একবার।

এখন আবছা জ্যোৎস্নার আলো আর অন্ধকারে-মেশা নদী দিয়ে নৌকোটা জোয়ারের স্রোতে ছুটে চলেছে। শুধু অস্পষ্ট চোখে পড়ছে ছু'পারের বনঝাউ গাছগুলি, রাত্রিটা যেখানে স্তব্ধ হয়ে বিছিয়ে আছে।

'আপনার কোন পরিচয় পাইনি,' নমিতা নদীর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'আচ্ছা, আপনি কি কোন কলেজের অধ্যাপক?'

'না। আমি অধ্যাপক নই।'

'তবে?'

'আমি একজন ডাক্তার।'

উত্তর শুনে নমিতা খুশি হল কি না বোঝা গেল না!

অনেকদূর চলে এসে ঐ যেখানে তিনটে ছোট নদী একসংগে এসে মিশেছে, সেখানে তীব্র ঘূর্ণি স্রোতে নৌকোটা হঠাৎ একবার কাৎ হয়ে পড়ল। নমিতা এই বিপর্যয়ের জন্য তৈরী ছিল না, সে অভ্যস্তও নয়।

অসিত বলল, 'লাগল নাকি?'

'একটু, তেমন কিছু নয়।'

'কোথায় লেগেছে?'

'হাত দিয়ে ধরতে গেছলাম। বাঁশের বাখারির শিরায় কেটে গেল বোধহয়।'

নমিতা সেই অবছা অন্ধকারে আঙুলটা দেখতে চেষ্টা করল।

'কতখানি কেটেছে, দেখি?' অসিত টর্চ জ্বালল।

অন্ধকারগুলো সরে যেতে একটি আশ্চর্য সুন্দর শুভ্র মুখ চোখে পড়ল অসিতের। অপূর্ব চোখ ছু'টি ঘন পল্লবে ঘেরা; অতল দীঘির মত শান্ত, নির্জন।

'ও কিছু নয়। আপনি ভাববেন না।'

'আমি কিন্তু ডাক্তার, মিস্ দাশগুপ্তা?'

গলার স্বরটা শুনে নমিতা চমকে অসিতের মুখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করল।

ততক্ষণে অসিত ফ্লাস্কের গ্লাসে ডেটল জল করে রুমালটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'জায়গাটা ধুয়ে নিন।'

নমিতা একটু হেসে জিজ্ঞেস করল, 'এরপর টিটেনাস ইনজেকশান দেবেন নাকি ?'

অসিত কোন উত্তর দিল না।

নৌকোর অন্ধকারটা ডেটলের গন্ধে ভারি হয়ে উঠছিল।

সহজ পরিচয় আর পরিবেশের মধ্যে, রাত্রিটা অনেকদূর এগিয়ে গেছে কখন। নীলাপুরের পুলটাব কাছে যেখানে পীচ রাস্তা হবে বলে শোনা যাচ্ছে, নৌকোটা সেখানে বাবলা বনটার কাছে এসে থামল।

'ঐ আপনার স্কুল। ঐখানে আপনাকে নামতে হবে।'

'আপনি ?'

'আমাকে আবও ওপবের দিকে যেতে হবে।'

'আবও ওপবের দিকে ? কখন পৌছবেন বাড়ীতে ?'

'বাত প্রায় দুটোয়।' একটা ঘাসের চাপড়া দেখিয়ে অসিত বলল, 'ঐখানে পা দিয়ে নামুন, কাদা লাগবে না।'

নমিতা ধীরে ধীবে উঠল। কিন্তু আশ্চর্য, এই মুহূর্তে তার মন, আবার সেই বাস থেকে নামার সময়টার মত বিষণ্ণ হয়ে উঠছে। সত্যই অজানা জায়গায়, এই রাত্রে কোথায়, কি করে যাবে সে! এতক্ষণ তবু একটা নিশ্চিত আশ্রয় ছিল।

নমিতা নামল ; কিন্তু নেমে দাঁড়িয়ে রইল পাড়ে।

মাঝি জিনিসপত্র তুলে দিয়েছে।

অসিতের মনে হল, ওঁর নিশ্চয় ভয় করছে বা সংকোচ লাগছে যেতে। একেবারে নতুন জায়গা, তা ছাড়া এত রাত্রে কেউ জেগে নেই। কি করবেন, কাকে বা ডাকবেন গিয়ে!

অসিত হঠাৎ স্যুটকেশটা নিয়ে বলল, 'চলুন।'

'বাঃ আপনি নামলেন যে ?'

'একটু এগিয়ে দি, আপনাকে।'

'আপনার যেতে দেরী হয়ে যাবে না আরও ?'

মাঝি হোল্ডঅলটা নিয়ে পিছনে আসতে লাগল।

অসিত আর কোন উত্তর দিল না। নদী-পারের সরু আল

পথটা পেরিয়ে স্কুলের কাছে এসে ডাকল, 'ভুবনবাবু, ভুবনবাবু ?'

কোথাও কোন সাড়া নেই। কেবল বাবলা বনে, নদীতীরে শব্দটা নিষ্ফল প্রতিধ্বনি তুলে আবার মুছে গেল।

অসিত এবার জোরে কড়া নাড়ল।

'কে ? কে ?'

'আমি অসিত।'

'ও, ডাক্তারবাবু। এত রাতে! কী ব্যাপার!' তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ভুবনবাবু বেরিয়ে এলেন।

'আজ নতুন হেডমিসট্রেস আসছেন, কোন চিঠি পাননি ?'

ভুবনবাবু ভ্রু'চোখ কপালে তুললেন, 'চিঠি ? কই, না ত!'

নমিতা বলল, 'চিঠি আমি সেক্রেটারীকে লিখেছিলাম, যিনি এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাঠিয়েছিলেন।'

ভুবনবাবু বললেন, 'সেক্রেটারীবাবু ত আজ ক'দিন বাড়ী নেই। মেদিনীপুরে কোর্টের কাজে গেছেন।'

'তা হোক্, আপনি এঁর থাকার ব্যবস্থা করে দিন।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। এ্যাই নটবর। নটবর! বেটা কুম্ভকর্ণ নাকি রে বাবা! আসুন দিদিমণি, আসুন।' ভুবনবাবু নিজেই সুটকেশ আর হোল্ডঅল নিয়ে আগে আগে চললেন।

সব ব্যবস্থা হয়ে যেতে অসিত চলে যাচ্ছিল। নমিতা বলল, 'অনেক উপকার পেলাম। মাঝে মাঝে আসবেন কিন্তু।'

অসিত নমস্কার করে চলে গেল।

অন্যান্য মিসট্রেসরা ততক্ষণে উঠে পড়েছে। কোয়ার্টারের দোতলার পুব-দক্ষিণের ঘরটা নমিতাকে ছেড়ে দেওয়া হল। নিজের নতুন ঘরের জানলায় এসে নমিতা একটু দাঁড়াল। সামনে দিগন্ত জোড়া রাত্রি আর আকাশ। গ্রাম থেকে দূরে নদী-তীরে এই বিরাট স্কুল বাড়িটা অন্ধকারে একটা সুপ্ত নগরীর মত ঘুমিয়ে আছে এখন।

না, নদীটা মরে যায়নি। স্রোতের বেগ কমে এসেছে। পলিমাটি

জমে উঠেছে দু'ধারে আর জলের তলায়। প্রসারতা আর গভীরতা দুটোই কমে আসছে এখন। লোকে বলে 'মরা নদী'। মুমূর্ষু নদীটা এই নামেই চলে এসেছে কতদিন থেকে।

এই গভীর রাত্রে অদূরে সেই মরা নদীর ধার থেকে আস্তে আস্তে অস্পষ্ট কথাবার্তা ভেসে আসছিল। নমিতা দেখল, অসিত নৌকোয় উঠছে। মাঝি নৌকোটা খুলে স্রোতে ভাসিয়ে দিল। অসিত ভিতরে গেল না, গলুইয়ের উপর বসল।

নমিতা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। ফিরে দেখল, নৌকোটা ধীরে ধীরে ভেসে যাচ্ছে। নমিতা অনেকক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে রইল।

নমিতার কথা অসিতেরও মনে আসছিল। মনে আসছিল একজন অপরিচিতার অসংকোচ, মার্জিত, সুন্দর ব্যবহার। তার কথা বলার ভংগী, উজ্জ্বল মুখ-চোখে একটি নম্র মর্যাদাবোধ। সব কিছু মিলে অসিতের মনে, এই পরিচয়টুকু কী একটা অস্পষ্ট অথচ মধুর স্মৃতির অনুভব রেখে গেছে, যাতে নমিতাকে ভাবতে তার ভাল লাগছে। এই মুহূর্তে তার মনে হল, এখানকার গ্রামের মেয়েদের কথা। কেমন যেন তারা নিষ্প্রভ। জীবনের ব্যাপ্তির কাছে, ওরা বড় অকিঞ্চিৎকর।

অসিত মনে করে, গ্রাম বড় সংকীর্ণ, ব্যাপ্তিহীন। যা বিরাট, যা বিস্তীর্ণ, যাতে বহু মানুষের পদচিহ্ন পড়ে অসিতের তাই ভাল লাগে। এই ব্যাপ্তির, এই প্রসারতার পটভূমিকায়, যখন সে এই সব গ্রাম আর তার মানুষগুলিকে দেখে, তখন তাদের বড় ক্ষুদ্র বলে মনে হয়।

অথচ আশ্চর্য! অসিত তার চিকিৎসক-জীবনের সমস্ত সম্ভাবনাকে নিঃশেষ করে দিয়ে, এই গ্রামেই ফিরে এসেছে। যতই সে খারাপ বলুক, নিন্দা করুক, তবু এই দরিদ্র, নিরক্ষর, এই নিষ্প্রভ মানুষের নির্বাক মিছিল অসিতকে শতপাকে বেঁধেছে। জীবনের যে ব্যাপ্তি অসিতকে পাগল করে তোলে, যে সুদূর তাকে ডাকে, অসিত জানে না সেই জীবনের সবগুলি শিকড় ছড়িয়ে আছে এখানকার এই মাটিতেই। তার আকর্ষণ ঐ কুঁড়ে ঘরগুলির মানুষের দিকে, যাদের

সে গালাগাল দেয়, মূর্খ বলে ; কিন্তু সারা রাত জেগে চিকিৎসা করে ওদেরই বাড়ীতে। ফি'র টাকাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সাইকেলে উঠতে উঠতে বলে, 'টাকাটা রেখে দে। রোগীকে একটু দুধ খাওয়াস, ফল এনে দিস। টাকা দিয়ে আর বড়লোকী দেখাতে হবে না।'

নদী-ধারের শ্মশানটা পেরিয়ে নৌকোটা আবার বাঁক নিতে দূরে বেসিক স্কুলটা চোখে পড়ল। অসিত কতক্ষণ পরে মাঝিকে বলল, 'আমরা এসে গেছি না?'

॥ ২ ॥

একটু বেলায় ঘুম ভাঙল নমিতার। জানলা দিয়ে ততক্ষণে অনেক রোদ এসে পড়েছে ঘরে।

নন্দিতা বলল, 'চা হয়ে গেছে কিন্তু।'

নমিতা স্যুটকেশ খুলে টুথ-ব্রাসটা বের করতে করতে বলল, 'কাল থেকে তোমাকে ভাই দেখছি। পরিচয় হয়নি।'

নন্দিতা হেসে বলল, 'আমি এখানকার এ্যাসিস্ট্যাণ্ট টিচার।'

চা খাওয়া শেষ করে নমিতা নন্দিতাকে বলল, 'চল, তাহলে স্কুলটা একটু ঘুরে আসি।'

ততক্ষণে অন্যান্য মিসট্রেসরাও এসেছেন।

নন্দিতা উমাকে দেখিয়ে বলল, 'এই আমার পার্টনার, নমিতাদি।'

উমা নমস্কার করল।

নমিতা বলল, 'কিসের পার্টনার তোমার?'

'ও, অনেক কাজের। একঘরে থাকি, আর দু'জনে একই পার্টিতে ব্যাডমিণ্টন খেলি।'

উমা বলল, 'পার্টনার কেন, আমাকে ওর লোক্যাল গার্জেনও বলতে পারেন। ও যা ছেলেমানুষ না!'

নমিতা হেসে বলল, 'সে ত প্রথম দেখায় বুঝতে পেরেছি।'

ওরা সবাই মিলে ঘুরে ঘুরে বোর্ডিং, স্কুল দেখছিল। নমিতার বেশ ভাল লাগছে স্কুলটি। তিন দিকে ক্লাস-রুম, একপাশে বোর্ডিং, টিচার্সদের থাকার ঘর। মাঝখানে বাগান। রজনীগন্ধা, যুঁই, বেল-ফুল ফুটে আলো করে রেখেছে বাগানকে। একধারে একঝাড় গোলাপ। কিন্তু এখন গোলাপের সময় নয়। ধারে ধারে দোপাটির সারি। সকালবেলার রোদ মাঝে মাঝে এসে পড়েছে বাগানের সবুজ ঘাসে। দূর থেকে ছাত্রীদের পড়ার শব্দ আসছে। দু'একটি ছাত্রী উঁকি দিয়ে দেখছে ওদের নতুন বড়দিকে।

'এ্যাই, শোন শোন—পালাচ্ছ কেন তোমরা?' কয়েকটি ছাত্রীকে কাছে ডাকল নমিতা।

'ও, তুমি ক্লাস 'টেন'এ পড়?' একটি মেয়ের দিকে তাকিয়ে নমিতা বলল, 'নাম কি?'

'নীলা চৌধুরী।'

'চৌধুরী? সেক্রেটারী—নিশিকান্তবাবু কেউ হন তোমার?'

'উনি আমার বাবা।'

'ও, তাই নাকি? 'যাও, পড় গে।'

নমিতা সব দেখতে দেখতে টিচার্স কোয়ার্টারে যাচ্ছিল।

নন্দিতা হাস্‌তে হাস্‌তে জিজ্ঞেস করল, 'এ ঘরে কে কে থাকে বলুন ত, নমিতাদি?'

'কেন? তুমি আর তোমার পার্টনার।'

কথা বলতে বলতে ওরা সকলে নন্দিতার ঘরে ঢুকল। জানলার ধারে বসল নমিতা। অন্য সকল ঘরের চেয়ে এই ঘরটা ভাল, সুন্দর এবং পরিপাটি করে সাজান।

'তুমি ত গান গাও দেখছি! অনেক গুণ রয়েছে তোমার!' তানপুরোটায় আঙুল রেখে নমিতা বলল।

নন্দিতা বলল, 'গাইতাম।' 'বর্তমানে একরকম গাই না।' নন্দিতা করুণ মুখে কথাগুলো বলছিল।

নমিতা একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন? গাও না কেন?'

'এখন পারি না। খুব অসুখ করেছিল।'

উমা বলল, 'বাঁচার আশা ছিল না।'

ঘরের আবহাওয়াটা মুহূর্তে ভারি হয়ে উঠছিল। নমিতা একটু পরে বলল, 'কি গাইতে?'

'ক্ল্যাসিক্যাল।'

উমা বলল, 'ও ইণ্টারকলেজ মিউজিক কম্পিটিশনে দু'বার ফার্স্ট হয়েছিল।'

'তাই নাকি? তবে ত গুণী মেয়ে।'

ঘরটা আবার কিছুক্ষণের জন্য থমথমে হয়ে রইল।

একটু পরে নমিতা বলল, 'তোমার বাড়ী কোথায়?'

'বহরমপুর।'

'তুমি বহরমপুর থেকে এখানে এলে কি করে? কার সংগে এসেছ?'

'পার্টনারের সংগে, হোস্টেলে থেকে পড়তাম। কিছুদিন হল চলে এসেছি।'

বাইবে এসে দাঁড়াতেই নদীর ধারে সেই বাবলা বনটা চোখে পড়ল নমিতার। এখন ভাটার স্রোত চলছে। মরা নদীর উপর সকালের অজস্র রোদ ছড়ান।

নমিতা কি ভেবে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা উমা, তোমার বাড়ি ত কাছেই? তুমি ডাঃ অসিতবাবুকে জান?'

'বাঃ, অসিতদাকে কেন জানব না? ওঁর বাড়ী আমাদের বাড়ীর কাছেই।'

নমিতা বলল, 'তাই নাকি? এই দেখ, হাতটা একটু কেটে গেছল, উনি রীতিমত ডাক্তারি শুরু করে দিলেন নৌকোয়। স্যুটকেশে সব আছে, ডেটল থেকে আরম্ভ করে কোরামিন পর্যন্ত। কোন কিছুই বাদ দেননি উনি?

নন্দিতা হেসে উঠল, 'একটা মোবাইল ডিসপেনসারিও বলা যায়। না, নমিতাদি?'

॥ ৩ ॥

নমিতার হঠাৎ চলে আসাটা, তার নিজের কাছেই কেমন যেন অবাক লাগে। সেক্রেটারীর কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে, এই অপরিচিত জায়গায় সে চলে এল, কেবল বাড়িতে টিঁকতে পারছিল না বলে। তার শিক্ষা, তার রুচি, তার মান-অভিমান, কোন কিছুরই মূল্য তার পরিবার তাকে দেয়নি। শহরতলির জবরদখল কলোনীর একটা বিষাক্ত পৃথিবী থেকে প্রতি মুহূর্তে নমিতার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল।

বাড়িতে বাবা, দাদা, বৌদি, ছোট ভাই। মা নেই। কয়েক বছর আগেই মারা গেছে। নমিতার মনে হত, শুধু তার পরিবার কেন, এই শহরতলার সমস্ত সমাজটাই কী এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে বিকৃত, বীভৎস হয়ে পচে গলে গেছে। কেবল দারিদ্র্য নয়; দারিদ্র্য থেকেও একদিন মুক্তি পাওয়া যায়, কিন্তু জীবনের পচন থেকে, একটি বিশেষ ক্ষুধার বিকৃতি থেকে মুক্তি কোথায়? সে মুক্তি কি করে আসবে?

নমিতা একবার লজ্জায় মরে গিয়েছিল। তার ক্লাসমেট মালতী বলছিল, 'তোদের এই স্টেশনের পথটা কী জঘন্য, জানিস? মেয়েদের চলাই দায়। দেখ্, সেদিন সন্ধ্যে হয়ে গেছে, রাস্তায় আলোগুলো কি জন্যে জ্বলেনি। য়ুনিভারসিটি লাইব্রেরী থেকে ফিরছি। ওমা, ঐ যে দোকানটা দেখছিস্ না, ওখানে একটা লোক আমাকে দেখে এমন করে মুখে একটা শব্দ করল, জানিস, আমার ভীষণ ভয় করছিল। দেখি, সব দোকান থেকে লোক বেরিয়ে এসে হাঁ করে তাকিয়ে আমাকে দেখছে। লোকটার বয়েস পঞ্চাশ-ষাট হবে। সত্যি নমিতা, কি হল বল ত দেশের! লোকটার বয়স আমার বাবার বয়সের মত!'

নমিতা এক কঠিন বেদনায় চুপ করে রইল। মালতী জানে না, ঐ দোকানটা তার বাবার। দেশ ছেড়ে চলে আসার পর ঐ দোকানটা

করেছে সে। বিক্রীর অবসরে ওদের কাজ রাস্তায় মেয়েদের দিকে বিশ্রী চোখে তাকিয়ে ইতর ইঙ্গিত করা, গান গাওয়া, পেছন থেকে টিট্‌কারী দেওয়া। সে যে বয়সের মেয়ে হোক্‌ না কেন, শাড়ী পরার বয়স হলেই হল।

না, নমিতা তার বাবাব জন্য, তার পবিবারেব জন্য কোন ভালবাসা, স্নেহ, সহানুভূতি পোষণ কবে না। বি. এ., এম. এ. পড়ার টাকা সে টিউশান কবেই সংগ্রহ করেছে। কয়েক বছব আগে একটা স্কুলে চাকুরী করতে করতে ডেপুটেশনে এসে বি. টি. দিয়েছিল। তাতে ফাস্ট´ক্লাস পেয়েছে। নমিতা জানে, তাব বাবা কখনও কখনও কোথায় বাত কাটিয়ে মদ খেয়ে বাড়ী ফেবে। দাদা স্টেট বাসেব কণ্ডাক্টার ছিল। পযসা চুবিব অভিযোগে চাকরী গেছে। এখন সে এ পাড়ার লীডাব। ওদেব হাতে সরকাব একবাব এলেই, ওবা দেশের সব সমস্যার সমাধান একদিনেই কবে ফেলবে—এমনি একটা ভাব। নমিতাকে সে দলে টানতে পাবেনি অনেক চেষ্টা করেও। নমিতার উপর তাই সবচেয়ে তার বাগ বেশি।

কয়েকদিন আগে সন্ধ্যাবেলা দাদা ত বলেই ফেলল, 'তুই বিদ্যের জাহাজ হয়েছিস। কলেজে নাকি একবার বক্তৃতা দিয়ে প্রাইজও পেয়েছিলি। পার্টিতে আয় না। দেখবি লীডার হয়ে যাবি। ছেলেরা তোকে লুফে নেবে।'

নমিতা ঘর ঝাঁট দিতে দিতে বলল, 'না, লুফে নিয়ে কাজ নেই। তুমি বরং দয়া করে বিড়িব টুকরোগুলো এক জায়গায় ফেল। সারা ঘরে ছড়িও না।'

'কেন তুই এমন ধাবা, বল ত? কোন কথা শুনিস্‌ না। এত একগুঁয়েমি কেন তোর?'

'কেন? কি আর কথা শুনব। চাকরী করে তোমাদের সংসারে টাকা দিচ্ছি, আর কি চাও?'

'তোর টাকা দেওয়ার অহংকারটা বড্ড বেশি। এ খোঁটা তুই আগেও দিয়েছিস্‌ তোর বৌদিকে। কেন? তুই একা টাকা দিস্‌?'

নমিতা কাজ থামিয়ে দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। একটা বিড়ি টানতে টানতে অবিনাশ কথাগুলো বলছিল।

'না, ও কথা আমি বলিনি।'

'তুমি কওনি ঠাকুরঝি? কতদিন আমারে কইছ—তোমাগো সংসার ঠেইল্যা ঠেইল্যা আমার জীবনডা গেল।'

আসন্ন-প্রসবা বৌদি একটা বীভৎস প্রতিবাদের মত মুলি বাঁশের বেড়া দেওয়া ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল।

'তোর লেখাপড়া শিখে বড্ড বাড় বাড়ছে।' অবিনাশ বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল।

'বাড় বাড়েনি, যা সত্যি তাই বলছি। পাড়ায় আড্ডা দিয়ে বিড়ি সিগারেট ফুঁকে দিন কাটাচ্ছ। চাকরীর চেষ্টা নেই। কত কষ্ট করে কত লোককে ধরে বাসের চাকরীটা করে দিলাম, তাও পয়সা চুরি করে খেলে। এখন ঝগড়া করা ছাড়া আর কাজ কি তোমার, বল?'

উপমন্ত্রীর যে পি. এ.-কে ধরে নমিতা অবিনাশের চাকরীটা করে দিয়েছিল, সেই প্রণববাবুর সংগে তাকে জড়িয়ে অবিনাশ একটা কুৎসিত মন্তব্য করে বলল, 'তোর সংগে ত লোকটার খুব পীরিত রে। দে না, আর একটা জুটিয়ে।'

নমিতা ক্ষোভে, ক্রোধে, দুঃখে সেদিন পাগল হয়ে উঠেছিল।

সেই মুহূর্তে বাইরে কে ডাকল।

নমিতা বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

'ও, শুভ্রা; তুই এখন রাত্রে কোথা যাবি রে?'

শুভ্রা কাঁদোকাঁদো হয়ে বলল, 'এই দেখ না নমিতাদি, পরেশদা আমাকে কি যা তা লিখেছে?'

নমিতা অবাক: 'কি লিখেছে, কই দেখি?'

শুভ্রা চিঠিটা নমিতার হাতে দিল।

একটু পরে সিনেমার একটা আধুনিক গান গাইতে গাইতে পরেশ বাড়ি ফিরছিল। ট্রাউজারের নিচের দিকটা ওঠান, ডান হাতে

ঘড়ি বাঁধা, মাথার সামনের দিকে চুলগুলোকে এক অভিনেতার প্যাটার্নে বাঁকিয়ে দেওয়া। পায়ে চটি। বাঁশের গেটটা খুলে পরেশ উঠোনে ঢুকল।

নমিতা উঠোনের অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল।

দিদির গলা শুনে চমকে উঠল পরেশ।

'তোর টেস্ট কবে?'

'পরশু থেকে।'

'এতক্ষণ কোথায ছিলি?'

বাড়ীব মধ্যে ভয় করে সে একমাত্র দিদিকেই।

'এই একটু চাযেব দোকানে ছিলাম '

'পড়তে বস্, আমি আসছি।'

হ্যারিকেন জ্বেলে বইপত্তর নিয়ে পবেশ পড়তে বসল। নমিতা বলল, 'আমি ভাত চাপিয়ে দিয়ে আসছি। তুই একটা চিঠি লেখ্ ত, কোন বোনকে। লেটাব রাইটিং শিখেছিস্ ত?'

পবেশ আতঙ্কিত হয়ে উঠছে।

ভাত চাপিয়ে দিয়ে নমিতা পরেশেব কাছে এসে বসল।

পরেশ ভয়ে ভয়ে খাতাটা এগিয়ে দিল। নমিতা গম্ভীরভাবে উঠে গিয়ে একটা বেত যোগাড করে নিয়ে এল: 'দুটো বানান ভুল করেছিস্ একটা সেনটেন্স লিখতে, কনস্ট্রাকশনও ভুল।'

পরেশ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

'আর চিঠি লিখবি? লিখবি?' নমিতা গর্জন করে উঠল। এতটুকু বয়েস থেকে ফ্রকপরা মেয়েকে প্রেমপত্র লিখতে শুরু করেছিস, হতভাগা! তোরা একেবারে গোল্লায় গেছিস রে!'

বেত খেয়ে পরেশ চীৎকার করছে। নমিতা সারা সন্ধ্যার জ্বালাটা মিটিয়ে, বাইরে উঠোনে এসে দাঁড়াল, আতা গাছের নিচে।

বাবা এল দোকান থেকে।

'ঘরে ডাকাইত পরছে নাকি?' বৃদ্ধ পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল।

নমিতা কিছু বলল না। বাবা ঘরে ঢুকতেই বৌদি সবিস্তারে

এবং আরো কিছু বানিয়ে নিয়ে, আজ সন্ধ্যার ঘটনাগুলো বলে গেল।

'তুই এত বড় মা-মরা ছেইলাডারে এমন কইর‍্যা মারলি?'

নমিতা আস্তে আস্তে বলল, 'মারটা কম হয়ে গেছে।'

'ভাইডারে মারিস, দাদারে টাকার খোঁটা শুনাস্, তর হইল কি, লেখাপড়া শিইখ্যা সগ্‌গ দেখছিস নাকি?'

নমিতা ধীরে ধীরে বলল, 'না, নরক দেখছি।'

সে আর দাঁড়াল না!

নমিতা সে রাত্রে খায়নি। সারা রাত্রি সে ভেবেছে তার অপরাধটা কোথায়? তার অপরাধ, সে এই পরিবারের জাহান্নামে যাওয়ার একটা জীবন্ত প্রতিবাদ বলে। সংসারে টাকা দেওয়ার চেয়ে তার উচিত ছিল, এদের কুৎসিত কাজগুলোকে সমর্থন করা। টাকা ওদের আসে, আসবে এবং নানাভাবে আসবে। দাদা ত ইলেকশানের সময় পকেট পুরে টাকা আনে। অপর পার্টির 'ক্যানভাস' করবে, আর ভলান্টিয়ার ঠিক করে দেবার নাম করে। 'ক্যানভাস' ঠিকই করে, তবে তা নিজের পার্টির। দু'দিক থেকে লাভ। বাবার দোকান। তা আজকাল সব দোকানেই বিক্রী ভাল হয়। দাদা লীডার হওয়ায় পাড়ায় বাবার প্রেস্টিজ বেড়েছে। নমিতা বাবা, দাদা, ছোটভাই, কাউকেই সমর্থন করে না, প্রশ্রয় দেয় না। হ্যাঁ, এই তার অপরাধ!

নমিতা কী একটা যন্ত্রণায় সারারাত ঘুমোয়নি! উঠোন থেকে, পাশের নারকেল বাগান থেকে একসময় রাত্রি মুছে গেল। ভোর হল শহরতলির উদ্বাস্তু কলোনীতে। পাশের বাড়ির সেই মেয়েটা একটা কর্কশ রীডের হারমোনিয়াম নিয়ে তারস্বরে চেঁচাতে লাগল। হকার খবরের কাগজটা উঠোনে ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেছে কখন।

নমিতা শুয়ে শুয়ে সব শুনছিল। উঠতেও আজ তার ইচ্ছা নেই। তবু এক সময় উঠে চলে যাবার জন্য তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়ল।

ঝি এসে বলল, 'দিদিমণি, হেডমাস্টার মশায় আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

নমিতা চমকে উঠল। স্কুলের ছুটির পর নিজের ঘরে বসে কি সব ভাবছে সে। জিজ্ঞেস করল, 'কোথাকার হেড্‌মাস্টার?'

'এখানে যে হাইস্কুল আছে, তার পুরনো হেডমাস্টার, প্রভাতবাবু।'

'তুমি বসতে বল, আমি আসছি।'

নমিতা কাপড়টা পাল্টে নিচে নেমে গেল।

॥ ৪ ॥

নমিতা ভেবেছিল, অসিত একদিন নিশ্চয়ই আসবে দেখা করতে। সেই রাত্রিতে যখন পরিচয় একটু সহজ হয়ে আসছিল, তখন পথটা হঠাৎ ফুরিয়ে গেল। এই সীমিত পরিচয়ের মধ্যে নমিতার মনে অসিত একটি করুণ সুরের আলাপের মত বাজছিল। তার মনে হয়েছিল, এক বিচিত্র মানুষ অসিতবাবু, বিচিত্র একটি ব্যক্তিত্ব। সহজ, হাসি খুশি, অথচ কখনও কখনও অত্যন্ত গম্ভীর। কথা বলার মধ্যে আন্তরিকতার সুর বাজে, কিন্তু বাইরের দূরত্ব কখনও কমে না।

সুন্দর, বুদ্ধিদীপ্ত, মার্জিত, একটি বলিষ্ঠ মানুষ অসিত। ঠিক সুরে বাঁধা একটি তরুণীর মনের তারগুলোয় হাত রাখলে যেমন সুর আপনি বেজে ওঠে, নমিতার মনে হয়েছিল, সে অনুভব করছিল, এমনি একটা সুরের জন্মলগ্ন কোথাও বেজে উঠেছে।

সেদিন প্রভাতবাবুর সঙ্গে অসিতেরই কথা হচ্ছিল। অসিত প্রভাতবাবুর ছাত্র এবং শিক্ষকের পরিচিত দৃষ্টিকোণ থেকে অসিত ভাল ছাত্র, একথা প্রভাতবাবু বলেননি। নমিতা শুধু শুনেছিল, অসিতের ছাত্রজীবনের দুরন্ত কাহিনীগুলি। নমিতার আগ্রহ দেখে প্রভাতবাবুও সব বলেছিলেন। অসিতের ফুটবল খেলার সেই রোমাঞ্চ-কর কাহিনী, মারামারির ক্ষেত্রে সব্যসাচীর মত দু'হাতের অবাধ ব্যবহার, দলের পাণ্ডাগিরি, এবং পড়াশোনাও।

প্রভাতবাবু বলেছিলেন, 'সত্যি আশ্চর্য ছেলে, মা। কিছুদিন আগে

একবার আমার অসুখের সময় দেখতে গেছল আমাকে। আমি তার চোখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। জীবনে কোন ছাত্রকে দেখে এ রকম মুগ্ধ আমি কখনো হইনি। মেডিক্যালে খুব ভাল রেজাল্ট করেছিল অসিত। কেন জানি না, তবু গ্রামে এসে বসল!

নমিতার কাছে একটি মধুর জীবনের অচেনা পরিচ্ছেদগুলো, একের পর এক খোলা হচ্ছিল।

সেদিন স্বদেশবাবু নিজের ঘরে বসে সুতো কাটছিলেন। বিকেল পড়ে এসেছে।

নমিতা, উমা ঘরে ঢুকে প্রণাম করল। স্বদেশবাবু অবাক হয়ে একটু তাকালেন। নমিতাকে চিনতে পারলেন না।

'আমি নীলাপুর স্কুলে নতুন এসেছি।'

স্বদেশবাবু পাঁজটা রেখে দিয়ে হেসে বললেন, 'বস। তাহলে খোকা তোমাকেই সেদিন পৌঁছে দিয়ে এসেছিল?'

স্বদেশবাবু চরকাটা তুলে রাখলেন এবার। উঠোন অন্ধকার হয়ে আসছিল, তাই ভাল দেখাও যাচ্ছিল না।

নমিতা দেখছিল স্বদেশবাবুকে। বয়স কত হবে? বোধহয় সত্তর-পঁচাত্তর। স্বাস্থ্য কি ভাল! চুল-দাড়ি সব সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু, দাঁত পড়েনি একটিও। আশ্চর্য মজবুত, সুন্দর আর প্রশান্ত এই বৃদ্ধকে দেখতে নমিতার কেন যেন ভাল লাগছিল।

উমা জিজ্ঞেস করল, 'অসিতদা বাড়ী নেই?'

'না, রোগী দেখতে গেছে। এই এক্ষুণি এসে পড়বে।'

নমিতা বলল, 'উমার বাড়ী এসেছিলাম। আর তাই একবার চলে এলাম। সেদিনের পর ওঁর সঙ্গে দেখাই হয়নি।'

'খুব ভাল করেছ। যখন খুশি চলে আসবে, মা। আমি অবশ্য এখানে বেশি থাকি না। নদীর ধারে আমার একটা বেসিক স্কুল আছে। সেইখানেই থাকি। তা, তুমি ত হেডমিস্‌ট্রেস্?'

'হ্যাঁ, আমি হেডমিস্‌ট্রেস।'

'কলকাতায় থাকতে ?'

'না, তবে কলকাতার কাছে একটা কলোনীতে।'

'আগে তোমার দেশ ছিল কোথায় ?'

'ঢাকা জেলায়।'

'সেখানকার গ্রাম দেখনি ?'

'না, ঠিক দেখিনি। শহরেই আমরা ছিলাম।'

স্বদেশবাবু বললেন, 'তবে তুমি কি মা এই গ্রামের স্কুলে থাকতে পারবে ? কত হেডমিস্ট্রেস এলেন, চলে গেলেন। এখানে নাকি থাকা যায় না। শহর চাই, শহরে না থাকলে আবার জীবন কি ?'

নমিতা বলল, 'না, আমার গ্রাম ভাল লাগে।'

'গ্রাম ভাল লাগে শুনে বড় ভাল লাগল।' স্বদেশবাবু অন্যমনস্কভাবে বলে যেতে লাগলেন, 'এই গ্রাম, এই ছোট জায়গাটুকু আমার কিন্তু বেশ ভাল লাগে। কেন জান মা, এই ছোটর মধ্যে আমি সবাইকে হাতের কাছে পাই। এই ক্ষেত খামার, পুকুর, বাগান, আর লোকজন সব যে আমার চারপাশে আছে, সেটা বুঝতে পারি। শহরে কি তা পাই ? শহরে মানুষ যত কাছের তত দূরের। আর দেখ'—স্বদেশবাবু গলার স্বর নীচু করে বলতে লাগলেন—'জায়গা যত বড় হবে, বিরাট হবে, আমি সেখানে তত ছোট হয়ে যাব। এই হল বুড়োর কথা। আচ্ছা, তোমার খারাপ লাগছে না ত, মা ?'

'না না, আপনি বলুন। আমার খুব ভাল লাগছে শুনতে। আমিও গ্রামকে জানতে চাই।'

তারপর নমিতা বলল, 'বেসিক স্কুলটা কতদূর ?'

'নদী-ধারের কাছে। বেশি দূর নয়! তা, নদী-ধারের দিকে একটু এগিয়ে গেছি, মা। ওখান থেকে শ্মশানটা কাছে হয়।' স্বদেশবাবু এবার হাসতে লাগলেন।

মৃত্যুটা তাঁর কাছে যেন একটা আনন্দের ব্যাপার।

উমা চুপ করে বসেছিল এতক্ষণ। এবার বলল, 'আমি যাই, নমিতাদি। অন্ধকার হয়ে আসছে।'

উমা চলে যেতে নমিতা স্বদেশবাবুকে বলল, 'কেন আপনি নিজেকে এত বুড়ো বুড়ো ভাবেন। আপনার যে স্বাস্থ্য তাতে আপনি আরও অনেকদিন বাঁচবেন।'

স্বদেশবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'স্বাস্থ্য আমার খারাপ নয়, মা। আমি খেতেও পারি। আর আমার বাগানে ফল হয়, বাড়িতে দুধ হয়। কিন্তু আসল কথা কি জান, মা?' স্বদেশবাবু চুপি চুপি বললেন, 'তোমার সঙ্গে এই প্রথম পরিচয় হল, বলা হয়ত উচিত হবে না। তা, এই বুকের একটা ব্যারাম আছে। পুলিশ রুল দিয়ে মেরেছিল। এই আঙুলগুলো দেখছ না, মা'—স্বদেশবাবু আঙুলগুলো নমিতার চোখের সামনে তুলে ধরলেন—'এগুলোতে জোর করে পিন ঢুকিয়েছিল। এই জয়েন্টটা দেখ মা, ভাঙা—এও পুলিশের আর এক অক্ষয় কীর্তি।'

স্বদেশবাবু আবার হো হো করে হেসে উঠে বললেন, 'দেখ, এ পুলিশ অফিসাররা বাঙালী। তোমাদের য়ুনিভারসিটির ডিগ্রীধারী হয়ত। এরা বিদ্বান, সংস্কৃতিবান এবং ভদ্রলোকও।'

নমিতার লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে আসছিল।

'এ্যাই দেখ, এগুলো হল বুড়ো বয়সের ব্যাধি। কাউকে কাছে পেলেই অমনি যত সব পুরনো জীবনেব গল্প করতে বসে যাই।'

স্বদেশবাবুর আন্তরিকতায় প্রথম পরিচয়ের দূরত্ব কেটে যাচ্ছিল। নমিতা তাই বলল, 'না না, আমি কিছু ভাবছি না। কোন্ আন্দোলনে আপনাকে এমনি করে মেরেছিল?'

'এ্যাইত মা, আবার সলতেটা উস্কে দিলে। তাহলে শোন', স্বদেশ-বাবু বলতে লাগলেন, 'সেবার লবণ আইন আন্দোলন হচ্ছে। এই নদীটা তখন এত মরে যায়নি। পলি পড়েনি এত, স্রোত তখন জোর ছিল। এই নদীর ধারে, যেখানে বেসিক স্কুল হয়েছে সেইখানে আমরা নুন তৈরী করলাম। খবর পেলাম পুলিশ আসছে। সবাই আমাকে বলল, আপনি রাত্রে বাড়ি থাকবেন না; ঘেরাও হতে পারে। তা আমি যেতাম। কিন্তু ব্যাপারটা হল কি। ব্যাপারটা হল,

খোকা সেদিন ফুটবল খেলে মাথা ফাটিয়ে এসেছে। ছেলেটাকে ছেড়ে যেতে মায়া হল। পুলিশ আসতে পারে, নাও আসতে পারে। কাজেই রাতটা থেকেই যাই না। রাত্রে বাড়ি থাকার সুযোগ তখন ত খুব হয় না।'

'ছেলের মাথা ফাটা দেখে থেকে যাওয়ায়, নিজের মাথা ফাটল বোধহয় ?' নমিতা বলে উঠল।

'ঠিক বলেছ, মা। সত্যি, রুলের বাড়িতে মাথাটা ফেটে গেছল। দারোগাটা আগে থেকেই বড্ড রেগেছিল। তার আগে হয়েছিল কি, আমার বাড়ি ঘিরে রেখে নদী-ধারের বাগ্দীদের বাড়িটা ঘেরাও করতে গেছল। নৌকোর মাঝিকে দেখেছ ত ? ওর বাড়ী। সেই পাঁচ মাইল দূর থেকে পুলিশকে কাদা রাস্তায় হেঁটে আসতে হয়েছে। তাতেই দারোগা সাহেব রেগে লাল হয়েছিল। তার ওপর রাতে ঘুম নেই। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। ভোরে দরজা খুলতে মাঝিকে পাকড়েছে। ধস্তাধস্তিও হয়েছিল বোধহয়। ক্লান্ত, ক্রুদ্ধ দারোগা মাঝির পেটে বুট সুদ্ধ লাথি মেরে বলল, 'চল শালা, থানায়।'

রুখে উঠল মাঝি, শালা বলতে কে আপনি ?'

'কে আর ? তোর বাবা। এঃ, তেজ দেখাচ্ছে শুয়ারকা বাচ্চা।'

'বেত খেয়ে জোয়ান মাঝি যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল।

'খুঁটি ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বৌটা। মনটা তার বড় খারাপ। স্বামীকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু, মাঝির পিঠের চামড়া ফেটে রক্ত বেরুতে দেখে হঠাৎ কি হল, রুখে দাঁড়াল বৌটা।

'আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে মাছ-কাটা বঁটিটা হাতে তুলে নিয়ে লাফ দিয়ে উঠোনে নেমে ছুটল দারোগার দিকে—তবে রে ছোট-লোকের ব্যাটা—'

'দারোগা সাহেব এরকম সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সিপাইগুলোও কি করবে বুঝতে পারছিল না। এই জোয়ান আওরতের গায়ে হাত দেয় বা কি করে ?

'হঠাৎ একটা লোক পিছন থেকে এসে বঁটি সুদ্ধ হাতটা ধরে ফেলল বৌটার। বঁটি ছেড়ে দাও, মা।'

'—মা' ডাক শুনে বৌটা ফিরে তাকাল। দেখল, লম্বা ফর্সা প্যাণ্ট-পরা সুন্দর এক যুবক তার হাতটা ধরে রেখেছে।

'ছেড়ে দাও মা, কথা দিচ্ছি, তোমার স্বামীকে কেউ মারবে না।'

'এতক্ষণে মাঝির বৌ কেঁদে ফেলল। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল তার। পা জড়িয়ে ধরল সাহেবের, তুমি আমার ছেলে, বাবা, ওঁকে যেন না মারে—পিঠটা একবার দেখ—রক্ত ফেটে পড়ছে।'

একবার মাঝির দিকে তাকালেন তিনি : 'ওঠ তুমি, আমি এস.ডি.ও.। আমার কথার খেলাপ হবে না। এ্যাই সেপাই!'

'জী'—কয়েকটা সিপাই দৌড়ে এল।

'—রশি খোল দো।'

'তারপর দারোগাকে ডেকে এস. ডি. ও. বললেন, থেমে থেমে কিন্তু বজ্রের মত কঠিন কথাগুলো—নোট দ্যাট—দিস্ ইজ মাই লাস্ট ওয়ার্নিং। যদি আর কখনও এইভাবে মারতে দেখি, তবে জানবে, ইউ মাস্ট নো—আই উইল স্পয়েল ইয়োর কেরিয়ার।'

স্বদেশবাবু বললেন, 'খবরটা পরে থানার রাইটারই আমাকে বলেছিল। নতুন আই.সি.এস., এস.ডি.ও.। বড় ঘরের ছেলে ছিল। এক-একজন ভাল লোকও থাকে মা। তা, হল কি ; নদীতে ভাঁটা পড়ে যাবে। এস.ডি.ও. লঞ্চে করে কাঁথি চলে গেল। জরুরী কাজ আছে। আর সেই দারোগা এল আমাকে এ্যারেস্ট করতে। একে মেজাজ খারাপ, কড়া ধমক খেয়ে। তার ওপর প্রমোশনের চিন্তা। যত বেশি পশুর মত অত্যাচার করবে, প্রমোশন তত কাছে আসবে। তা, আলি সাহেবের খুঁটির জোর ছিল।'

নমিতা জিজ্ঞেস করল, 'আপনাকে ঐদিন ধরে নিয়ে গেল?'

'শুধু ধরে নিয়ে গেল না মা, সেদিন থানার হাজতে যে অভ্যর্থনা পেলাম, তা ভুলবার নয়। মূর্ছা ছাড়িয়েও মেরেছে। লাথি, রুল বেত, আঙুলে পিন ফোটান—কোন প্রক্রিয়া বাদ যায়নি। তবু বেঁচে

আছি। তবু দেশ স্বাধীন হল। মরার আগে স্বাধীন ভারতবর্ষ দেখে যেতে পারলাম!'

স্বদেশবাবু স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন!

'এখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। বাইরে চল, মা।' স্বদেশবাবু নমিতাকে নিয়ে বাইরে এলেন। বললেন, 'এস, তোমাকে আমার বাগান দেখিয়ে নিয়ে আসি।'

স্বদেশবাবুর বাগানটা দেখার মত। মাঝখানে একটা বড় পুকুর। ঘাট বাঁধান। এক একটা গাছ যেন সতেজ সবুজ এক-একটা প্রবল জীবন। বর্ষার জল পেয়ে ঘন পাতায় ছেয়ে আছে।

'পেয়ারা খাবে, মা?'

নমিতা হাসল: 'না, খাব না।'

'কেন খাবে না? ছোট মেয়েরা পেয়ারা খেতে ত ভালবাসে। দাঁড়াও, পেড়ে দিচ্ছি।'

স্বদেশবাবু কিছু না বলে, কয়েকটা ডাঁসা পেয়ারা পেড়ে নিয়ে এসে নমিতার হাতে দিলেন, 'খাও মা, খেয়ে দেখ. বুড়োর কলমের গাছের পেয়ারা কেমন।'

'জান মা, গাছ আমার বড় প্রিয়। ওরাই আমার সঙ্গী। এই এতটুকু কলম, জল দিয়ে সার দিয়ে বড় করি, এই যেমন অসিতকে তার মা বড় করেছিল।'

সাইকেলের শব্দ শোনা গেল দূরে। হ্যাঁ, অসিত এল এতক্ষণে।

মাটির সিঁড়ি বেয়ে ওরা দোতলার ঘরটায় উঠে আসছিল।

'এই আমার ঘর। আপনি বসুন।' অসিত স্টেথিস্‌কোপটা খাটে ফেলে দিয়ে বলল।

'তা ত বুঝলাম, কিন্তু ঘরটাকে গুছিয়ে রাখলে কিছু ক্ষতি হয় নাকি? বইগুলো এলোমেলো, বিছানাটা ঠিক নেই। খুব 'আন-হেলদি এসব।' অথচ আপনি নিজে একজন ডাক্তার। নমিতা হাসতে হাসতে বলল।

অফ্‌কোর্স। কিন্তু অত সময় নেই।

'ভুল হল, ইচ্ছে নেই।'

'তাও বলতে পারেন। কিন্তু কি আর করা যাবে। যে করেই হোক একটু সময় কাটিয়ে দিন এ ঘরে। ঘরটা খারাপ হোক, ঘরের লোকটা খুব খারাপ নয়।'

নমিতা মৃদু হেসে বলল, 'নিজের অত অহংকার ভাল না—'

মাটির আর খড়ের ঘর যে এত সুন্দর হয়, নমিতা আগে তা জানত না। দেয়ালের সবটাই মাটি দিয়ে লেপা। নমিতার মনে হল, ঘরের চারিদিকে যেন একটা ধূসর পবিত্রতা মাখান। নমিতার খুব ভাল লাগছিল। সে যেন শহরতলির নোংরা, অপরিচ্ছন্ন, বীভৎস, জীবনটাকে ফেলে এসে, দিনে দিনে নতুন করে বাঁচবার প্রতিশ্রুতি পাচ্ছে।

নমিতার নবজন্ম হচ্ছে!

খেতে খেতে নমিতা বলল, 'সেদিন নীলাপুর স্কুলের রিটায়ার্ড হেডমাস্টার প্রভাতবাবু আপনার কীর্তি-কাহিনী বলছিলেন।'

অসিত বলল, 'ও, সেই 'লিভিং গ্রামার'?'

'লিভিং গ্রামার! মানে?'

'আমরা ওঁকে 'লিভিং গ্রামার' বলতাম। উনি আমাদের গ্রামার পড়াতেন। স্বভাবত ঐ শাস্ত্রটির ওপর আমাদের কিঞ্চিৎ বৈরাগ্য ছিল। কাজেই ক্লাসে দুর্ভোগ থাকতই।'

'অর্থাৎ বেঞ্চের ওপর দাঁড়ান কি এই ধরণের কিছু?' নমিতা অসিতের ছাত্রজীবনের গ্রামার ক্লাসের এই অতীত ছবিগুলি মনে মনে ভেবে নিয়ে মধুর আনন্দ পেল!

'আপনি ত খুশি হবেনই। নিজের প্রফেশান ত? আর আমাদের তখনকার কথাটা ভাবুন; ফুটবল খেলব, না গ্রামারের 'এপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশান' মুখস্থ করব।'

নমিতা কথাটা লুফে নিয়ে বলল, 'না ফুটবল খেলব, না মারামারি করব, না গ্রামের যাত্রাদলের আখড়ায় গিয়ে গান শিখব? সত্যিই ত, আপনার তখন কত কাজ!'

অসিত নীরবে হাসছিল।

কিছুক্ষণ পরে অসিত গম্ভীর হয়ে বলল, 'আশ্চর্য জীবন। সেই 'লিভিং গ্রামার'কে একবার দেখতে গেলাম। অসুস্থ হয়েছিলেন। দেখলাম সেখানে গ্রামার নেই, সেনটেন্সের কনসট্রাকশানগুলোও সব ভুল হয়ে গেছে। কে যেন খাপছাড়া কয়েকটা অর্থহীন শব্দকে সাজিয়ে রেখে গেছে!

নমিতা কিছু বুঝতে না পেরে বলল, 'কি ভুল হয়ে গেছে? কি কনসট্রাকশান ভুল?'

'বডির কনসট্রাকশান। সব জয়েন্টে বাত হয়েছে। 'লিভিং গ্রামার' তখন পঙ্গু। ঘরের উঠোনে তখন ফাইন্যাল পরীক্ষাটা এগিয়ে আসছে। এ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশান মুখস্থ করে তাকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।'

নমিতা চুপ করে বসে রইল। বৃষ্টির দিনের অন্ধকার ঘরে ভরে উঠেছে তখন। তার মনে হচ্ছিল, যৌবন যেন কী একটা অমৃত সম্পদ! যা না থাকলে জীবন অতৃণ ক্ষেতের মত রিক্ত হয়ে ওঠে, পৃথিবীর সব সম্পদ উচ্ছিষ্টের মত বিকৃত হয়ে ওঠে।

'ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু?' কে যেন ব্যাকুল হয়ে বাইরে থেকে ডাকল।

নমিতা বলল, 'সেই নৌকোর মাঝির গলা না?'

'হ্যাঁ।' অসিত দ্রুত নেমে এল।

মাঝি বলল, 'দাদাবাবু, বাড়িতে বড় বিপদ।'

'কি বিপদ?'

হাঁপাতে হাঁপাতে মাঝি বলল, 'বৌমার এটা তিনমাস ছিল। ঘাট থেকে আসতে আসতে পড়ে গেছে। অজ্ঞান হয়ে আছে এখনও।'

'তাই নাকি? চল। অসিত তাড়াতাড়ি স্টেথিসকোপটা গলায় জড়িয়ে নিতে নিতে বলল, 'আমাকে একবার এক্ষুণি যেতে হবে।'

নমিতা ভয়ে ভয়ে বলল, 'ইস্ আমার যে রাত হয়ে যাচ্ছে!

'চলুন, লোক দিয়ে দেব সঙ্গে।'

'রোগীর বাড়ি কোন্ দিকে?'

'পথেই পড়বে।'

'তাহলে একটু দাঁড়ান আপনার বাবার সঙ্গে দেখা করে আসি।'

'এখন যাবেন না, বাবা বোধহয় প্রার্থনা করতে বসেছেন।'

নমিতার মনে হল, রোগীর কথা শুনে অসিতের সারা মেজাজটা পাল্টে গেল। এখন সে আর গ্রামার আর অঙ্কের ভয়ে ভীত ছেলে নয়—এখন সে ফুটবলের দুর্ধর্ষ ব্যাকের মত খাড়া হয়ে উঠেছে ইস্পাতের দেহটা নিয়ে।

'রেডি ?'

নমিতা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হ্যাঁ, চলুন।'

॥ ৫ ॥

মরা নদীর পাড়টা দিয়ে চলতে চলতে অসিত বলল, 'আপনার অনেক রাত হয়ে গেল ফিরতে। কিন্তু তার জন্যে আমাকে দয়া করে দায়ী করবেন না।'

'না।' নমিতা সংক্ষেপে উত্তর দিল।

এই নির্জন পথটায় দু'জনে এক সঙ্গে চলতে চলতে নমিতার সেই মাঝির বাড়ির বধূটির মৃত্যুর ছবিটা মনে আসছিল ; কী করুণ এই আসন্ন প্রসবার মৃত্যুটা! ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে থাকা সেই হতভাগ্য বধূটি, জীবনকে যে জানে না, যৌবনের স্বাদ যে পায়নি, কেবল নিছক একটা জৈবিক দুর্বলতায় যে শিশুর জন্ম, সে জন্ম কী কুৎসিৎ !

লোনা মাটির পথটায় সাইকেলের ফ্রী হুইলের একটা একটানা মৃদু শব্দ বাজছে।

নমিতা মৃত্যুর ছবিটা ভুলে থাকবার জন্য অসিতের সঙ্গে গল্প করে পথটা চলতে চেষ্টা করল। বলল, 'আচ্ছা, আপনার মনে মৃত্যু কোন দাগ কাটে না ?'

'না।'

'কিন্তু এই যে আসন্ন প্রসবা মেয়েটি এত অল্প বয়েসে মারা গেল—এতে আপনার কিছু মনে হয় না ?'

'ওরা মরার জন্যেই।'

'আপনি যেন ওদের ওপর রাগটা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না, কিছুতেই ওদের ক্ষমা করতে পারছেন না আপনি।'

'সত্যি, ওরা ক্ষমার অযোগ্য। এই মাঝি আমাদের খুব চেনা। অথচ এই রকম 'এ্যাকিউট কেস'এ ওরা হাতুড়ে ডাক্তারকেই আগে ডাকল। পাড়াগাঁয়ের মেডিক্যাল লাইফের এই হল ট্রাজিডি।'

'কিন্তু ওরাই বা হাতুড়ে ডাক্তারকে ডাকে কেন ?'

'ডাকে, কোন শিক্ষা পায়নি বলে। আপনি নতুন এসেছেন এ দেশে। দু'দিন থাকলেই বুঝতে পারবেন কি চেহারা এই দেশটার। এরা দরিদ্র। তাতে আবার কুসংস্কার, অশিক্ষা, ঈর্ষা, দলাদলি সব এসে মিশেছে।'

'আপনার বাবা কিন্তু বলেন, এই গ্রামই তাঁর ভাল। এই গ্রামকে তিনি ভালবাসেন।'

'ঐ জন্যেই বাবার সঙ্গে আমার মেলে না। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার এ সবের ওপর আমার কোন মোহ নেই।'

'আপনার বাবারই বা মোহ আছে—একথা কে বলল ? তিনিও এর সংস্কার চান।'

অসিত বলল, 'না, বাবার সংস্কার চাওয়া আর আমার সংস্কার চাওয়া এক নয়। বাবার সংস্কার চাওয়া এই মেয়েটাকে চিকিৎসা করার মত, হাতুড়ে। কিন্তু আমাদের দেশের রোগটা 'এ্যাকিউট'। এখানে সময় নেই। অনাগত শতাব্দী পর্যন্ত দেশের কোটি কোটি মানুষকে এই অন্ধকারে ফেলে রাখা যায় না।'

নমিতা আশ্চর্য হয়ে শুনছিল, অসিত এবার নিজের স্পীডেই সব বলে যাচ্ছে। খুব ভাল লাগছিল শুনতে, আর এক সঙ্গে এই অন্ধকার পথটুকু চলতে।

এক সময় নমিতা আস্তে আস্তে বলল, 'ভাগ্যিস্ অন্ধকার হয়েছিল,

তাই গল্প করতে করতে আসছি। নইলে আলো থাকলে আমাকে একাই ফিরতে হত।'

হঠাৎ অসিত বলল, 'আপনি ভূত বিশ্বাস করেন। দেখুন। ঐ হল নদী-ধারের শ্মশানটা।'

নমিতা চিৎকার করে অসিতের কাছে সরে এল : 'আপনি আচ্ছা মানুষ ত, এই রাতে ভয় দেখাচ্ছেন এমনি করে।'

'না, আমি ভয় দেখাচ্ছি না, আমি শুধু শ্মশানটা দেখাচ্ছি। শুনুন, বছরখানেক আগে রাতে একটা কলেরা রোগীর খবর এল পাশের গ্রাম থেকে। সেদিন আবার অমাবস্যা। বেরুলাম সাইকেলটা নিয়ে। এই পথ ধরেই চলেছি। দূরের গ্রামগুলো মৃত্যুর গন্ধ পেয়ে কেমন যেন ভয়ংকর নিস্তব্ধ হয়ে উঠেছে। একমনে জোরে সাইকেলটা চালিয়ে চলেছি। যেতে যেতে আশ্চর্য সুপারন্যাচারিলিজম দেখলাম। এই শ্মশানে, একটু দূরে থেকে আমার মনে হল যেন দুটো লোক টিমটিমে আলো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর আমাকে হাত নেড়ে ইশারায় ফিরে যেতে বলছে। সেই চারপাশের ঘন অন্ধকারের মধ্যে আলো দুটোর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। আমার সারা শরীরটা শিউরে উঠল। আমি সাইকেল থেকে নামলাম। টর্চটা জ্বালব বলে সুইচ টিপলাম। কি করে যেন টর্চটা বিগড়ে গেছল।'

'শুনুন,' অসিত একটু হেসে আবার বলল, 'ভয় কি, আমি আছি। হ্যাঁ, তারপর সেই মুহূর্তে আমি আমার সমস্ত চেতনা দিয়ে নিজেকে বিশ্লেষণ করতে লাগলাম। আমি কি সত্যি ফিরে যাব? আমি ডাক্তার। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। কী এক উত্তেজনায় আমার শরীরটা কাঁপতে লাগল। না না, আমি পরাজয় স্বীকার করব না। সেই অন্ধকারে আমি সাইকেলের প্যাডেলে আবার চাপ দিয়ে লাফিয়ে উঠলাম। একটু পরে পেছনে তাকিয়ে দেখি, সেই আলো দুটো কখন নিভে গেছে।'

একটু থেমে অসিত আস্তে আস্তে বলল, 'কিন্তু রোগীর বাড়ি এসে দেখলাম, অবস্থা খুব খারাপ। পালস্ প্রায় নেই। সেই

গভীর রাত্রে অন্ধকার জলপাই মহালের এক অতিক্ষুদ্র কুটিরে, মৃত্যু-পথযাত্রী রোগীব কাছে বসে আমার জীবনের এক নতুন অভিজ্ঞতা হল। দেশের এ দারিদ্র্য ঘুচবে কি কবে? ভেবে দেখুন, সেই বাত্রি, বোগীর ঘর বলতে একটা নিচু খড়ের চালা প্রায় মাটির সঙ্গে লেপ্টে আছে, বসার জায়গা নেই, বিশ্রামের জায়গা দূরের কথা। বহুকষ্টে সেলাইন দিচ্ছি, হ্যারিকেনের আলোটা যে আলো দিচ্ছে তাতে অন্ধকার যেন আরো গাঢ় হচ্ছে। ছেঁড়া অতি ময়লা নোংরা কাঁথাব ওপর, স্বাধীন ভারতবর্ষের একজন নাগরিক শুয়ে আছে বীভৎস মুখ নিয়ে—মৃত্যু শিয়রে এসে গেছে, বিকৃতি দেখা দিচ্ছে মুখে আর হাতেব ঠাণ্ডা আঙুলে।

'সেই নিষ্ঠুর অন্ধকার রাতে আমি একটা ছেঁড়া চাটাইয়ের ওপর বসে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছি। না, মানুষটার জন্যে আমাব কোন মোহ নেই, ওর কাছে মৃত্যু আর জীবন দুই-ই সমান। কী হবে বেঁচে এদের এই পশুর মত! কিন্তু আমি ডাক্তার। আমার আনন্দ, আমি মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছি, লড়াইয়েতে আমি জিতত । যদি আমাকে আগে ডাকত। ডেকেছে, যখন ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। রোগী যখন আর বাঁচবে না, তখন। আশ্চর্য এই দেশ!

'রাত্রি ভোর হল। রোগীর ঘরের কেরোসিনের আলোটা নিভে গেছে। ঘরে ছেঁড়া শাড়ী পরা শীর্ণা বউটাও কাঁদছে না। কেবল একটা পাথরের মূর্তির মত রোগীর মাথার কাছে বসে আছে।'

'আমি উঠলাম। বোবা চোখ মেলে বৌটা তাকিয়ে রইল। ক্ষীণ গলায় ঘোমটার মধ্য থেকে বলল, 'ডাক্তারবাবু, টাকা। এক টাকার দুটো ময়লা নোট বৌটা আমার দিকে তুলে ধরল। আমার ইচ্ছা হল, নোট দুটো নিয়ে ওর মুখের ওপর টুকরো টুকরো করে, কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলি—আবার ডাক্তারের টাকা দেবার সখ! কিন্তু তা করলাম না, বললাম—তুমি রেখে দাও! টাকা দিতে হবে না। বৌটা এতক্ষণে কেঁদে ফেলল।'

নমিতা এই মুহূর্তে কি বলবে কিছু বুঝতে পারল না। সে শুধু

অসিতের মুখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করল। কিন্তু অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। শুধু সাইকেলের হ্যাণ্ডেল-ধরা তার শক্ত মজবুত হাতটা নমিতার চোখে পড়ল।

'কি, আর ভয় করছে?'

'না।' নমিতা খুব আস্তে বলল।

'দেখুন ঐ বাবলা বন, সেদিন রাত্রে আপনাকে যেখানে নামিয়ে দিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, মনে আছে।'

আর একটু এগিয়ে এসে অসিত বলল, 'এবার আসি। আপনি এইটুকু পথ একাই যেতে পারবেন।'

নমিতা থামল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'হাসবেন না, এই অন্ধকারে আপনাকে একলা যেতে দিতে খারাপ লাগছে।'

নমিতা কখন একাত্ম হয়ে উঠেছে, সে নিজেই জানে না।

'কিন্তু ভূতের ভয় আমার নেই।'

হাসতে হাসতে অসিত সাইকেলের মুখটা ফিরিয়ে, একবার ব্রেক্ দুটো টিপে দেখে নিল। না ঠিকই আছে। চেনা পথ তার। এই সাইকেলটা ঠিক কুড়ি মিনিটে পৌঁছে দেবে তাকে।

নমিতা একটু সময় তার যাবার দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু চোখে আর কিছু পড়ল না। অন্ধকারে সব ঢেকে গেছে।

॥ ৬ ॥

দুবদা বেসিনের লোনা জলের ঢেউ বুকে নিয়ে, রসুলপুরের মোহানা পেরিয়ে যে প্রবল জলস্রোত একদিন কালিনগরের নদী দিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চলে গিয়েছিল, এখন জোয়ারের স্রোতে সে নদীর বুকে জীবন আসে বটে, কিন্তু যৌবন আসে না। পলি পড়ে পড়ে স্রোত প্রায় মরে এসেছে।

কেবল মরানদী নয়, এ অঞ্চলের সমাজ জীবনও তেমনি নিঃস্রোত, স্তিমিত, মৃত। বহুদিন আগে থেকে নীলাপুরে ছেলেদের একটা হাইস্কুল ছিল। স্কুলটা অবশ্য এখনও বেঁচে আছে। সম্প্রতি এই গার্লস হাইস্কুল হয়েছে। প্রথম প্রথম দেশের লোক মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে চাইত না, বলত : মেয়েদের আবার লেখাপড়া কি ? বিয়ে দিলেই ত ফুরিয়ে গেল।

কিন্তু অধুনা ছেলেদের রুচি বদলেছে। তারা কি জানি কেন, লেখাপড়া জানা মেয়ে বিয়ে করতে চায়, আগেকার দিনের দিদিমাদের মত ঘোমটা-টানা কাপড়ের পুঁটলিগুলোকে বিয়ে করতে চায় না। মেয়েদের মা বাবা অন্ততঃ বিবাহ-বৈতরণী পার করানর জন্ম মেয়েদের স্কুলে পাঠায়, পাঠাতে বাধ্য হয়। আশ্চর্য, দেখতে দেখতে পাশের গ্রামের একটি মেয়ে বি. এ. পাশও করে ফেলল ; আর চিরাচরিত বিয়ের যূপকাষ্ঠে গলা না বাড়িয়ে দিয়ে, ঘড়ি হাতে, উঁচু-করা জুতো পায়ে দিয়ে, ব্যাগ দুলিয়ে স্কুলে মাস্টারি শুরু করে দিলে!

উমার যেদিন বি.এ. পাশ করার খবর এসেছিল সেদিন নীলাপুরের এবং কাছাকাছি গ্রামের ইতিহাসে সে ত এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা!

বুড়ো গোঁসাই নিমাই হাজরা কিন্তু হুঁকো টান্‌তে টান্‌তে প্রমাদ গুণল। বলল, 'নাঃ, কলি এবার পূর্ণ হল, বুঝলে হে তোমরা। মেয়েরা পর্যন্ত বি. এ. পাশ করল!'

তা নিমাই হাজরা কলিকালের ভয়ে একটু ভীত বই কি! গায়ে নামাবলি, গলায় তুলসী কাঠের মালা—কিছু বৃদ্ধ শিষ্য ও তরুণী শিষ্যা নিয়ে নিমাইয়ের দিনকাল ভালই যাচ্ছিল। ঝামেলা বাধাল স্কুলের পড়ুয়ার দল। ওরা যত পড়াশোনা শিখছে, ততই এদের প্রতি অবিশ্বাস বেড়ে চলেছে।

প্রসাদের জন্য ডান হাতটা বাড়াল শিষ্য গোপাল, বাম হাতটাকে ডান হাতের কনুইতে ঠেকিয়ে রেখে। কারণ একহাতে গুরুদেবের প্রসাদ নেওয়া পাপ। বলল, 'যা বলেছেন গোঁসাইজী, একেবারে

খাঁটি কথা। নীলাপুরের স্কুলের কাছ দিয়ে সেদিন আসছিলাম। তা কী দেখলাম গোঁসাইজী! সব মেয়েরা মেমসাহেব হয়ে গেছে, এই পায়ে জুতো—'

'এ্যাঃ!' নিমাই একেবারে আঁৎকে উঠল : 'পায়ে জুতো? মা লক্ষ্মীদের পায়ে জুতো? তুই কি আমাকে সত্যি বলছিস, গোপাল?'

হুঁকোয় একটা মারাত্মক টান দিয়ে গোপাল বলল, 'আপনার কাছে মিথ্যে কথা!'—বলেই গোপাল খানিকটা জিভ বের করল।

'চৈতন্য চরিতামৃতে, বুঝলে হে গোপাল, কলির আগমনের এই সব লক্ষণ দেওয়া আছে।' গোঁসাইজী জোড়হাত করে নমস্কার করল।

তা এসব হল, কয়েক বছর আগেকার ঘটনা। মেয়েদের বি.এ. পাশের চাঞ্চল্যকর এবং মুখরোচক ঘটনাগুলোও নীলাপুরে ক্রমে ক্রমে একদিন সহজ হয়ে এল।

ছেলেদের হাইস্কুল, মেয়েদের স্কুল, একটা পোস্টাফিস, একটা ছোট হাট, হাতুড়ে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আর মরানদী—এই সব নিয়ে নীলাপুরের জীবন ঢিমে ত্রিতালে চলে আসছিল। হঠাৎ সেই স্তিমিত, নিরুদ্ধ জীবন একটা প্রবল নাড়া খেয়ে চমকে উঠল।

সেবার ইলেক্‌শানের আগে যে জোয়ার এসেছিল, সে জোয়ার নয়। সে জোয়ার ইলেক্‌শানের শেষেই ভাঁটা হয়ে যায়। দু-একটা মিটিং, কিছু বক্তৃতা, কিছু কেচ্ছা, গালাগালি, তারপরে দলে পড়ে হুজুগে কাউকে ভোট দেওয়া, তা এসব মানুষ শীগ্‌গীর ভুলে যায়। কিন্তু এ জোয়ার ভোলা যায় না।

প্রথমে লোকে বিশ্বাস করেনি, করার কথাও নয়। কে জানত প্রায় দুশ' বছরের জমিদারীগুলো একদিন উঠে যাবে। আর একথা বিশ্বাস করাও কঠিন। ইংরেজ চলে গেছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে। তাতে রাম শ্যাম যদু মধুর কি হল? সেই ত তারা চাষ করে, বন্যা না হলে পৌষ মাসে ধান কাটে, ধান বিক্রী করে, খাজনা দেয়, মামলা মোকদ্দমা করে, অসুখে ভুগে ভুগে মরে। ওদের এই ছকে-

বাঁধা জীবনে স্বাধীনতার কোন মহত্তর বৈচিত্র্য বা স্বাদ পৌঁছয়নি। ওদের কাছে সেই খোল নলচে দুটোই ঠিক আছে।

পোস্টাফিসে যে অর্ধসাপ্তাহিক খবরের কাগজটা আসে তা থেকেই প্রথম সংবাদটা জানা গিয়েছিল। জমিদারী উঠে গেল—পঁচিশ একরের বেশি জমি রাখাও যাবে না। সব উদ্বৃত্ত জমি সরকার নিয়ে নেবে ; নিয়ে যাদের জমি নেই, তাদের মধ্যে নাকি ভাগ করে দেবে।

নীলাপুরের জীবনে এর চেয়ে চাঞ্চল্যকর খবর সাম্প্রতিক কালে আর আসেনি। এ অঞ্চলে দু'আনা, এক আনা, তিন পাই, আড়াই গণ্ডা অংশের টিমটিম করা হাড়কিপ্টে কিছু কিছু জমিদার ছিল। তারা চিন্তা করতে বসে গেল। এবার কি হবে ? জমিদারী গেল, যাক্। কারণ আজকাল প্রজারা জমিদারকে তোয়াক্কা করে না, সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। বাড়ির বড় ছাগলটা, পুকুরের বড় মাছটা, বাড়ির ভাল তরিতরকারী—আগেই জমিদারবাবুর সেবায় লাগবে—এ কৃতজ্ঞতা বোধ আজকাল আর প্রজাদের মধ্যে বড় একটা অবশিষ্ট ছিল না। তাছাড়া যে ছেলেরা এখন লেখাপড়া শিখছে তারা ত ধরাকে সরা জ্ঞান করে। যদি প্রজাদের উপর অত্যাচারই না করতে পারব, তাদের ঘরে আগুন দিতে, বাস্তুভিটে ছাড়াতে, তাদের সর্বস্বান্ত করতে না পারব, তবে জমিদারী থেকেও যা, না থেকেও তাই। অর্থাৎ জমিদারীর আসল যে স্বাদ, সরকার আগেই ওকে তুলে দিয়েছে। জমিদাররা ইংরেজের পদসেবা করেও কিছু করতে পারল না। স্বদেশীদের ঠেঙানর ব্যবস্থা করে দিতেও জমিদারদের বড় আনন্দ ছিল। কিন্তু হায় ! উল্টে গেল হালটা।

তা জমিদারী যেমন নিচ্ছে, তেমন ক্ষতিপূরণও দিচ্ছে সরকার। যার যত কম আয়, তার ক্ষতিপূরণের হার তত বেশি। সেদিক দিয়ে তাদের মাথাব্যথা বিশেষ নেই। তবে হ্যাঁ, টাকাটা পেতে দেরী হবে। হয়ত কিছুটা নগদেও হবে না। তাতেও ভাল। যে গাইকে গুঁতিয়েও দুধ পাওয়া যেত না, তা সেই গাই ত যাই হোক কিছু পাইয়ে দিল।

কিন্তু ঝামেলাটা হল পঁচিশ একরের বেশি খাস জমি নিয়ে।

গ্রামের জমিদার, মধ্যবিত্ত লোক সব ছাড়তে পারে, কিন্তু জমি ছাড়তে পারে না। ওদের জীবনের মূল ভিত্তি হল জমি। এই জমি যদি সরকার নিয়ে নেয়, তবে কি হবে ?

তিন আনা, ছু আনা, একআনা, আড়াই গণ্ডার জমিদাররা বৈঠকে ভীড় করে বসল। 'এ' ফর্ম, 'বি' ফর্ম, 'চুয়াল্লিশের তুই' ইত্যাদি আইনের নানান ধারা নিয়ে আলোচনা চলল। জমিদারী ছোট হলে হবে কি, মামলা মোকদ্দমা করে এরা আইন সম্পর্কে বড় ওয়াকিফহাল। কারণ বে-আইনী কাজ করতে হলেও আইনটাকে ত আগে জানা দরকার।

আড়াই গণ্ডা জমিদারের নায়েব চাণক্য দাস, শেষ পর্যন্ত একটা উপায় বাৎলে দিল। বলল, 'ঠিক হয়ে যাবে হুজুর, জমিগুলোকে রাতারাতি পুরনো তারিখ দিয়ে বেনামী করে ফেলুন। পঁচিশ একরের বেশি জমি ছেলে-বৌর নামে রেজেষ্ট্রী করে দিন; ল্যাঠা চুকে গেল। যেমনি গবেট মার্কা সরকার, তেমনি তার গবেট মার্কা বুদ্ধি।'

গড়গড়ার নল টানতে টানতে আড়াই গণ্ডার জমিদার বিভীষণ চৌধুরী মশাই চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'তা, আমার নায়েবের পেটে যে-টুকু বুদ্ধি আছে :মশাই, আপনাদের সরকারের মন্ত্রীদের পেটে ততটুকু বুদ্ধিও নেই। আবার ঝানু সব আই. সি. এস. সেক্রেটারী, এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী, ডিরেক্টার, ডেপুটি ডিরেক্টার, এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিরেক্টার, বড়বাবু, কেরানী, চাপরাশী, ফাইল, স্ট্যাম্প—ডান হাত বাঁ হাত, শালার—বলে বাকীটা তিনি আর বললেন না; শুধু তুটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বারবার নেড়ে নেড়ে অর্থটা সমবেত সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

সকলে হেসে উঠল।

'তা নায়েব'—পাশের গ্রামের জমিদার হরনাথ মহাপাত্র বললেন, 'এই তোমার হোল, যাদের ছেলে কি বৌ নেই, তাদের জমি বেনামী হবে কি করে ?'

'হবে, হুজুর হবে—বুদ্ধি থাকলে, মেয়ের পেটে যে ছেলেমেয়ে

হবে তার নামেও বেনামী করা যায়।' এই বুদ্ধির সন্ধানটুকু দিয়ে নায়েব চাণক্য দাস উঠে গেল লম্বা প্যাকাটি মার্কা শরীরটা নিয়ে।

নীলাপুরের লোনামাটি, মরানদী আর স্তিমিত অপরাহ্ণের জীবনে সেই প্রথম একটা সাড়া জাগল। কারণ এখন মধ্যবিত্ত সমাজের শেকড়ে টান পড়েছে। যে জমি তাকে বংশ বংশ ধরে ফসল জুগিয়ে এসেছে, যে জমি তাদের জীবনের একেবারে মূল ভিত্তি, সেই ভিত্তিতে যে আজ মরণ আকর্ষণ !

দেখতে দেখতে একটা সেটেলমেণ্ট অফিস নীলাপুরে খোলা হোলো। ট্রাউজার আর হাওয়াই সার্টপরা অফিসার, কেরানী, চাপরাশী, স্তূপীকৃত ফাইলপত্র, টেবিল, চেয়ার, এমন কি টানা পাখা পর্যন্ত নীলাপুরের অফিসে এসে গেল। লোকে অবাক হয়ে দেখে, সেই নীলাপুরে এখন যেন প্রতিদিন হাট লেগে গেছে। অফিসে কত লোকের ভিড়! সারাদিন কাজ চলে। গ্রামের দু'এক জন বেকার অশিক্ষিত যুবক চাপরাশীর কাজে, বাবুদের বাড়ির রান্নার কাজে লেগে গেল। তাদের হাত দিয়ে রাত্রির অন্ধকারে যোগাযোগ চলল অফিসারের সঙ্গে জমিদারের নায়েবদের। কোথাও বা সরাসরি টাকার খেলা চলতে লাগল। ইংরেজ আমলে কেরানীকুলের বা অফিসারদের তবু একটু ভয়ডর ছিল। কারণ তারা জাতে সাহেব, দরকার হলে লাথি মারতে তাদের বাধত না, মানুষ হিসেবেও তারা 'ডিসিপ্লিনড্'। কিন্তু এই খদ্দর-পরা দিশি সাহেবদের না আছে ধার, না আছে ভার।

এখন নীলাপুরের সেটেলমেণ্ট অফিসে মোটামুটি একটা রেট বাঁধা হয়ে গেছে। প্রতি একর জমি সরকারের কাছে লুকোবার জন্য একশত টাকা। এখন আর কোন অসুবিধা নেই। সরকারের একটি প্রায়-উঠে যাওয়া ডিপার্টমেণ্টের উদ্বৃত্ত কর্মচারীরা এই নতুন ডিপার্টমেণ্টে এসেছেন। তা তাঁদের এই বামহস্তের ক্রিয়াকলাপের সুনাম আগে থেকেই ছিল। সে সুনাম ও ঐতিহ্য এই ডিপার্টমেণ্টে এসে তাঁরা বজায় রাখলেন শুধু নয়, সেই ঐতিহ্যকে তাঁরা সম্প্রসারিত করলেন।

জমিজমার ব্যাপার নিয়ে সেদিন ডাঃ অসিতকে নীলাপুর অফিসে আসতে হয়েছিল। স্বদেশবাবু আর এই সবের মধ্যে থাকতে চান না। কিন্তু জমি যখন আছে, তা সরকারকে দিতে হলেও ত অফিসে যেতে হবে।

লোকজনে ভর্তি সেই অফিসে এসে অসিত প্রথমে কিছু খুঁজে পেল না। কোথাও অনুসন্ধান অফিস নেই। কেবল এক গাদা দালালশ্রেণীর লোক বাইরে বসে শিকার ধরছে, আর চেষ্টা করছে কার কাছ থেকে কত টাকা চাপ দিয়ে নিতে পারে।

অসিতকে অনেকেই চেনে। তাই দালালরা অসিতের কাছে ভিড়ল না। অসিতকে নিজেই একজন কেরানীবাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হল।

কেরানী মদনবাবু তখন পাশের কেরানী মহিমবাবুর সঙ্গে তাঁর অদ্যকার মধ্যাহ্নভোজনের বিস্তৃত বিবরণ দিচ্ছিলেন।

'তা এ অঞ্চলে মাছের স্বাদ আছে, বুঝলেন না মহিমবাবু। সের খানেক কৈ মাছ আর আধ সেরটাক ঘি গত কাল একজন দিয়ে গেছল। দেখুন, এই এত বড় কৈ মাছ'—মদনবাবু হাত দিয়ে কৈ মাছের দৈর্ঘ্যটা দেখালেন। 'বাড়ির ঝিটা যা রান্না করেছিল না! সে আপনাকে বোঝাতে পারব না।'

মহিমবাবু বললেন, 'যে ঝি রেখেছেন, সে যা রান্না করবে তাই আপনার জিভে অমৃত লাগবে; তা কৈ মাছ হোক বা পুঁটি মাছ হোক।'

'আমাকে একটা জিনিস একটু বুঝিয়ে বলবেন কি?' অসিত দাঁড়িয়ে থেকে বলল।

এতক্ষণে কেরানীবাবু অসিতের দিকে তাকালেন। কিন্তু ঝি পরিবেশিত এই ভোজন রস বর্ণনার উপভোগ্য মুহূর্তে তাঁকে বাধা দেওয়ায় তিনি বড় বিরক্ত হয়ে বললেন, 'দেখছেন না আমি কথা বলছি—কি রকম ভদ্রলোক মশায় আপনি?'

অসিত বিনীত ভাবে বলল, 'কথা বলছেন সে আমি শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু আমারও যে একটু কথা বলার দরকার আছে।'

'আছে? তাতে আমাকে কি করতে হবে?'

'কিছু করতে হবে না, শুধু যদি বলেন এ ফর্মগুলো কোথায় জমা দেব?'

'কিসের ফর্ম?'

অসিত ফর্মগুলো দেখাল।

মদনবাবু মহিমবাবুর দিকে তাকিয়ে অসিতকে কেবল আঙুল দিয়ে ওপাশের একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। তারপর সেই পুরাতন ভোজন-রসামৃত বর্ণনায় ফিরে গেলেন।

অসিত একটু সময় দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে সেই চেয়ারটার দিকে এগিয়ে গেল।

ডিলিং ক্লার্ক অনিলবাবু কিন্তু বড় মধুর স্বভাবের লোক! তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, 'বসুন, আপনি বসুন।'

অসিত চেয়ারটায় বসতে বসতে বলল, 'এই ফর্মগুলো আমি জমা দিতে চাই। আর জানতে চাই, এই জমা দেওয়া হলেই আমাদের কাজ শেষ হল কি না?'

অনিলবাবু ফর্মগুলো উল্টে পাল্টে অনেকক্ষণ দেখলেন। দেখতে দেখতে তাঁর চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। 'ওরে বাবা। এ যে পঁচাত্তর একর জমি। এই অফিসে এ পর্যন্ত এত জমি কেউ সারেণ্ডার করেনি।

অনিলবাবু চুপিচুপি বললেন, 'সরকারকে এতগুলো জমি দিতে চান দিন। কিন্তু কমপেনসেশান কবে পাবেন, আমরা তা বলতে পারব না। কি এই সরকার চলে গেলে যে সরকার আসবে, সে যে আপনাকে কমপেনসেশান দেবেই, বুঝলেন না, তা নাও হতে পারে?'

'না, কিছু বুঝতে পারলাম না।'

'আপনার বোধ হয় সরকারি অফিসে যাতায়াত খুব বেশী নেই?'

'না, আদৌ নেই।'

'ও, তাই একটু অসুবিধে হচ্ছে। তা, আপনার বাবার ত প্রচুর জমিজমা আছে!'

'প্রচুর নয়, কিছু আছে।'

'আপনি ওঁকেই আসতে বলুন না? আপনি যাই হোক্, বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে হাজার হলেও, ছেলেমানুষ নয় কি?'

'না।' অসিত অত্যন্ত বিরক্ত হচ্ছে মনে মনে।

'না কি? আপনি এসব কিছু বোঝেন?'

'কোন কিছু বোঝবার দরকার আছে বলে আমি মনে করছি না।'

'কিন্তু এই জমি, এই ফর্ম, এই কমপেনসেশান, এসব ব্যাপার যে জটিল, সে ত বোঝেন?'

'এ সবের চেয়েও জটিল ব্যাপার আমাকে জীবনে করতে হয়েছে।'

অনিলবাবু একবার নড়েচড়ে বসলেন। বললেন, 'আপনি বোধহয় পড়াশোনা করেন?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে? জমিজমা দেখাশোনা?'

'না।'

'তবে? স্কুলমাস্টারি?'

'না।'

'তবে একটা কিছু করেন ত?'

'করি।'

'সেটা কি?'

'ডাক্তারি।'

'ওঃ, আপনি ডাক্তার। বেশ বেশ, কোত্থেকে পাশ করেছেন?'

'সেটার সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক?'

'না না, বিরক্ত হচ্ছেন কেন, এই এমনি জিজ্ঞেস করলাম। আমরাও লেখাপড়া জানা ভদ্র-বাড়ির ছেলে। বুঝলেন না?'

'সে ত এতক্ষণ ধরে খুব বুঝেছি। আপনাদের অফিসারের সঙ্গে একটু দেখা করতে দিন আমাকে। তিনি কি বলেন দেখি?'

'তিনি ত আজ অফিসে আসেননি। গতকাল কলকাতা গেছেন।'

'তা হলে আমি পরে আসব।'

অনিলবাবু আবার বললেন, 'হ্যাঁ, বলি কি আমার প্রপোজালটা ভেবে দেখুন। মিছিমিছি এই সরকারকে এতগুলো জমি হাতে তুলে দিয়ে লাভটা কি, মশাই? তার চেয়ে আপনিও বাঁচুন, আমরাও বাঁচি। হেঁ হেঁ, বুঝলেন না?'

অসিত গম্ভীর হয়ে বলল, 'কিন্তু আপনাদের বাঁচাবার সাধ্য যে কারুর নেই। আপনাদের ক্ষয়রোগে ধরেছে।'

'এঁ্যা, বলেন কি!' অনিলবাবু চমকে উঠলেন, 'আমার টি. বি. হয়েছে? আপনি ডাক্তার হয়ে একথা বলছেন!'

'না, আপনার টি. বি. হয়েছে কি না, না দেখে কি করে বলব। তবে ক্ষয়রোগ হয়েছে ঠিকই। জীবনের ক্ষয়রোগ। অনেষ্টি, হিউম্যানিটি—এসবের মধ্যে ক্ষয়রোগ দেখা দিয়েছে। একে বাঁচান যাবে না! এখন আসি। নমস্কার।' অসিত উঠে পড়ল।

একটা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে অসিত মরা নদীটার ধার দিয়ে সাইকেলটা ঠেলতে ঠেলতে এগুতে লাগল। সামনেই গার্লস স্কুল। আচ্ছা, নমিতার সঙ্গে একবার দেখা করে গেলে হয় না! সেই রাত্রে তাঁকে এগিয়ে দিয়ে যাবার পর আর দেখা হয়নি। অসিত গেটের কাছে এসে দাঁড়াল। স্কুল ছুটি হয়ে গেছে।

'ডাক্তারবাবু যে!' ক্লার্ক ভুবনবাবু বললেন।

'হ্যাঁ, হেডমিসট্রেস আছেন নাকি?'

'কোয়ার্টারে আছেন। আপনি বসুন, ডেকে দিচ্ছি।'

অসিতবাবু এসেছেন শুনেই নমিতা তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এল। হেসে বলল, 'কী সৌভাগ্য আমার!'

'এদিকে আমার দুর্ভাগ্যের অন্ত নেই।'

'কেন, কি হল?' নমিতা কি একটা আশঙ্কার কথা ভেবে চমকে উঠল একটু!

'না, তেমন কিছু হয়নি। সেই দুপুরে বেরিয়েছি। সেটেলমেন্ট অফিসে একটু কাজ ছিল। কিন্তু সেখানে যে ব্যাপার দেখলাম, তাতে মাথা ঠিক রাখাই দায়।'

'যাই হোক, মাথা ঠিক রেখে ফিরে এসেছেন ত ?'

নমিতা অসিতকে সঙ্গে নিয়ে নিজের ঘরে এল।

॥ ৬ ॥

অসিত বেরিয়ে যাবার পরে অনিলবাবুর টেবিলে কেরানীকুল ভীড় করে এল : 'কি হল ? কি হল, মশাই ?'

একজন বলল, 'ডোর কেটে গেল বলে মনে হচ্ছে!'

'মাছটা বড় ছিল বোধহয়'—আর একজনের মন্তব্য।

এতগুলি প্রশ্নের সম্মুখে অনিলবাবু মাথায় হাত দিয়ে নির্বাক হয়ে বসে রইলেন শুধু।

ভোজনবিলাসী মদনবাবু বললেন, 'আমি তখন-ই বুঝেছি, ওকে টেনে তোলা যাবে না। আর কি চ্যাটাং চ্যাটাং কথা! জিভ ত নয়, যেন ধারাল ক্ষুর।' তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'তা কত জমি ছিল ?'

অনিলবাবু এতক্ষণে মুখ খুললেন। বললেন, 'পঁচাত্তর একর।'

'পঁচাত্তর একর! অফিসসুদ্ধ সকলে এক সঙ্গে যেন কোরাস্ গেয়ে উঠল। ইস্, এমন একটা চান্স হাতছাড়া হয়ে গেল!'

মহিমবাবু দুঃখের সঙ্গে বললেন, 'কোনমতেই কি টোপ গিলল না ?'

'নাঃ। কত করে বললাম, আপনি এসব জটিল ব্যাপার বোঝেন না, বাবাকে পাঠিয়ে দিন। তা আমায় বলল, এর চেয়েও জটিল জিনিস আমাকে বুঝতে হয়েছে। নিন্, এখন ঠ্যালা সামলান!'

পাঁচটা বেজে গেছে। এখন অফিস ছুটির সময়। তবু যেন কারুর বাড়ি যাবার ইচ্ছে নেই। সকলেই অনিলবাবুকে ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে।

মদনবাবু আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'ছেলেবেলায় পড়েননি, একবার না পারিলে দেখ শতবার। বুঝলেন না অনিলবাবু, চাই

পারসিভিয়ারেন্স। অধ্যবসায়। জগতে কোন মহৎ কাজ এই অধ্যবসায় ছাড়া হয় না। বাছাধনকে আবার আসতেই হবে। তখন আর একবার টোপ ফেলে দেখুন। বলুন, সরকারকে মিছেমিছি কেন দিচ্ছেন মশাই, দেশের কোন চ্যারিটেবল ইনস্টিট্যুশানকে দিয়ে দিন না! তাতে পুণ্য আছে, নামও আছে। এইভাবেই স্টার্ট করুন। তারপর একটু স্টাডি করে দেখুন, হাওয়া কোন্‌দিকে। যদি দেখেন পালে হাওয়া লেগেছে, তবে একটু রশি আলগা করুন। হাওয়াটা জোর লাগুক, তারপব দিন টান: মদনবাবু হাত দিয়ে টান দেবার আর্ট'টা দেখিয়ে দিলেন। 'তারপর টেনে তুলুন। এই হল কায়দা। হুঁ! কি যেন কন্ আপনারা! হালার কত লোকরে দেইখা দেইখা কেশে পাক ধরল। হাবামজাদা হইল খোকা, পোলাপান।'

অসিতের উপর মদনবাবুর রাগ কিছুতেই যাচ্ছে না। ঝি'র রান্নার কথা তিনি রসিয়ে রসিয়ে বলতে যাচ্ছেন, এমনি রসঘন মুহূর্তে বাধা! যত সব বেরসিক লোক জোটেও এখানে!

অনিলবাবু বললেন, 'আর কি কথা বলার ঢং। বেটার সবটাতেই 'না'। শেষকালে শালা বলে কি না—'

'আমার দেশের বাবুকে গাল দেবেন না বাবু,—' হঠাৎ কেরানী-বাবুদের আড়াল থেকে কে একজন বলে উঠল।

'তুই কে—ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির এলি বাবা?'

যুধিষ্ঠিরটি এগিয়ে এল।

'ও বাবা—এ যে আমাদের যুধিষ্ঠির নয়, অর্জুন। তা তৃতীয় পাণ্ডব, তোমার এতে আপত্তি কেন!'

অর্জুন তখন রাগে ফুলছে।

'ওঁকে চেনেন না। উনি স্বদেশবাবুর ছেলে। ওঁর বাবা গান্ধীর মত লোক হাঁ।'

'গান্ধী? কি যে বলছ বাপধন!'

একজন কেরানী বলে উঠল, 'জানেন না, 'গান্ধীর যত রাগ বাঙালীদের ওপর। মনে নেই, নেতাজীকে কি ল্যাঙটাই না মারলে!'

আর একজন বলল, 'না হে না, যত টান মুসলমানদের ওপর। পাকিস্তান হল কেন? পাকিস্তান হল গান্ধীর জন্যে। কেবল জিন্নাকে খোসামোদ করছিল বলে!'

'আঃ, কি যে বল সব তোমরা।' মদনবাবু সকলকে থামিয়ে দিলেন। বললেন 'তা বাবা, তৃতীয় পাণ্ডব, গান্ধীপুত্রটি কত বড় ডাক্তার?'

অর্জুন বলল, 'আমরা মুখ্যুলোক কি জানি? লোকে বলে নাকি এম. এস. পাশ করার পর এম. বি. ডি. টি. না যেন কি পাশ করেছে।'

সকলেই একটু হতাশ হল।

মদনবাবু তবু থামলেন না। বললেন, 'যে দেশে বনস্পতি নেই সে দেশে এরণ্ড গাছই হল বনস্পতি, এরণ্ড কাকে বলে জানিস রে। তৃতীয় পাণ্ডব?'

হো হো করে হেসে উঠলেন মদনবাবু।

অর্জুন বলল, ক্ষুব্ধ গলায় 'আমাকে বলছেন, বলুন। ডাক্তারবাবুর সামনে কখ্‌খনো ভুলেও ওসব কথা বলবেন না। বড় রাগী মানুষ ডাক্তারবাবু। এমনি গরীব রোগীর বাড়ির লোক টাকা দিতে গেলে চটে যায়। বলে—খেতে পাস না, পরতে পাস না, হতভাগাদের আবার টাকা দিতে আসা! আজ যা করেছেন, সব দেখেছি বাবু আর কক্ষনো ঐ কাজটি করবেন না। কত জমিদারবাবুত আপনাদের কাছে হেঁ, হেঁ, করে দিন-রাত। অসিতবাবু এসেছে কখনও? না, তার বাবা স্বদেশবাবু?'

অর্জুন যেন একটা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ জয় করে বেরিয়ে গেল। অর্জুন চলে যাবার পর অফিসটা থমথম করল কিছুক্ষণ। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। অফিস জনশূন্য হয়ে গেছে। কেবল চেয়ার টেবিল আর ফাইলগুলো ক্লান্ত, পরাজিত, অন্ধকার বুকে নিয়ে পড়ে রইল।

নমিতা অসিতকে নিজের ঘরে নিয়ে এসে, চেয়ারে বসতে বলে স্টোভটা ধরানর চেষ্টা করছিল। কয়েকদিন স্টোভটা জ্বালা হয়নি, তাই জ্বলছিল না। ঘেমে উঠছিল নমিতা আস্তে আস্তে।

অসিত বলল, 'কি হল?'

'কি জানি কেন, জ্বলছে না।'

'সরুন, আমি একবার চেষ্টা করি।' অসিত নমিতার কাছে এল: দিন স্পিরিটের বোতলটা। কপাটটা বন্ধ করে দিন, হাওয়া আসছে।'

নমিতা কপাটটা বন্ধ করে দিল।

বাসন্তী বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিল। নমিতাকে এ সময় কপাট বন্ধ করতে দেখে কি ভেবে ঘরের ভেতর তাকাল। তারপর অসিত আব নমিতাকে কাছাকাছি মেঝেতে বসে থাকতে দেখে রীতিমত উল্লসিত হয়ে উঠল। ওঃ, ব্যাপারটা তাহলে বেশ এগিয়েছে!

বাসন্তী সরে যাচ্ছে, এমন সময় অসিত উঠে দাঁড়াল: 'নিন, এবার আপনার স্টোভ জ্বলেছে। কপাটটা খুলে দিন।'

নমিতা কপাটটা খুলে স্টোভটাকে কোণের দিকে একটু সরিয়ে নিয়ে গেল। যাতে হাওয়া না লাগে।

অসিত বলল, 'শুধু চা কিন্তু আমি খেতে পারব না।'

'সত্যি! তবে কি খাওয়াব আপনাকে?'

অসিত চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে আরামে বসল।

নমিতা থম্‌কে দাঁড়াল। অসিত কি খেতে ভালবাসে সে জানে না। 'আচ্ছা লুচি করি? লুচি খেতে ভালবাসেন?'

'যাই করুন, কিছু বেশি করে করবেন।' অসিত তেমনি চোখ বন্ধ করে বলল।

নমিতা এই ছেলেমানুষিতে হেসে উঠল, 'দেখি, কত খেতে পারেন আপনি!'

'না, দয়া করে সে চেষ্টা করবেন না। তার চেয়ে চায়ের সঙ্গে একটু কিছু দিন। মুড়ি, কি বিস্কিট থাকলে তাই দিন না?'

'দুটোর কোনটাই যে নেই! দাঁড়ান, উমা আর নন্দিতাকে ডেকে আনি, ওরা লুচিটা বেলে দেবে।'

অসিত বলল, 'অমনি ভয় পেয়ে গেলেন? আমি রাক্ষস নই, বিশ্বাস করুন?'

একটু পরে উমা আর নন্দিতা তাড়াতাড়ি নমিতার ঘরে এল।

উমাকে দেখে অসিত সোজা হয়ে বসল, ‘এই যে দিদিমণি, আসুন ?’

তারপর নমিতার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘জানেন, এই দিদিমণি আমার থানার প্রথম বি. এ. পাশ মহিলা।’

‘আব তুমি যে এই থানার প্রথম, কি বলে, এম. এস. সি. এম. ডি. ডাক্তাব আরও কত কি, সে কথা আর কেউ জানে না, না ?’ উমা চেঁচিয়ে বলে উঠল।

অসিত বলল, ‘ঝগড়া পরে করবে, এখন তাড়াতাড়ি বড়দিমণিকে সাহায্য কর। আমি লুচি খাব শুনে উনি ঘাবড়ে গেছেন। কি জানি কত শ' পাট লুচি কবতে হয় !’

নমিতা লজ্জা পেয়ে বলল, ‘তাই বুঝি ?’

‘ওটি কে, নতুন দেখছি ?’ অসিত নন্দিতাব দিকে তাকিয়ে বলল।

‘আমার পার্টনার, বন্ধু—নন্দিতা দত্ত।’

নন্দিতা নমস্কার করল।

উমা বলল, ‘ও খুব ভাল গান জানে। তুমি ত গান শুনতে পেলে বেঁচে যাও।’

‘তাই নাকি ? আমায় গান শোনাবে ? আমি পেশায় ডাক্তার, কিন্তু গান শুনতে পেলে সব ছেড়ে দিতে রাজি আছি।’

নন্দিতা করুণ মুখে বলল, ‘আমি যে এখন গাইতে পারি না !’

‘কেন, কি অসুখ ?’ অসিত একটু সোজা হয়ে বসল।

‘গ্যাসট্রিক আলসার।’

‘ও। এখন কেমন ? ব্লাড যায় নাকি ?’ অসিত নন্দিতাকে আপাদমস্তক ভাল করে দেখতে লাগল : ‘এখনও ত খুব ভাল বলে মনে হচ্ছে না ?’

নমিতা মৃদু হেসে বলল, ‘রোগী না দেখেই এ কি রকম ডাক্তারি, আপনার ?’

‘কে বলল, আমি রোগী দেখিনি ?’

‘কই, কোথায় দেখলেন ?’

‘কেন, এইত চোখ মেলে দেখলাম।’

নমিতা থেমে গেল। সেই মাঝির বাড়ীর ঘটনা তার মনে পড়ছিল। রোগীর কথা শুনলে অসিতের মেজাজটা যেন পাল্টে যায়।

‘আচ্ছা তোমায় দেখব, ভাল করে দেখব, যখন তোমাদের বড়দিমণি বলেছেন। কিন্তু তার আগে আমাকে খেতে দাও ত। ক্ষিধেয় যে ডাক্তারের জন্যেই ডাক্তার ডাকতে হবে !’

লুচি খেতে খেতে ওরা সকলে মিলে গল্প করছিল।

‘আপনার আঙুলের ওপর ওটা কিসের দাগ ?’ নমিতা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

‘কই ? ও, এই দাগটা ? ও কিছু নয়। ছাত্রজীবনের কাহিনী। বক্সিং-এর ওয়েট পরীক্ষা করে দেখছিলাম একবার পাঞ্জাবী কণ্ডাক্টারের ওপর। অবশ্য তখন রক্ত টক্ত গরম ছিল।’

‘এখন কি ঠাণ্ডা হয়েছে ?’ নমিতা মিষ্টি হেসে বলল।

‘হয়েছে, আজ তার প্রমাণ পেলাম সেটেলমেণ্ট অফিসে গিয়ে।’

নমিতা চমকে উঠল একটু।

অসিত বলল, ‘আপনাদের শহুরে সভ্য মানুষের সঙ্গে আমার এইখানেই ডিফারেন্স, মিস দাশগুপ্তা। আমি রাগ চেপে রাখতে পারি না, যদিও বোধহয় সহজে রাগি না। কিছুদূর পর্যন্ত আমি মানুষকে ক্ষমা করি। কিন্তু তারপর, আমি অন্য মানুষ।’

একটু থেমে অসিত আবার বলল, ‘দেখুন, আমার ধারণা এ গভর্নমেণ্টের দ্বারা দেশ শাসন চলতে পারে না। দিনে দিনে দেশ অধঃপাতে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আমি ডিক্টেটারশিপ পছন্দ করি। নেতাজীও সেই কথা বলেছিলেন। কারণ, মানুষের চরিত্র আজকে এমন এক নিচুস্তরে এসেছে, যেখানে নৈতিক চাপ অর্থহীন এবং আইনও উপযুক্ত নয়। ডেমোক্রেসির ত্রুটি এগুলি। একটি কেরানীকে ঘুষ নিতে দেখলেও আপনি তাকে দোষী বলে শাস্তি দিতে পারেন

না। তাকে আইনের চোখে দোষী প্রমাণ করাতে হবে এবং করাতে হলে সাক্ষী চাই। আর সাক্ষী সামনে রেখে লোকে ঘুষ খাবে—কোন গভর্নমেণ্ট তার কর্মচারীদের কাছ থেকে এতটা মহত্ত্ব আশা করতে পারে না! কাজেই এক্ষেত্রে বক্সিং-এর ওয়েট পরীক্ষা করে দেখাই বোধহয় ভাল।'

অসিত অন্যমনস্কভাবে প্লেটটা রেখে চায়ের কাপটা তুলে নিল।

'আপনাকে উত্তেজিত বলে মনে হচ্ছে কেন? কি হয়েছিল?'—নমিতা আস্তে আস্তে বলল।

'সেটেলমেণ্ট অফিসে আমি আমাদের পঁচিশ একরের বেশি জমি সারেণ্ডার করতে গেছলাম। ক্লার্ক ভদ্রলোক আমাকে বোঝানর চেষ্টা করলেন, ওগুলো গভর্নমেণ্টকে দেওয়ার চাইতে না দেওয়াই ভাল। এই স্টাফ নিয়ে গভর্নমেণ্ট চলে! আমি অবাক হয়ে গেলাম। সমাজের সব স্তরে যদি এই পচন ছড়িয়ে যায় তবে এই নতুন স্বাধীন দেশটা বাঁচবে কি করে? দেশের উন্নতির মূল কথা হল মানুষ। সেই মানুষ যদি পশু হয়, তবে কয়েকটা বড় বড় বিল্ডিং আর কারখানা নিয়ে দেশ বড় হয়ে উঠবে? ০০০ এসব আমি ঠিক বুঝতে পারি না, মিস দাশগুপ্তা।'

নমিতা শান্ত গলায় বলল, 'তবে দেশ বড় হবার উপায়টা কি?'

'উপায়—অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যে এই ডেমোক্রেসি, ব্যক্তি-স্বাধীনতা এগুলো তুলে দেওয়া। শিশু যে পর্যন্ত বড় না হয়, সে পর্যন্ত তাকে শাসনে রাখার দরকার আছে। নইলে গোড়াতেই গোল্লায় যেতে পারে। তেমনি দেশকেও প্রথম প্রথম রাখ। কড়া শাসনে থাকতে যেসব দেশে ডেমোক্রেসি সফল হয়েছে, সে সব দেশের মানুষের একটা মিনিমাম মরাল ষ্ট্যাণ্ডার্ড অনেষ্টি ছিল, দেশপ্রেম ছিল, যা আমাদের দেশে একান্তই দুর্লভ।'

অসিতকে উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। নমিতা বা উমা আর কোন প্রশ্ন তাকে করল না। বরং উমা কথার মোড় ফেরাবার জন্য বলল, 'আমার পার্টনারকে দেখবেন না, অসিতদা?'

'এই রে, ভুলে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এমনি যেটুকু পারি দেখছি, বাকিটা যে ল্যাবরেটরীর ব্যাপার।'

নন্দিতা কাছে সরে এলো।

নন্দিতার হাতটা টেনে নিয়ে অসিত ঠাট্টা করে বলল, 'আমার ডাক্তারির ফি দেবে তো? আমি কিন্তু ফি কোথাও ছাড়ি না।'

॥ ৭ ॥

শেষ রাতে বৃষ্টির শব্দ শুনে ঘুম ভাঙল নমিতার। সমগ্র আকাশ ভরে যেন অমৃত বর্ষণ হচ্ছে। একবাব বারান্দায় এসে দাঁড়াল সে। অদূরে মরানদীর তীর, বাবলা বন, আর এপারের লোনামাটির জনশূন্য উঁচু পথটা, মেঘ ও বৃষ্টিব অন্ধকারে তখন আবৃত হয়ে আছে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই বৃষ্টি দেখল সে। না, রাত্রি এখনও আছে। নমিতা ফিরে এসে শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম এল না।

এই পরম বিষণ্ণ মুহূর্তে নমিতা আজ নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করল। অসিতের জন্য কেন সে বেদনা বোধ করে! কেন এই উচ্ছল মানুষটি এই রাত্রির নিঃস্তব্ধ, অনাবৃত মুহূর্তে, তার কাছে বার বার ফিরে ফিরে আসে! তার সুন্দর চেহারা, কথা বলার ভঙ্গী, তার অপূর্ব স্বাস্থ্যোজ্জ্বল যৌবন, কেন তাকে এত আকর্ষণ করে, মগ্ন করে, ক্ষুধার্ত করে! নমিতা নিজেকে বিশ্লেষণ করতে চায়, এমন কি শাসন করতেও চায়। জীবনের প্রায় ত্রিশটি বছর সে পেরিয়ে এসেছে। তার এই ত্রিশ বছরের জীবনে কোন পুরুষের স্পর্শ পড়েনি একথা সত্য নয়, সম্ভবও নয়। কিন্তু সে স্পর্শ মুছে গেছে। কেউ বা সামান্য কোথাও একটু দাগ রেখে চলে গেছে চিরদিনের জন্য। এগুলি যে তার পাথেয়, এগুলি যে তার ঐশ্বর্য! কিন্তু অসিতের আকর্ষণ যেন স্বতন্ত্র। এ আকর্ষণ যেন সমুদ্রের গভীরতা ও বিশালতার দিকে প্রবল স্রোতে তাকে টেনে নিয়ে যেতে চায়, ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়!

প্রণবকে মনে পড়ে নমিতার। সামান্য কিছুদিন এক সঙ্গে তারা এম. এ. পড়েছিল। মার্জিত, ভদ্র, একটু আত্মকেন্দ্রিক কিন্তু অদ্ভুত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। দাদার চাকুরী সে-ই করে দিয়েছিল এবং দিয়েছিল নমিতাকে তার ভাল লাগে বলেই। নমিতা তা বুঝত। এই চাকুরী করে দিতে কত কষ্ট সে করেছিল। নমিতার যে শুধু কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল, তা নয়। তারও ভাল লাগত প্রণবকে। প্রণব একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, 'কি করবে পাশ করে?'

নমিতা বলেছিল, 'দেখি। এখনও কিছু বুঝে উঠতে পারছি না।'

'প্রফেশন যদি বেছে নিতে চাও, তবে আমি বলব, অধ্যাপনাই ভাল। সরকারী অফিসের এই মহিলা কেরানীদের ত দেখছি। কী করুণ এদের জীবন! বড়বাবু থেকে অফিসার পর্যন্ত সকলকে প্লীজ করে চলতে হয় এবং মেয়েদের প্লীজ করে চলার অর্থ একটু স্বতন্ত্র; তার প্রতিক্রিয়াও স্বতন্ত্র। এ লাইনে যেও না।'

'কিন্তু টাকা যে বেশি—' নমিতা বলেছিল।

'না, তা বোধহয় খুব বেশি নয়। তাছাড়া সম্মান আছে, শ্রদ্ধা আছে। বেঁচে থাকার জন্য এগুলো দরকার। দেশ স্বাধীন হয়েছে, টীচার্সদের বেতন বাড়াতেই হবে—আজ হোক্ কাল হোক্। তখন দেখবে টাকার দিক থেকে তুমি খুব 'লুজার' হচ্ছ না। তবে হ্যাঁ, 'গ্ল্যামার' নেই, হয়ত উত্তেজনারও অভাব থাকবে।'

'কীসের উত্তেজনা?'

প্রণব চুপ করে গেল।

নমিতা জানে প্রণব উচ্ছল নয়, অসংযতও নয়। সে বলল, 'তুমি পরীক্ষাটা দিলে না কেন? তোমার জীবন কি কেবল এই চাকরী করে কেটে যাবে?'

'না, কাটবে না।, এটা পারমানেণ্ট চাকুরী নয়।'

'তুমি যে রকম লাজুক, নিজে কিছু করতে পারবে এমনও মনে হয় না। চাকুরী ছেড়ে দিয়ে এম. এ.টা দিয়ে দাও। দুজনের অধ্যাপনায়

সংসার চলে যাবে। তাছাড়া অধ্যাপনা, প্রফেশান হিসেবে তোমার যখন ভাল লাগে।'

প্রণব এই ইঙ্গিতের ধাব দিয়েও গেল না। তার মননের স্রোতটা একটু গভীবে একটু স্বতন্ত্রভাবে চলে। বাইরে সে স্রোতের ছবি বড় একটা চোখে পড়ে না।

এম. এ. পবীক্ষার কিছুদিন আগে একদিন বিকেলে ওর অফিসে নমিতা গেছল। অফিস থেকে ওবা তুজনে বেরিয়ে এল।

হাঁটতে হাঁটতে রেড রোড ধরে ওরা যাচ্ছিল।

প্রণব বলল, 'চাকৃরীটা ছেড়ে দিচ্ছি।'

নমিতা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন, কি হল ?'

'না, কিছু হয়নি। একটা খববের কাগজের এডিটোরিয়েল ডিপার্ট-মেণ্টে চান্স পাচ্ছি।'

'মাইনে কত ?'

'মাইনে অবশ্য এখন কম। তবু লাইফে কিছু কিছু 'রিস্ক' নিতেই হয়। নইলে বড় হওয়া যায় না।'

প্রণব জীবনে বড় হতে চায়। ওর এই বড় হওয়ার সংকল্প নমিতার সেদিন খুব ভাল লাগছিল।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে আস্তে আস্তে।

প্রণব বলল, 'চল না, একটু বসি। আর হাঁটতে ভাল লাগছে না।'

সেই ঘাসে ও ছায়ার সমুদ্রে নমিতা ও প্রণব বসেছিল। এবং প্রণব একটু বেশ কাছেই বসেছিল সেদিন। ওর খদ্দরের পাঞ্জাবিটার একটা কোণ নমিতার গায়ের উপর এসে পড়েছিল যেন। ওটা সেদিন সরিয়ে দিতে নমিতার ইচ্ছা করছিল না।

'তোমার পরীক্ষা কবে ?'

'এই ত, দিন দশেক বাকী।'

প্রণব পকেট থেকে একটা পার্কার কলম বের করল: 'এটা তোমাকে দিলাম। নতুন কলম, এই ক'দিন লিখে ওটা ঠিক করে নিও।' নমিতার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে প্রণব কলমটা ওকে দিয়েছিল।

নমিতা কি বলবে কিছু বুঝতে পারছিল না। শুধু নিজের হাতটা প্রণবের হাতের মধ্যে নিঃশেষে সঁপে দিয়ে, সকল কথার কলরব থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছিল।

প্রণবের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। তারপরই প্রণব দিল্লী চলে গেছে। মাঝে মাঝে ইংরেজী কাগজে প্রণবের ছ'একটা প্রবন্ধ চোখে পড়ছিল নমিতার।

প্রণব মুছে গেছে নমিতার জীবন থেকে। শুধু তার কলমটা এখনও নমিতার নিত্য সঙ্গী।

জীবনে পুরুষ বন্ধুদের মধ্যে প্রণবকেই বেশি করে মনে পড়ে নমিতার। প্রণব বড় হতে চায়। তার বড় হওয়ার আয়োজন নিঃশব্দে, নিভৃতে হয়ত চলেছে। কিন্তু নমিতা বড় হতে চায়নি, চাওয়ার সে ক্ষমতাও তার নেই। তার জীবন বড় ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ। সেখানে বৃহতের জন্য বেদনা নেই, আয়োজন নেই। একটা মোটামুটি চাকরী হলেই তার চলে যায়। নিয়মিতভাবে বাবার সংসারে টাকা পাঠান। আর নিজের খাওয়া-পরা। তার জীবনের পরিধি এই দেয়াল-গুলোর মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। এম. এ. পড়তে পড়তে আর একটি ছেলের সঙ্গে তার কিছু বন্ধুত্ব হতে যাচ্ছিল. বড়লোকের ছেলে। কিন্তু কিছুদিন যেতেই নমিতা একটি ঘটনায় বুঝেছিল—ওই পরিচ্ছন্ন পোশাকের আড়ালে, ছেলেটি বড় মাংস-লোভী। সেইদিনই তাকে বর্বর বলে মনে হয়েছিল নমিতার। ভালবাসাহীন এই ক্ষুধাকে নমিতা বর্বরতা বলে মনে করে। সেখানে পশুর সঙ্গে মানুষের কোন পার্থক্য নেই।

কিন্তু এই সকলের চেয়ে অসিত স্বতন্ত্র। এই বর্ষণতৃপ্ত রাত্রি-শেষের বিশৃঙ্খল শয্যায়, নমিতার কেন যেন মনে হল, তার বয়সটা কমে গেছে। সে যেন প্রথম যৌবনের জোয়ার স্রোতের উদ্বেলতায় দূর বেলাভূমির দিকে এগিয়ে চলেছে—যে বেলাভূমি সমুদ্র-স্রোতের উর্বর পলিমাটির ঐশ্বর্যে, সম্পদে, শস্যে পরিপূর্ণ হয়ে আছে!

সেই রাত্রির কথা নমিতার কেবল মনে পড়ছিল। সেই শ্মশান, সেই নির্জন মরানদীর তীর, বাবলা বন, আর রাত্রির প্রথম অন্ধকারে

যখন ওরা কাছাকাছি আসছিল। অসিতের এই সুন্দর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পরিপূর্ণতাটুকু নমিতার ভাল লেগেছিল, বেশ ভাল লাগছিল। অসিতের সঙ্গে তার বাইরের পরিচয় কোন সুদীর্ঘ ঘটনাপঞ্জীর দ্বারা প্রমাণিত নয়। কিন্তু মনের পরিচয় যেন কত দীর্ঘদিনের, দীর্ঘ সময়ের আনন্দ দিয়ে নির্মিত। অথচ অসিত কত সংযত! তার সঙ্গে এই রাত্রে একা আসার ঘটনা থেকে ইচ্ছা করলেই সে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারত। আর একটু এগিয়ে গেলেই ত স্বদেশবাবুর বেসিক স্কুল। সেখানে গেলে নিশ্চয়ই অসিত অন্য কাউকে সঙ্গে দেবার ব্যবস্থা করতে পারত। কিন্তু সে তা করেনি। নমিতা তার অত্যন্ত তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা দিয়ে বুঝতে পেরেছিল, তার এই সঙ্গটুকু অসিতেরও ভাল লেগেছিল। আর গতকাল বিকেলেই ত অসিত এসেছিল। সে এসেছিল, যখন তার মন ও মেজাজ কোনটাই ঠিক স্বাভাবিক ছিল না। বোধহয় আসার কারণ তাই। যখন মন ভাল থাকে না, তখন সুন্দর কিছু পাশে থাকলে, প্রিয়জনকে কাছে পেলে বা ভাল গান শুনলে, আস্তে আস্তে মনের ছায়াটা কেটে যায়। মনের ভারসাম্য ফিরে পাবার ক্ষেত্রে সঙ্গীত বা সুন্দর দৃশ্য খুব কাজে লাগে। একথা সে একজন ইংরেজ দার্শনিকের লেখা থেকে পেয়েছিল।

আর এখানে এসে অসিতের সেই নির্লিপ্ততাটুকু নমিতার কী ভাল লেগেছিল! সেই প্রচুর খাওয়ার গল্প, যদিও অসিত একটুকুও বেশি খায় না। উমার সঙ্গে দুষ্টুমি, নন্দিতাকে পরীক্ষা করার সময় তার অপরিমিত গাম্ভীর্য—এই দৃশ্যগুলি, রাত্রিশেষের নির্জন ঘরটিতে নমিতার মনে ভিড় করে আসতে লাগল। এই অসংবৃত সহজ যৌবন-সৌন্দর্যে, এই শয্যায়, অসিতের স্মৃতি নমিতাকে ক্রমশই এই মুহূর্তে পিপাসার্ত, চঞ্চল করে তুলছিল। এই বর্ষণতৃপ্ত রাত্রিশেষ, তার কাছে দুঃসহ যৌবনের মত হয়ে উঠছিল। নমিতা ভাবল—জীবনে কে আসবে, কী আসবে, কখন আসবে সেই চিন্তা অনাগত প্রভাতের জন্য থাক্। কিন্তু আজ যে রজনী চলে গেল—সেই সুন্দর, স্মরণীয়, প্রতীক্ষিত, পিপাসার্ত রজনী— সে ত আর ফিরে আসবে না!

তখনও ভোর হয়নি। বৃষ্টির ছাঁট আসছিল। তবু নমিতা জানলাটা খুলে দিল। ছোট ছোট বৃষ্টিবিন্দু আশীর্বাদের মত তার বিছানায় এসে পড়তে লাগল। নমিতা ফিরে তাকাতেই—হোস্টেলের উঠোনের বাগানটা চোখে পড়ল—শেষ রাত্রির বৃষ্টিতে, বাতাসে, রজনীগন্ধার ডাঁটাগুলি যেখানে মাটিতে শুয়ে পড়েছে।

শেষ রাত্রির বৃষ্টির শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেছে নন্দিতার। কিন্তু সে ওঠেনি। শুয়ে শুয়ে ভাবছিল এবং মাঝে মাঝে সে এই কথাই ভাবে, যদি অসুখটা তার না সারে, যদি গানই না গাইতে পারল—তবে তার বেঁচে থাকার আকর্ষণটা কোথায়? সে ত এই দুর্বহ জীবন চায়নি। আশ্চর্য! সে কি আর ভাল হবে না? এই রুগ্ন, পীড়িত একটা অভিশপ্ত জীবন নিয়ে কেবল মৃত্যুর দিন গুণে গুণে চলে যাবে সে!

উমা আস্তে আস্তে নন্দিতার বিছানায় উঠে এল: 'তুই জেগে আছিস, পার্টনার?'

'বৃষ্টি হতে ঘুম ভেঙে গেছল। আর ঘুম আসেনি।'

'কি ভাবছিলি রে?'

'নিজের কথা।'

'কেন, পরের কথা ভাবতে পারিস না? কেন অসুখ নিয়ে এত ভাবিস বলত? আমার কষ্ট হয়।'

'তুই আমাকে এত ভালবাসিস কেন, পার্টনার?'

উমা বলল, 'এমনি, কেন জানি না।'

'আচ্ছা, আমি মারা গেলে তুই কি করবি?'

উমা নন্দিতার মুখে হাতটা চাপা দিয়ে বলল, 'শেষ-রাতে এসব কথা বলতে নেই!'

তারপর কথার মোড় ফেরাল। বলল, 'আচ্ছা পার্টনার, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস্, অসিতদার সঙ্গে কথা বলতে বলতে নমিতাদি কেমন সুন্দর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে!'

'হ্যাঁ। আমার কিন্তু বেশ ভাল লাগে। নমিতাদি এমনি গম্ভীর, কিন্তু অসিতদার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওর এই গাম্ভীর্যের আবরণটা খসে পড়ে। আর সুন্দর নমিতাদিটা বেরিয়ে আসে, আর অসিতদাও কি সুন্দর! তাকালে চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না।'

'বেশ বলেছিস কিন্তু। আচ্ছা, ওদের দুজনকে বেশ মানায়, না? দুজনকে বেশ মানিয়েছে—এটা কিন্তু খুব বেশি দেখা যায় না, জানিস্? আচ্ছা পার্টনার?'

'কি, বল না?'

'আচ্ছা, তুই কাউকে কখনও ভালবাসিসনি?'

নন্দিতা চুপ করে রইল।

বাইরে তখনও বৃষ্টি হচ্ছে। তারই শব্দ আসছে ঘরে।

'বল না রে? আমার শুনতে খুব ইচ্ছে করছে।'

'সে কথা যে বলে বোঝান যায় না, পার্টনার!'

'তুই বল, আমি ঠিক বুঝতে পারব!'

নন্দিতা বলল, 'তবে শোন, একমাত্র তোকেই আজ বলি। সেই যে-বার সেকেণ্ড টাইমে গানে ফার্স্ট হলাম কলকাতায়, তখন একটা ঘটনা ঘটেছিল। যখন কম্পিটিশান শেষ হয়ে গেল, একটি ছেলে উঠে এল সামনের সীট থেকে। নিঃসংকোচে বলল, আপনার গান খুব ভাল লাগল। তখনও রেজাল্ট বের হয়নি। আমি অধীরভাবে অপেক্ষা করছি। ক্ল্যাসিক্যাল হয়ত ভালই হবে, কিন্তু রবীন্দ্র সঙ্গীতে? কলকাতার কলেজের বহু ছাত্র-ছাত্রী কমপীট করেছিল। আমি মফঃস্বল থেকে গেছি। তাই ভয় করছিল খুব।

'ছেলেটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম। সে যে আমার অযথা প্রশংসা করছে এমন মনে হল না। তার ব্যবহার, তার কথাবলার ভঙ্গী, আমার এমনই ভাল লাগল যে, কি বলব বুঝে উঠতে পারলাম না।

'আমার মনে হয়,' ছেলেটি বলল—'আপনি রবীন্দ্রসঙ্গীতেও ফার্স্ট হবেন।'

'সেদিন এর বেশি কিছু হয়নি।'

'এ কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। একদিন কলেজে একটা চিঠি পেলাম। প্রথমে চিনতে পারিনি। পরে পরিচয় পেলাম। সেদিনের সেই ছেলেটি। সত্যি বলছি পার্টনার, সেই চিঠি পড়ে আমি আশ্চর্য হলাম। কী তার হাতের লেখা, যেমন পরিচ্ছন্ন তেমনি সুন্দর। ভাষা অত্যন্ত সংযত, মার্জিত। এতটুকু উচ্ছ্বাস নেই, অযথা প্রশংসা, তোষামোদ কিছু নেই। শুধু লিখেছিল—সেদিন এতগুলি লোকের মধ্যে আপনাকে কেন ভাল লেগেছিল, আমি জানি না! এত ভাল আমার জীবনে কাউকে লাগেনি! আপনি যখন গাইছিলেন, "আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে"—তখন আমি যেন জীবনের এক অতল গভীরতার স্পর্শ পাচ্ছিলাম। আপনার গানটির পরিবেশনা, সেই স্তব্ধ মগ্নতা, সেই আপনার নিরলংকার দেবীমূর্তি—আমাকে বিমুগ্ধ করেছিল। এ চিঠিকে অন্যভাবে নেবেন না—এ আমার আত্ম নিবেদন নয়, এ আমার পূজা—যে পূজা আমাকে পবিত্র করবে।'

'সেই চিঠির উত্তর আমি দিয়েছিলাম। এমনি করে পরিচয় হল। বড় ভাল লাগল পার্টনার, বড় ভাল লাগল। এ ভাল লাগা যে কী, তা বোঝান যায় না! আমি একবার লিখলাম—আপনার বাড়ী আমাকে নিয়ে চলুন, আপনার বাড়ির লোকজনদের আমি দেখব।'

নন্দিতা থেমে গেল।

উমা বিস্মিত হয়ে বলল, 'তারপর কি হল?'

'তারপর? হ্যাঁ বলছি, পার্টনার।' নন্দিতা তবু থেমে থাকল। বৃষ্টির শব্দ শুনল কিছুক্ষণ। বলল, 'ছেলেটি শেষ চিঠি লিখল আমাকে। সে চিঠিই আমার সব মৃত্যু বয়ে নিয়ে এল, পার্টনার। সে লিখল—আমি বিবাহিত জীবনের ফাঁস গলায় লাগিয়ে কোনভাবে বেঁচে আছি এখানে। একদিন জীবনে যেভাবে বাঁচতে চেয়েছিলাম—সে জীবন আজ অনেক, অনেক দূরে! আজ আমি তার কান্না শুনি শুধু। আর কিছু নয়। এই মৃত্যুর প্রার্থনা নিয়ে আমি যেখানে জেগে আছি সেখানে তুমি আসতে চেও না। তোমাকে আমার ভাল লেগেছিল একটি মধুর মগ্ন মুহূর্তে। সেই পবিত্র ভাল-লাগাকে

আমি ত আমার চাওয়া দিয়ে কোনদিন অপবিত্র করিনি। তুমি ত আমার জীবনে সেই তপস্যা—যে তপস্যায় আমি নিজেকে মৃত্যুত্তীর্ণ করব। আজ তার বিদায় মুহূর্ত। আর কোনদিন তোমাকে চিঠি লিখব না। শুধু তোমার স্মৃতি নিয়েই এই জীবন একদিন শেষ করে দিতে চাই।' বলেই নন্দিতা থামল। বোধহয় আর বলতে পারছিল না। উমা নন্দিতার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল একটু, ছোট মেয়ের মাথায় যেমন করে মা হাত বুলিয়ে দেয়!

ভোর হয়ে গেছে। পূর্বদিগন্তে ক্রমে ক্রমে আলোর আবির্ভাব স্পষ্টতর হচ্ছে। নন্দিতা উঠে পড়ল। চোখ দুটো ভাল করে আঁচলে মুছে নিয়ে একবার তাকাল, সেই মুহূর্তে তাব চোখে পড়ল, রাত্রির বৃষ্টি আর বাতাসে বিশৃঙ্খল হয়ে যাওয়া উঠোনেব সেই বাগানটা—"কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে বজনীগন্ধা বনে।"

॥ ৮ ॥

নীলাপুরের মন্থর জীবনে গার্লস হাইস্কুল এবং সেটেলমেণ্ট অফিসটা একদিন যে আলোড়ন নিয়ে এসেছিল, সে আলোড়নও ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এল। সেই মেয়েদের একই রঙের শাড়ী পরে স্কুলে যাওয়াটা, মরানদীপারের হাটের সামনের চায়ের দোকানের আড্ডাধারী ছেলেদের চোখে, দূরের গ্রামের দু'একজন পথিকের চোখে বা রাত্রিতে জোয়ারের জন্য অপেক্ষমাণ ধান-বোঝাই নৌকোর মাঝিদের চোখে, ধীরে ধীরে সহজ হয়ে আসছিল। মেয়েদের যে বয়সে স্বামীগৃহের অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে বা রান্নাঘরে পরিবারের পঙ্গপালের জন্য রান্নায় ব্যস্ত থাকার কথা—সে বয়সে মেয়েরা বেণী দুলিয়ে, জুতো পায়ে দিয়ে, হাতে বই-খাতা নিয়ে, মাথা উঁচু করে স্কুলে যায়-আসে নীলাপুরের ইতিহাসের এতবড় বিস্ময়ও একদিন শেষ হয়ে এল। আজ আর সেই রৌদ্র-মাখান লোনা মাটির উঁচু পথটা,

আগের মত বেলা হলে ক্রমশ জনহীন হয়ে ওঠে না। এখন মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার সময়, সেটেলমেণ্ট অফিস খোলার সময়, দূরের গ্রামগুলো থেকে দলে দলে লোক আসতে আরম্ভ করে। গায়ে ময়লা হাফসার্ট, কোঁচাটা উল্টে কোমরে গুঁজে দেওয়া, কারুর পকেটে সুতো বাঁধা চশমা, এক মুখ দাড়ি, তাদের এই এক টিপিক্যাল চেহারা। কচিৎ দু'একজন হাতে ঘড়ি-বাঁধা, ফর্সা রঙিন সার্টপরা যুবক, সাইকেল হাতে ঘুরে বেড়ায়।

কয়েকটা চায়ের দোকান, দুটো খাবারের দোকান গজিয়ে উঠেছিল। সম্প্রতি একটা সেলুন বসেছে। গ্রামের আধুনিক ছেলেরা এতে চুল কাটে নতুন ফ্যাসন মত। চুলের দৈর্ঘ্য কোথায় কতখানি উঠবে, কি গোঁফটা কতখানি সরু হবে, এ ব্যাপারে সেলুন মাষ্টার কার্তিকের ডিসিসানই ফাইন্যাল। কার্তিক কলকাতায় সেলুনে কাজ করেছিল। কাজেই কলকাতার সর্বশেষ কেশশিল্পের গতি ও প্রগতি সম্পর্কে সে-ই সবচেয়ে ওয়াকিবহাল, এমনকি তাকে বিশেষজ্ঞও বলা চলতে পারে। তা ছাড়া সেটেলমেণ্ট অফিসের সাহেব ও বাবুরা এবং নীলাপুর স্কুলের দু'একজন শিক্ষক পর্যন্ত কার্তিকের এই সেলুনে চুল কাটেন। তাতে এই নব প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানটির গৌরব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং খরিদ্দারও রীতিমত বেড়েছে।

সেলুনের দেখাদেখি একটা ধোপীখানাও খোলা হয়েছে নীলাপুরে। অফিসার বাবুদের হাওয়াই সার্ট, আর ট্রাউজার, মাষ্টারবাবুদের আদ্দির পাঞ্জাবী মিলের ফাইন ধুতি সেখানে কাচা হয়, ইস্ত্রি হয়।

নীলাপুরের এই গ্রাম-জীবনে, নাগরিক সভ্যতার প্রথম আলো এতদিন পরে এসে পড়েছে। সে আলোকে পুরনো জীবন দিনে দিনে অসহায় হয়ে উঠছে।

এই সন্ধিক্ষণে, এই আলোড়ন-অবসন্ন স্তিমিত জনপদে হঠাৎ আর একটি বিস্ময়কর সংবাদ ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ল।

এম. এল. এ. চিরঞ্জীববাবু একবার এসেছিলেন এই নির্বাচন

কেন্দ্রে। কথাটা তাঁর মুখ থেকেই শোনা। এই থানাতে নাকি এন. ই এস ব্লকের উদ্বোধন হবে, আগামী দোসরা অক্টোবর।

এন. ই. এস. ব্লক জিনিসটা যে কি, এ সম্বন্ধে এ অঞ্চলের লোকের কারুর কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। সেটেলমেণ্ট অফিসেই আলোচনা হচ্ছিল এই নিয়ে। পাশাপাশি গ্রামের কয়েকজন লোক এসেছিল অফিসে। কাজের অবসরে বটগাছের নিচে ছেঁড়া মাদুরে বসে আলোচনাটা চলছিল।

'এন. ই. এস. ব্লক সে আবার কি জিনিস রে বাবা, স্বাধীনতার পরে কত খেলই না দেখলাম'—ভুবনপুর গ্রামের মাতব্বর সেই গোঁসাই নিমাই হাজরা, কথাটা সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল।

কেউ কোন উত্তর দিল না। তারই পাশের গ্রামের উমাশংকর, হরিপদ, নগেন, নবীন সব ছিল সেখানে। ব্যাপারটা কারুর কাছেই পরিষ্কার নয়। নবীন প্রাথমিক স্কুলের টীচার। অর্ধসাপ্তাহিক খবরের কাগজ পড়ে। সে-ই বলল—'এন ই এস. ব্লক অর্থাৎ জাতীয় উন্নয়ন সম্প্রসারণ ব্লক।'

শব্দগুলি প্রায় সবই বাংলা। কিন্তু শ্রোতৃবৃন্দ তার কোন অর্থ উদ্ধার করতে পারল না। 'একটু বুঝিয়ে বল না, পণ্ডিত।' নগেন বিড়ি ধরাতে ধরাতে বলল।

গাছের নিচে অপরাহ্নের হাওয়া আসছিল দেশলাই কাঠিটা নিবে গেল নগেনের। সে আবার একটা জ্বালল, কিন্তু মুখের কাছে আনার আগেই আবার নিবে গেল কাঠিটা।

নবীন বলল, 'ছাতাটা ফুটিয়ে নিয়ে দেশলাইটা জ্বাল না। যতসব বুদ্ধিমানের দল!'

'হে হে, এই না হলে পণ্ডিত!' নগেন ছাতার আড়াল দিয়ে দেশলাই জ্বালল। বলল, 'তুমি যে কটমট কি একটা কথা বললে, তার মানেটা কি?'

মানেটা পণ্ডিত নবীনের কাছেও পরিষ্কার নয়। তবে সে কাগজে পড়েছে, অন্যান্য জায়গায় নাকি এই রকম ব্লক হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী

বলেছেন, সারা ভারতের গ্রামগুলোকে এই ব্লকের মধ্যে নিয়ে আসা হবে।

'বলি, তাতে দেশের কিছু হবে কি?' হরিপদ বলল, 'তোমার ব্লক হোক, কি বোর্ড হোক, গ্রামের লোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তাতে বাড়বে কি? নইলে, দেশ স্বাধীন হয়েও যা, না হয়েও তা। কি বল হে? 'আমরা মুখ্যু মানুষ; এইটিই বুঝব—তাই না, নগেন?'

নগেন মাথা নেড়ে জানাল, 'হ্যাঁ, ব্যাপারটা তাই বটে।'

হরিপদ বলতে লাগল, 'স্বাধীন হয়ে আমরা হলামটা কি বলতে পার? সেই কাপড় চোপড়ের দর যেন আগুন! কণ্ট্রোল উঠল, ভাবলাম কিছু সস্তাটস্তা হবে। কোথায় সস্তা? যেই কে সেই! তারপর এই তোমার মসলাপাতির দাম, ওষুধপত্রের দাম কমল কি? স্কুলের বেতন, সব বেড়ে চলেছে। আর ধানের দাম সেই তুলনায় আছে কি? তারপর বললেই সরকারকে খুশিমত দামে ধান দিয়ে দিতে হবে। বুঝলে না?'

'হবে না?' নগেন বলল, 'শহর। শহরের লোক খাবে কি? শহরের লোককে সুখে রাখতে হবে, আরামে রাখতে হবে, এই হল সরকারের চেষ্টা। আর গ্রামের লোকেরা মরুক। নইলে যে সেখানে মিছিল, মারামারি, গুলী ছোঁড়াছুঁড়ি, কাগজে কাগজে হৈ-চৈ লেগে যাবে। তখন? তখন সামলাবে কে?'

নবীন বলল, 'কথাটা মিথ্যে বলনি, নগেন। এই খবরের কাগজ-গুলো দেখনা, গ্রামে যে লোক থাকে এ খেয়ালই যেন তাদের নেই। সব শহরকে নিয়ে! ওরা নিজেরা শহরে থাকে। তাই শহর নিয়েই ওদের মাথা ব্যথা। যেন আমরা পয়সা দিয়ে কাগজ পড়ি না! না, আমরা মানুষ নই?'

নিমাই হাজরা বলল, 'হুঁ, আমরা আবার মানুষ! মানুষ বলে গ্রাহ্যি করে কেউ? এই যে সেটেলমেন্ট অফিস বসেছে। অফিসের কেরানীরা পর্যন্ত মানুষ বলে মানে না আমাদের। কোন কথা জিজ্ঞেস কর; যেন বোবা! আটগণ্ডা পয়সা বাঁ হাতে দাও, তখন

কথা ফুটবে। একটা টাকা দাও, ফাইল খুলে সব বলে দেবে। এই হল তোমার সরকার। বুঝলে না? এই সরকারের জন্যে তোমার ক্ষুদিরাম, প্রদ্যোৎ, সত্যেন ফাঁসি গেছে, মাতঙ্গিনী গুলী খেয়ে মরেছে!'

এমন সময় অফিস থেকে ডাক শোনা গেল। স্বাধীনতার ব্যাখ্যা আপাততঃ স্থগিত রেখে নিমাই হাজরা, নগেন অফিসে উঠে গেল।

উমাশংকর আর হরিপদ বসে রইল গাছতলায়। বিকেল হয়ে আসছিল। একজন দালাল এসে কানে কানে কি বলতে তারাও উঠে অফিসের দিকে চলে গেল।

দেখতে দেখতে এন. ই. এস. ব্লক হবার সংবাদটা চারধারের গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। সেপ্টেম্বর মাসে একদল অফিসের লোক এসে হাজির হল নীলাপুরে। তারাই এসে জায়গা দেখবে, অফিস খুলবে। তারপর মন্ত্রী এসে দোসরা অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে ব্লকের উদ্বোধন করে যাবেন।

নীলাপুরের অনতিবিস্তীর্ণ জগতে এই দ্বিতীয় আলোড়ন ঘটল।

সভার দিন নীলাপুরে হাজার হাজার লোক জড় হয়েছে। মরা-নদীটার পাড়, সেটেলমেণ্ট অফিসের উঠোন, স্কুলের ধারে, কোথাও স্থান নেই। ছোটখাট পানবিড়ি, সরবতের দোকান বসে গেছে চারদিকে।

যথা সময়ে, দূরে ধূলো উড়িয়ে একটা জীপ আসছে দেখা গেল। সব লোক ছুটল সেদিকে।

দারোগাবাবু তাঁর কয়েকজন সিপাই নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা চেষ্টা করলেন, মন্ত্রী মশায়ের জীপ যাওয়ার পথটা পরিষ্কার করে দিতে। জীপ থেকে নেমে মাননীয় মন্ত্রী মণ্ডপের দিকে এগিয়ে চললেন। সঙ্গে বুশসার্ট আর ট্রাউজার পরা সেক্রেটারী, অফিসার দল, স্টেনোগ্রাফার, আরদালি। মঞ্চে গিয়ে বসলেন তিনি। সভার লোকজন তখন বসে পড়েছে। এক্ষুনি কাজ আরম্ভ হল বলে! হঠাৎ মন্ত্রীমশায় মঞ্চ থেকে নেমে গেলেন। কোথায় যাচ্ছেন তিনি?

এম. এল. এ. চিরঞ্জীববাবু, অফিসাররা, আরদালি সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

মন্ত্রী মশায় নেমে ততক্ষণে সভার এক কোণে চলে গিয়েছেন। ওকি, উনি কাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন ?

সকলে অবাক হয়ে দেখল, মন্ত্রীমশায় স্বদেশবাবুকে নিয়ে মঞ্চের দিকে আসছেন : 'হ্যাঁ। এইখানে বস।'

স্বদেশবাবু হেসে বললেন, 'আমি এখানে বসব কি ? এসব কি আমাদের মানায় ? তোমরা মন্ত্রী হয়েছ, এসব তোমাদের মানায়। আমরা গাঁয়ের লোক !'

ততক্ষণে মন্ত্রী মশায় মাইকের সামনে উঠে গিয়ে বলতে শুরু করেছেন, 'আজকের এই সভায় আমার সভাপতিত্ব করার কথা ছিল। কিন্তু আমার চেয়েও এই সভায় সভাপতিত্ব করার একজন যোগ্যতর লোক এখানে আছেন। তিনি গান্ধীবাদের প্রকৃত পূজারী। আমি সেই স্বদেশবাবুকে সভাপতিত্ব করার জন্য অনুরোধ করছি।'

সভা স্তব্ধ হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, সুরটাও যেন পাল্টে গেল। স্বদেশবাবু সর্বজনশ্রদ্ধেয় লোক। এ অঞ্চলের রাজনৈতিক আন্দোলনের তিনি এককালে পথিকৃৎ ছিলেন। আজ তিনি রাজনীতি করেন না। কারুর সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগাযোগও নেই। নিজের স্কুল আর পড়াশুনো নিয়েই তিনি থাকেন। আজ তাঁর সম্মানে সারা নীলাপুর আনন্দিত হয়ে উঠল।

নন্দিতার হাতে তানপুরাটা বাজছে। গান গাচ্ছে নন্দিতা, "তুমি আমাদের পিতা—তোমায় পিতা বলে যেন মানি।"

সভা তখন নিঃস্তব্ধ হয়ে গেছে। শুধু মাইকে একটি অপূর্ব সুরেলা গলা ভেসে আসছে : "হে পিতা, হে দেব দূর করে দাও যত পাপ যত দোষ—"

স্বদেশবাবু নমিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মেয়েটি কে, মা ?'

'ও আমাদের মিসট্রেস, নন্দিতা।'

'বড় ভাল গায় ত ! তুমি ত কখনও বলনি আমাকে ?'

সেটেলমেণ্ট অফিসের কেরানীরাও সভায় এসেছিলেন। তবে তাঁরা একটু দূরে একটা বেঞ্চে বসে আছেন। অনিলবাবু, ভোজন-বিলাসী মদনবাবুও এসেছেন। মদনবাবু অনিলবাবুকে বললেন, 'স্বদেশবাবু অনারেবল মিনিস্টারের বন্ধু নাকি ?'

'হবে বোধহয়। জেলটেল খেটেছেন একদিন।'

'স্বাধীনতার শহীদের রক্ত যেখানকার ধূলিতে মিশে আছে, সেস্থান আমার কাছে তীর্থ। এই জেলায় বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ, বাংলার নবজাগরণের অগ্রদূত সেই বিরাট পুরুষের পদচিহ্ন এই জেলার ধূলিতে পড়েছিল। আমি একজন দীন শিক্ষাব্রতীরূপে সেই দেশে এসেছি। আমার জীবনের এ একটি গৌরবময় অধ্যায়।'

নমিতা বক্তৃতা দিচ্ছিল।

জোর হাততালি পড়ল চারদিক থেকে। নমিতা লক্ষ্য করেছে, আজ অসিত ধুতি আর খদ্দরের পাঞ্জাবী পরে এসেছে। ওকে এই পোশাকে নমিতা কখনও দেখেনি। বেশ ভাল লাগছিল দেখতে, বার বার সে সকলের আড়ালে দেখছিল অসিতকে।

কিন্তু অসিত উঠেই প্রথমে নমিতাকে আক্রমণ করল। বলল, 'পূর্ববর্তী বক্তা যে কথা বলে গেলেন, তা শুনতে আপনাদের ভাল লাগবে, কিন্তু আমি বলতে চাই, স্বাধীনতার জন্য এদেশ যে ত্যাগ স্বীকার করেছে, তার জন্য আমার কোন উচ্ছ্বাস নেই, থাকা উচিতও নয়। কারণ, পৃথিবীর বহু দেশ স্বাধীনতার জন্য এর চেয়েও অনেক বেশী মূল্য দিয়েছে, তাদের দিতে হয়েছে, ইতিহাস সে সাক্ষ্য দেবে।

'আমার দ্বিতীয় কথা, আমাদের এই স্বাধীনতা, দেশকে নিচের দিকে, অধঃপতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে—উন্নতির দিকে নয়। এইখানে দেশের উন্নতি বলতে কি বোঝায় সে বিষয়ে অবশ্যই বিতর্কের অবকাশ আছে। সমস্ত উন্নতির, প্রগতির, সভ্যতার, সংস্কৃতির মূল উপাদান হল মানুষ। এই মানুষ আজ দিনে দিনে অন্ধকারের দিকে চলেছে। সমাজের যে কোন স্তরের দিকে তাকালে, আপনারা

এ সত্য উপলব্ধি করতে পারবেন। আপনি সরকারী অফিসে যান, সেখানেও তার পরিচয় পাবেন।'

মদনবাবু অনিলবাবুর দিকে তাকালেন। তাঁর হৃৎকম্প হতে লাগল। অনিলবাবু বললেন, 'এবার বোধহয় বলে ফেলল, অফিসের সেদিনের কথা—দুর্গা, দুর্গা হে মা-কালী, রক্ষা কর। রক্ষা কর মা!'

অসিত বলল, আমি ডাক্তার। গ্রামের প্রকৃত ছবিটা দেখার সুযোগ অন্যান্য পেশার চেয়ে ডাক্তারী পেশায় বেশি। আমি দেখেছি সমাজের বিকৃত চেহারা, তার অপরিসীম দারিদ্র্য, তার অশিক্ষা, তার কুসংস্কার। আমার মনে হয় সমাজের এই চেহারা পাল্টানর জন্য প্রয়োজন, সমাজ ব্যবস্থার আমূল পুনর্গঠনের। এই এন. ই. এস. ব্লক, এই জমিদারী উচ্ছেদ এসব বাইরের প্রলেপ মাত্র। ওটা আরোগ্য নয়—অস্থায়ী আরাম।'

মন্ত্রী মশায় চুপি চুপি বললেন, 'ছেলেটি কে?'

স্বদেশবাবু বললেন, 'আমার ছেলে।'

'পার্টি করে না ত?'

'না না, রাজনীতি করে না। তবে এই নিয়ে পড়াশুনো করে।'

অসিত বলে চলেছে—'পার্লামেণ্টারী ডেমোক্রেসি, ব্যক্তি-স্বাধীনতা সব বড় বড় কথা, আমরা পশ্চিম থেকে ধার করেছি। কিন্তু একটা কথা কি ভেবে দেখেছি, ব্যক্তি-স্বাধীনতার মানে কি? একটা পাগলা ষাঁড়কে রাজপথে ছেড়ে দিয়ে যদি বলি, ওর স্বাধীনতায় হাত দিও না, তবে পথচারীদের পক্ষে তা নিশ্চয়ই বিপজ্জনক হবে। তেমনি প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে, সমাজের মধ্যে, একদল ঘুষখোর, দালাল, চোরকে ছেড়ে দিয়ে বললাম—আহা, ওদের ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হাত দিও না; তাতে সামগ্রিকভাবে দেশেরই ক্ষতি। আর ডেমোক্রেসি? এদেশের মানুষ কি জানে, কাকে ভোট দিলে দেশের ভাল হবে? সে জ্ঞান কি এদের আছে? কাজেই যাদের এ জ্ঞান নেই, তাদের ভোটের ব্যাপারটাকে এত রঙীন করে, এত বড় করে দেখার, আর তাই নিয়ে 'ডেমোক্রেসি' 'ডেমোক্রেসি' বলে গলাবাজি করার কোন যুক্তি নেই।'

'তাছাড়া, এই নিবীর্য দুর্বল সরকারের, যে সরকারের শতকরা পঁচাত্তরজন কর্মচারী সেই সরকারেরই বিরোধী, তাদের দ্বারা কোন পরিকল্পনা সার্থকভাবে রূপায়িত হবে, একথা আমি বিশ্বাস করি না। যেমন জমিদারী উচ্ছেদ ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি এই এন. ই. এস. ব্লকও হয়ত ব্যর্থ হবে। পুঁথিতে পরিকল্পনা সম্পর্কে যে চিত্র আঁকা থাকে, সেই পরিকল্পনা কার্যকরী করার পর দেখা যায়, তার উল্টো ফল ফলেছে। কাজেই ব্লক সম্পর্কে মন্ত্রিসভা কি ছবি এঁকে রেখেছেন সেটা আমাদের বিচার্য বিষয় নয়, আমাদের বিচার্য বিষয় হবে, চোখের সামনে আমরা কি দেখব, পরিকল্পনা কি রূপ নেবে! কারণ, মন্ত্রিসভা কাজ করবেন না, কাজ করবেন কর্মচারীরা। এই সরকারী কর্মচারীদের চরিত্র সম্পর্কে আগেও আমরা পরিচয় পেয়েছি। দেশবাসী এখনও পাচ্ছেন।'

অসিত বলে যাচ্ছিল, 'গান্ধী দর্শন ও মার্কসীয় দর্শন সম্পর্কে আমার সামান্য কিছু পড়াশুনো আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইতিহাস সম্পর্কেও কিছু কিছু খবর রাখি। তাই আমাদের দেশে, এই কথাটাই আজ বড় কথা হওয়া উচিত, মানুষ চাই—নতুন মানুষ চাই। দু'শ বছরের পরাধীনতার ফলে গলিত, বিকৃত, দুর্গন্ধময় মানুষ আজ সমাজে ছেয়ে গেছে। একথা গান্ধীজীরই কথা। সোশ্যালিজম সম্পর্কে তিনি বলতে গিয়ে বলেছেন—একটা সৎ লোক, খাঁটিলোক যদি গোড়ায় থাকে তবে তার ডাইনে যত খুশি শূন্য বসাবে, দেশ সেখানে বড় হবে। আর গোড়ায় যদি অসৎ লোক থাকে তবে তার বাঁয়ে শূন্য বসাবে। দেশ ধ্বংস হবে। এইখানে সেই প্রশ্ন, মানুষ, একটি খাঁটি মানুষ! যদিও আজ এই মানুষের সন্ধান দুর্লভ। আমি বলতে চাই, বর্তমান রাজনীতির মধ্যে মন্ত্রীদেরও খাঁটি থাকার উপায় নেই। দুর্নীতির পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ প্রভাব থেকে তিনি নিজেকে বাঁচাতে পারেন না। কারণ, তাঁকে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আসতে হয়, তাঁকে পার্টির মনোনয়ন নিতে হয়, তাঁকে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে খুশি করে চলতে হয়। এই আবহাওয়ায় দেশের জীবন মুক্ত হবে, তিনি নিজেকে খাঁটি

রাখবেন একথা আপনারা বিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু আমি করি না।'

অসিত বসে পড়ল। চারদিক থেকে কিছুক্ষণ পর্যন্ত হাততালি চলতে লাগল।

মন্ত্রী মশায় বলতে উঠলেন।

হঠাৎ পশ্চিম কোণে গণ্ডগোল শোনা গেল। একটি যুবক সেখান থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'আমরা পেটের ভাত চাই, পরনের কাপড় চাই, বক্তৃতা শুনতে চাই না।'

একদল লোক তার পেছনে তখন দাঁড়িয়েছে

মন্ত্রী মশায় বললেন, 'তা, ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থার জন্যেই ত এই ব্লক খোলা হচ্ছে। দু'শ বছরের দারিদ্র্য একদিনে দূর করা যায় না। সম্ভবও নয়।'

চীৎকার ক্রমশঃ জোর হতে লাগল: 'এ আজাদি ঝুটা হ্যায়' —'খানে দো, পরনে দো—নইলে গদি ছোড় দো।'

সভায় ভীষণ গণ্ডগোল দেখা দিল। দেখতে দেখতে সেই গণ্ডগোল অয়ত্তের বাইরে চলে যেতে বসল।

স্বদেশবাবু মাইকের সামনে গিয়ে কিছু বললেন। কিন্তু তা শোনা গেল না। চারদিকে হৈ চৈ। মন্ত্রী মশায় শুকনো মুখে চুপ করে বসে পড়লেন!

সভায় এই ভগ্নপ্রায় মুহূর্তে, অসিত আবার মাইকের সামনে উঠে এল। তার বজ্রগম্ভীর কণ্ঠ মাইকে বেজে উঠল। 'নীলাপুরের জনসাধারণের কাছে আমার অনুরোধ তাঁরা স্থির হয়ে বসুন। কোন অতিথির প্রতি অশ্রদ্ধা দেখান আমাদের অন্যায়। মন্ত্রী মশায় আজ নীলাপুরের অতিথি।'

লোকজন আবার স্থির হয়ে বসতে আরম্ভ করল। কিন্তু সেই গণ্ডগোলকারী লোকেদের চীৎকার আরো জোরে ভেসে আসতে লাগল: 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়" 'গদী ছোড় দো।'

অসিত গম্ভীর গলায় বলে উঠল, 'কে বলেছে এ আজাদী ঝুটা?'

একজন মুখপাত্র বলল, 'আপনি ত বলেছেন, দেশ জাহান্নমে যাচ্ছে, এ সরকার দুর্নীতিপরায়ণ, দেশের দারিদ্র্য, দেশের বিকৃত চেহারা দেখে আপনি শিউরে উঠেছেন !'

'তার মানে এ আজাদী ঝুটা, এ কথা কে বললে ?'

'আপনি বললেন, আপনিই ত সরকারের নিন্দা করেছেন।'

'হ্যাঁ, করেছি। এ সরকার আমার সরকার বলেই।'

'আমরা এ সরকারের নিপাত চাই।'

দেখতে দেখতে আবার উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। এতক্ষণ চীৎকার গালাগালি ভেসে আসছিল। হঠাৎ দু'একটা ইট-পাটকেল এসে পড়তে লাগল। নমিতার গায়ে এসেও একটা ইট পড়ল।

অসিত দাঁড়িয়েছিল মাইকের সামনে। একবার ফিরে তাকাল তারপর বলে উঠল, 'যাদের সামান্য শিষ্টাচার বোধ নেই, যারা ইট পাটকেল ছুঁড়ে সভা পণ্ড করতে চায়, সেই গুণ্ডাদের আমি এই অঞ্চলের অধিবাসীদের হয়ে জানাচ্ছি, যেন তারা এক্ষুনি সভা ছেড়ে চলে যায়। কোনরকম গুণ্ডামির ভয়ে আমরা সভা ছেড়ে যাব না।'

দারোগা তার সিপাইদল নিয়ে এগিয়ে এল। মন্ত্রী মশায় হাত নেড়ে বারণ করলেন, 'কিছু করার দরকার নেই।'

'কিন্তু কিছু করার দরকার আছে বলে আমি মনে করি। অন্যায় সহ্য করাও অন্যায়।' অসিত চীৎকার করে বলে উঠল, 'নীলাপুরের যুবকদের আমি এই অনুরোধ করছি—তারা যেন এই গুণ্ডাদের সভা থেকে জোর করে বের করে দেন।'

হঠাৎ মন্ত্রের মত কাজ হল ! কোথা থেকে এত যুবক এখানে জড় হয়েছিল কেউ লক্ষ্য করেনি। এক সঙ্গে জন-পঞ্চাশ যুবক আস্তিন গুটিয়ে উঠে দাঁড়াল। সকলের সামনে সেটেলমেণ্ট অফিসের সেই অর্জুন বুক ফুলিয়ে তার লম্বা চেহারাটা নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

দশ মিনিটের মধ্যেই সভা শান্ত হয়ে এল। এতক্ষণ এতবড় যে একটা গোলমাল চলেছিল তা যেন আর মনেই হয় না। এই শান্ত পরিবেশে স্বদেশবাবু তাঁর ভাষণ দিতে উঠলেন।

॥ ৯ ॥

সভাপতি এবং মন্ত্রী মশায় চলে যাবার পর নীলাপুরের যুবকরা মঞ্চের কাছে গিয়ে অসিতকে ঘিরে দাঁড়াল।

অসিত বলল, 'তোরা যে এসেছিস সেটা লক্ষ্য করেছিলাম। তাই ত তোদের বললাম।'

সুধীর বলে উঠল, 'বাঃ বাঃ, আমরা তখন এদিক ওদিক ছিলাম। তোমার বক্তৃতা হচ্ছে শুনেই এসে জুটলাম। তারপর এই কাণ্ড।'

'আচ্ছা, অসিতদা—তুমি এখনও সেই ফুটবলের ব্যাকই থেকে গেলে। তাই না?'

'তাইত দেখছি। চল, নদী-ধারের দিকে গিয়ে একটু শান্তিতে বসি। মেজাজটা খারাপ হয়ে গেছে।'

যেতে যেতে ওরা গল্প করছিল। সেণ্টার ফরওয়ার্ড খেলত অসীম। সে বলল, 'সেই শীল্ড ফাইন্যালের কথা মনে আছে, অসিতদা। নন্দীগ্রাম না হবিচক থেকে একদল বরোড প্লেয়ার খেলতে এসেছিল। ওরা বুট পরে খেলে। আর আমাদের খালি পা। তুমি বললে—সাবধানে খেলিস কিন্তু। আমাদের শীল্ড নিতেই হবে। কিছু পরে তোমাকে বললাম—এরা যে বড্ড মেরে খেলছে। তুমি বললে—নজর রাখ, ইচ্ছে করে মারছে নাকি!'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, ইচ্ছে করেই-ত মারছে।' তারপর হাফ টাইমের পরে, আমরা একটা গোল দিলাম। সেই থেকে ওরা বেদম মারতে লাগল। তাদের যে প্লেয়ারটা বেশি মারছিল, সেই সেণ্টারফরোয়ার্ডকে দেখিয়ে দিলাম তোমাকে। তুমি বললে—দে, বল নিয়ে আসতে দে। তুমি পিছিয়ে পিছিয়ে এসে চান্স দিলে। তারপর একখানা যা ঝাড়লে না! সেণ্টার, তখন ষ্ট্রেট লাইন। একদম ফ্ল্যাট। তারপর মনে আছে, অসিতদা? কী মারামারি হল!

আর তুহিনটাকে বাঁচাতে গিয়েই ত তুমি লাঠির ঘা খেলে, মাথা ফাটল তোমার। আমরা কাঁধে করে বয়ে নিয়ে এলাম। বাড়ী গিয়ে বললে, খেলতে গিয়ে মাথায় লেগেছে। সে সব দিন কোথায় গেল, অসিতদা ?'

অসিত মৃদু মৃদু হাসছিল। তারপর কেন যেন গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'জীবন চলে যাচ্ছে। বুড়ো হচ্ছি রে।'

মরানদীটার জলে রাত্রির ছায়া নামছে তখন। সভা-শেষের লোক দূর দিয়ে চলে যাচ্ছে অন্ধকারে।

হঠাৎ উমা অসিতকে খুঁজতে এসে বলল, 'কি ক'রছ এখানে ? নমিতাদি যে ডাকছেন তোমাকে ?'

'ও, ঠিক ঠিক। ভুলে গেছলাম। অসীম, তোরা এখন আর ক'জন আছিস্ রে ?'

'আমরা দশ-এগারজন আছি '

'ওরা কিন্তু স্কুলে গণ্ডগোল বাধাতে পারে। তোরা এই ক'জনে সামলাতে পারবি ত ?'

'পারব না মানে ? এগারজন। এইত ফুল টীম। আর তুমি ত রিজার্ভড থাকলে। তেমন তেমন বুঝলে, তোমাকে আবার ব্যাকে নামিয়ে দেব। কেমন ?'

অসিত হেসে উঠে বলল, 'তেমন করে আর ঠ্যাং ভাঙতে কি পারব রে ? এখন যে আমি ডাক্তার। এখন কেবল পা জুড়তে পারি ! পা ভাঙার জীবনটা অনেক দূরে ফেলে এসেছি। তা, তোরা কিন্তু রেডি থাকিস।'

আল্পনাগুলি যেন এক একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছবি। তারপরেই উঠোন। উঠোনের ধারে ফুলের বাগান। এইখানেই সভার ব্যবস্থা করেছে নমিতা। চেয়ার টেবিল নেই। এমনি ঘাসের উপর আসন বিছিয়ে বসার আয়োজন। সভাপতি প্রধান অতিথি ও গায়কদের জন্য একটা অনুচ্চ মঞ্চ। একটি ফুলদানিতে টাটকা একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। উজ্জ্বল

আলো নেই সভায়। অসিতের মনটা ভাল ছিল না। কিন্তু সভাস্থলে ঢুকেই সে আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে উঠছিল।

নমিতা একটু হেসে বলল, 'আমি আপনাকে খুঁজছি। কোথায় ছিলেন ?

'পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে একটু গল্প করছিলাম।'

'আপনার বন্ধুরা এখনও আপনাকে বেশ মেনে চলে দেখছি !'

অসিত বলল, 'এককালে সর্দার ছিলাম কিনা।'

'আচ্ছা, আমাদের কোন ভয় নেই ত? দেখুন, কত কষ্ট করে এইসব সাজিয়েছি। যদি নষ্ট হয়ে যায় ?'

'না, তা হবে না। আমি বাইরে আমার টীম রেখে এসেছি। ও টীম দুর্ভেদ্য জানবেন।'

মন্ত্রীমশায়কে দেখিয়ে স্বদেশবাবু বললেন, 'খোকা, ইনি কুঞ্জদা। আমরা একসঙ্গে অনেক বছর আলিপুর জেলের এক ঘরে ছিলাম।'

অসিত প্রণাম করল।

কুঞ্জবিহারীবাবু বললেন, 'তোমাকে দেখে কিন্তু আমি বাবা বিস্মিত হয়েছি, অসিত। তুমি ভেব না, তোমার সমালোচনায় আমরা দুঃখিত। দেশের একজন ছেলে এমনি বোল্ডলি আমাদের কনসট্রাকটিভ সমালোচনা করেছে, এ ভাবতে আমার ভাল লাগছে। আমাদের যে কত ক্রুটি সে আমরাই জানি। দেশ নিচের দিকে যাচ্ছে, মানুষের মর‍্যাল স্ট্যাণ্ডার্ড নেমে যাচ্ছে, এ আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু কিছু করার নেই। আর ক'দিন ? আমরা চলে যাব, তোমরা পরে আসবে। তোমাদের দেশকে তোমরাই নিজের মত করে গড়বে। দেশ স্বাধীন হবে, তাই দেখে যাব—একথা বাবা আমরা জীবনেও ভাবিনি।'

একটি স্নেহের স্পর্শে অসিত তার সমস্ত ঔদ্ধত্য নিয়ে মাথা নিচু করে বসে রইল।

নন্দিতা তানপুরা নিয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইছে। সেই প্রায়ান্ধকার মঞ্চে, একপাশে গান্ধীজীর ছবি, উঠোনের ধারে সেই সবুজ বাগান

আর উপরে খোলা আকাশ। সভায় কেমন এক স্বপ্নময় পরিবেশ রচিত হয়েছে। অসিত গান শুনছে, নন্দিতা গাইছে। নিখুঁত সুরে বাঁধা তানপুরাটা আস্তে আস্তে একটানা বেজে চলেছে।

সভায় ছাত্রীদের অভিভাবকরা এসেছেন। আর হাই স্কুলের টীচার, সেটেলমেণ্ট অফিস ও নতুন ব্লক অফিসের স্টাফরাও এসেছেন।

'তুমি কিছু বল, অসিত'—কুঞ্জবিহারীবাবু বললেন।

অসিত বলল, বলার অভ্যেস আমার খুবই কম।

'কিন্তু আমি অন্ততঃ তোমার কাছ থেকে কিছু শোনার জন্য উৎসুক হয়ে আছি।'

অসিত কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইল তারপর বলতে লাগল, 'গান্ধীবাদ বলে ঠিক কোন ইজম নেই। সাধারণ অর্থে আমরা যাকে রাজনীতি বলি সেটা গান্ধীজীর জীবন-নীতির অংশ ছিল। আজ তাঁর জন্মদিনে এই পরিপূর্ণ মানুষটিকে, এই জীবনশিল্পীকে স্মরণ করা দরকার। উৎপীড়িত মানুষের জন্য তাঁর বেদনার গভীরতা উপলব্ধিই তাঁর পুজো। যে মানুষ এই বেদনার গভীরতাকে সত্যের আলোকে দেখেছে, সে মানুষ দুর্জয়। এই উপলব্ধি গান্ধীজীর জীবনের মূল ঘটনা।'

একটু থেমে অসিত আবার বলতে লাগল, 'সমাজজীবনের গতি গান্ধীজীর আদর্শের দিকে যাচ্ছে না, যে সহজ, সুশৃঙ্খল ও উন্নত গ্রাম-জীবনের ছবি তাঁর চিন্তাজগতে ছিল—সে জীবন, বর্তমান পৃথিবীর সমাজ জীবনের স্রোতের ঠিক বিপরীত। আপনারা এই জীবনকে আদর্শ জীবন বলতে পারেন বলুন, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তাকে রূপায়িত করা সম্ভব নয়। কারণ, এই গতিবাদের যুগে এই জীবন অচল। ঋষির জীবন অরণ্যের নির্জনতায় গড়ে উঠতে পারে, কিন্তু শহরের কোলাহলে তাকে কল্পনা করা যায় না, এবং বর্তমান সভ্যতার গতি এই শহরমুখী। একে অসুন্দর বলতে পারেন, কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই।'

নন্দিতা ছাত্রীদের নিয়ে শেষ গান গাইল—"সকল কলুষ তামস হর জয় হোক তব জয়"।

মঞ্চ থেকে উঠতে উঠতে মন্ত্রীমশায় বলতে লাগলেন, 'আচ্ছা স্বদেশবাবু, এই সুদূর পাড়াগাঁয়ে এমন একটা অনুষ্ঠান কি করে সম্ভব হয় আমি তা ভাবতে পারছি না! আল্পনা থেকে আরম্ভ করে গানের নির্বাচন পর্যন্ত নিখুঁত। আমি বিস্মিত হচ্ছি!'

সেক্রেটারী নিশিকান্তবাবু কাছে ছিলেন। বললেন, 'নতুন হেড-মিসট্রেস এসেছেন, এ তাঁরই কাজ।'

শুধু মন্ত্রীমশায় নন, ছাত্রীদের গার্জেনরাও আশ্চর্য হয়েছেন। তাঁদেরই মেয়েদের মধ্যে যে এত শৃঙ্খলাবোধ থাকতে পারে এত শোভনতা থাকতে পারে, তা তাঁরাও ভাবতে পারছিলেন না।

মেয়েরাই খাবার দিচ্ছিল সকলকে। নীলা খাবারের প্লেটটা নিয়ে অসিতের সামনে এগিয়ে এল।

নীলা মুখ নিচু করে ছিল। আর মনে মনে কী একটা কথা ভেবে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠছিল। অথচ তার অসিতকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছিল মনে মনে।

'তুমি কেমন আছ?' অসিত নিজেই নীলাকে প্রশ্ন করল।

নমিতা একটু অবাক হয়ে বলল, 'ওকে চেনেন নাকি?'

'চিনব না? ও যে আমার পেসেন্ট ছিল।'

নীলা আস্তে আস্তে বলল, 'ভাল আছি।'

'আর জ্বর হয়না ত?'

'না।'

'দুপুরবেলা লুকিয়ে লুকিয়ে আচার খেওনা যেন আবার।'

স্বদেশবাবু ও কুঞ্জবিহারীবাবু হেসে উঠলেন।

নীলা কোন রকমে লজ্জায় মাথা নীচু করে বেরিয়ে গেল।

অসিত নমিতাকে বলল, 'আপনার নিশ্চয়ই চা খেতে ইচ্ছে করছে?'

নমিতা হেসে বলল, 'কি করে জানলেন?'

'আমি ডাক্তার বলে।'

উমা নমিতাকে এক কাপ চা দিয়ে গেল।

অসিত বলল, 'উমা, আমার বন্ধুরা কিন্তু তোমাদের গেট পাহারা দিচ্ছে। ওদের ভুলে যেও না যেন।'

উৎসবশেষে ধীরে ধীরে স্কুল থেকে অতিথিবা চলে গেলেন। কুঞ্জবিহারীবাবু একটু দূরের ডাকবাংলোয় আজ থাকবেন। স্বদেশবাবু, অসিত, নমিতা, উমা, কালাচাঁদবাবু, বাসন্তী, গৌরীশংকরবাবু তাঁকে বিদায় দেবার জন্য বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

'আপনার স্কুলে এসে বড় তৃপ্তি পেলাম।' নমিতার দিকে তাকিয়ে কুঞ্জবিহারীবাবু বললেন।

'আমি এখানে নতুন এসেছি মাত্র। উমা, নন্দিতা, বাসন্তী, কালা-চাঁদবাবু এঁরাই স্কুলকে গড়েছেন।'

'নন্দিতা! নন্দিতা কোথায় গেল?'

তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

সারাদিনের ক্লান্তির পর এখন বিশ্রাম। নদীপারের বাবলা বন থেকে বাতাস আসছে, রাত্রির সিক্ত বাতাস। উঁচু লোনা মাটির পথটা ধীরে ধীরে জনশূন্য হয়ে পড়ছে।

বাইরের শিক্ষকরা, সেক্রেটাবী, কমিটিব মেম্বাররা সব চলে গেছেন। স্বদেশবাবু হেঁটে গেলেন। অসিত সাইকেলে যাবে। যাবার আগে নমিতাব সঙ্গে দেখা করতে এসে অসিত জিজ্ঞেস করল, 'আল্পনাগুলো কে দিয়েছে?'

'ছাত্রীরা।'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

নমিতা মৃদু হেসে বলল, 'কেন?'

'এত পাকা হাত আমাদের দেশের ছাত্রীদের হতে পারে না। এবার বলুন, কে এঁকেছে?'

অসিত দেখল—যিনি আল্পনা এঁকেছেন, তিনি নিজেই কখন এই

সলজ্জ বিদায় মুহূর্তে একটি জীবন্ত ছবির মত প্রায়ান্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন।

সকলে চলে গেলে নমিতা নন্দিতার খোঁজ করছিল। সত্যিই এই অনুষ্ঠানের সব গৌরব নন্দিতার। সে গান না গাইলে অনুষ্ঠানের এত সজ্জা সব ব্যর্থ হত! নন্দিতাই আজকের সারা অনুষ্ঠানের জীবন দিয়েছে।

নমিতা, নন্দিতার ঘরে এল। আলো জ্বালা হয়নি ঘরে।

'তোমার অসুখ নাকি? অন্ধকারে এমন করে শুয়ে আছ কেন?'

নন্দিতা বলল, 'না, শরীরটা ভাল নেই।'

'আজ তোমার বড় কষ্ট গেছে। তাই না?'

'কষ্ট কি জান নমিতাদি, আমি বুঝতে পারছি আমার গলা কি ছিল আর কি হয়েছে। আমি আর গান গাইব না, নমিতাদি। আমাকে তোমরা আর কখন গাইতে বোলো না।'

'তোমার গলা খারাপ হয়েছে? কি বলছ তুমি!'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। সুরে দাঁড়াচ্ছে না গলা, কাঁপছে। ওপরে যেতে কষ্ট হচ্ছে আমার। বুঝেছি আমার গান গাওয়ার দিন ফুরিয়ে আসছে, নমিতাদি!'

॥ ১০ ॥

মরানদীর পাড়ে উঁচু লোনা মাটির পথ দিয়ে নগেন আর হরিপদ সেদিন জালপাই মহালে চাষ করতে যাচ্ছিল। ঐ দূরে যেখানে কয়েকটা তালগাছ উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঐখান থেকে জালপাই মহাল শুরু। আসলে এই মহাল হল এই নদীর চর। এখন নদীতে ভরা-কোটালের জোয়ার। জল চরের উপর উঠে পড়ায় এই মুহূর্তে নদীটাকে খুব বড় বলে মনে হচ্ছে। সূর্য তখনো ওঠেনি।

নগেন আঙুল দেখিয়ে বলল, ওখানে পুল হবে। লোহার পুল।

নরঘাট থেকে বরাবর বাস নীলাপুরে আসবে। ক'মাস আগে জরীপ হয়ে গেছে—রাস্তাটা কোন্ দিক দিয়ে যাবে। পীচ রাস্তাও হবে। বুঝলি? তোর নীলাপুর শহর হয়ে উঠছে রে!'

'কি বললি? এতবড় পুল হবে?' হরিপদ নদীটার দিকে একবার তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'এত্তবড় পুল! তুই একটা আকাট মুখ্যু।' নগেন সবজান্তার মত বলে উঠল, হাবড়ার পুল দেখেছিস?......দেখিসনি? তবে তুই একটা আস্ত গেঁয়ো। এখান থেকে দূরে ঐ যে বাবলা বনটা 'ঝিঁঝিঁ' করছে, হাবড়ার পুল ঐখান পর্যন্ত লম্বা। তার ওপর দিয়ে লোক চলছে, বাস চলছে, টেরাম চলছে, আর ঘোড়ার গাড়ী চলছে—কী না চলছে? আর জানিস্? নিচে থাম নেই। পুলটা শূন্যে ঝুলে আছে। বুঝলি?'

'শূন্যে ঝুলে আছে!' হরিপদ অবাক হয়ে গেল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, শূন্যে ঝুলে আছে। সেকি আমাদের দেশের লোক তৈরী করেছে রে? সাহেব লোক করেছে। সাহেব লোক!'

কথা বলতে বলতে ওরা জায়গাটা পেরিয়ে জালপাই মহালের দিকে চলে গেল।

তা, খবরটা সত্য। নরঘাট থেকে বরাবর বাস আসবে নীলাপুরে। এখন নীলাপুরে সেটেলমেণ্ট অফিস, এন. ই. এস. ব্লক, গার্লস হাই স্কুল, বয়েজ হাই স্কুল, আরও নাকি একটা সমবায় ব্যাঙ্ক হবে বলে শোনা যাচ্ছে। একটা হাট ত আছেই। ধানের মরশুমে আবার এ হাটটা জমে ওঠে। চারদিকের গ্রাম থেকে নৌকোয় করে, মাথায় করে, কেউ বা গরুর পিঠে ছালায় বাজারে ধান নিয়ে আসে। পূর্বদিকের খাউকীরা অর্থাৎ খাওয়ার জন্য যারা ধান কেনে, তারা এই সময় ভীড় করে।

বড় বড় পানসি এই মরানদীতে তখন মাস্তুলটা সোজা দাঁড় করিয়ে রেখে, বাজারে ধান কেনে। ধান কিনে রসুলপুর হয়ে, বাহির গাং দিয়ে কলতা, বা হাওড়ার মিলগুলোতে ধান নিয়ে যায়।

নীলাপুরের জীবনে এই ক'মাস ভীড় লেগে ওঠে। কত দূর দেশের নৌকো, কত দূর দেশের অপরিচিত মানুষ এই নীলাপুরের মাটিতে ক'দিনের জন্য বাসা বাঁধে। হাট-বাজার করে, নৌকোতে রান্না চাপিয়ে বাবলা বনটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হয়ত বাড়ীর ছেলে-মেয়ের কথা ভাবে। এই মরানদীর, লোনা মাটির ধূসর বর্ণ তখন বিকেলেব আকাশে কে যেন ছড়িয়ে দেয়।

তারপর গভীর রাত্রিতে নদীতে জোয়ার এলে—এই নীলাপুরের নদীতীরের মাটি থেকে নোঙরটা তুলে নেয় তারা। ধীরে ধীরে অন্ধকারে, বাবলা বন আর উঁচু লোনা মাটির পথটাকে ডাইনে রেখে পানসিটা রসুলপুরের দিকে চলতে থাকে। তখন এই ক'দিনের আতিথ্যের উপর যবনিকা নেমে আসে। হয়ত সেই দূর দেশের অপরিচিত মানুষগুলি নীলাপুরের হাটে আর কখনো ফিরে আসবে না। আর এই মরা নদীর তীরে, বাবলা বনটার ধারে নোঙর ফেলবে না কখনো।

এবার আর হয়ত নৌকো আসবে না। কারণ, পীচ রাস্তাটা হয়ে গেলে ট্রাকে করে ধান যাবে। তাছাড়া কালিনগরের কাছে দুটো বড় বড় রাইস মিল বসছে। তারা ধান কিনে ট্রাকে করে বয়ে নিয়ে যাবে। ইতিহাসের প্রাচীন অধ্যায়গুলো পেরিয়ে নীলাপুর একেবারে নতুন যুগের দরজায় এসে দাঁড়াবে।

সেদিন শনিবার। নীলা হোস্টেল থেকে বাড়ি যেতে যেতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাঁওতালদের দেখছিল। এখানে ওরা মাটি কাটতে এসেছে।

'জানিস গৌরী, ঠাকুমা বলছিল সাঁওতালদের বিয়ে হয়ে গেলে বরটা একটা খুব উঁচু গাছে চড়ে বসে থাকে। আর বৌটা সেখানে গিয়ে কেবল কাঁদতে থাকে। বলে, তুই নেমে আয়, তোকে আমি খেটে খাওয়াব, তোকে কিছু কাজ করতে হবে না। এই রকম বলার পর বরটা নেমে আসে। তাই ত পুরুষগুলো শিকার করে,

আর মেয়েরা মাটি কাটে, ঘরের কাজ করে, ছেলেপিলে মানুষ করে। পুরুষগুলোর কোন ঝামেলা নেই। কেমন মজা, না-রে!'

নীলার সহপাঠিনী গৌরী বলল, 'আজকাল তোর কি হয়েছে বলত! কেবল বিয়ের কথা ভাবিস! চুপি চুপি দেখিস একজনকে।'

নীলা রাগের ভান করে বলল, 'কি যা-তা বলছিস?'

'কই, যা-তা বললাম। সেদিন অসিতবাবুকে তুই চুপি চুপি দেখছিলি। হ্যাঁ রে, তোর খুব ভাল লাগে দেখতে। কী সুন্দর, না?'

নীলা হাসতে হাসতে বলল, 'সেদিন আমাকে কি বলেছিল জানিস? বলেছিল—লুকিয়ে লুকিয়ে আবার আচার খাচ্ছ না ত! কী লজ্জা যে করছিল। মনে মনে বললাম—বেশ করব খাব. জ্বর হলে আবার দেখতে আসবে!'

আশ্চর্য! নীলাব এই ষোল বছরের জীবনের ঘুম ভাঙছে। আর এই ঘুম-ভাঙা আলোয় সে প্রথম দেখেছে অসিতকে। তাব বাবার অনেক টাকা। জমিদাবী ছিল। সে গোপনে শুনেছে, বাবা নাকি অসিতকে বিলেত যাবাব টাকা দেবে বলেছে।

নীলা, এবার স্কুলের শেষ পরীক্ষায় বসবে। সাধাবণ মেয়েদের চেয়ে তার স্বাস্থ্য ভাল। যা বয়স তার চেয়ে বড় বলেই মনে হয় তাকে। দেখতে শ্যামল, কিন্তু ভারি সুন্দর। তার দীর্ঘ চুলে, চোখে, দেহের প্রতিটি অঙ্গে, এই নদী-পারের শ্যামল মাটির লাবণ্য মিশে আছে।

কেবল মেয়েদের চোখে নয়, নীলাপুরের সমস্ত মানুষের চোখে এই নতুন পথ নির্মাণের উপক্রমণিকাটুকু বিস্ময় এনেছে। এখন তারা দেখে ভোর না হতেই প্রায় আড়াইশ' কোদাল মাঠের মাটি কেটে চলেছে। আর সাঁওতাল মেয়েরা ঝুড়ি নিয়ে সেই মাটি ফেলছে একটু দূরে যেখানে পীচ রাস্তাটা হবে।

নিমাই হাজরা বিকেলবেলা বসে বসে আলুক্ষেতের কাজ দেখছিল। প্রায় এক বিঘার মত খেতে আলু হয়েছে গোঁসাইজীর। গাছগুলোর

ঘন সবুজ মোটা ডাঁটা হয়েছে। সারা ক্ষেত ঢেকে গেছে পাতায়।

তা, চাষটা ভালই হয়েছে দেখা যাচ্ছে। গাঁয়ের গোপাল আর দু'জন মজুর গাছের গোড়া আস্তে আস্তে কোপাচ্ছিল। ওতে আলু বড় হবে। এখনও গাছ মরতে আরও এক মাস। দুটো সেচ আরও অন্তত লাগবে।

গোঁসাইজী হুঁকো টানছিল। ছায়া নেমেছে ক্ষেতে।

এক সময় হুঁকো টানা বন্ধ রেখে নিমাই বলল, 'বুঝলি গোপাল —এবার একটা মাথা যাবে! আস্ত জ্যান্ত মাথা! বুঝলি?'

গোপাল কিছু বুঝতে পারল না। বলল, 'কোথা মাথা যাবে, গোঁসাইজী?'

'হেঁ হেঁ, কোন খবর ত আর রাখবি না। নীলাপুরে লোহার পুল হবে যে। নদী বাঁধা হয়ে গেছে। আর পুল হলেই অমাবস্যার গভীর রাতে একটা অন্তত মাথা দিতেই হবে। অতবড় পুল, নইলে ভেঙে পড়ে যাবে না! বাবা, এ হল শাস্ত্রের কথা!'

গোঁসাইজীর যখনি কিছু গুরুতর সংবাদ পরিবেশনার দরকার হয়, তখনি শাস্ত্র এসে পড়ে। গোপালের মনে বিশ্বাস জন্মাবার পক্ষে এই উল্লেখটি অপূর্ব কাজ করে!

কল্কেতে আগুন নিবে আসছিল। গোঁসাইজী সেটা একবার টিপে দেখল। নাঃ, কিচ্ছু নেই। তাই রেখে দিয়ে আবার বলতে লাগল, 'তোরা তখন ছেলেমানুষ, গোপাল। ইসলামপুর জানিস? চৌধুরীদের নাম শুনেছিস্? সেই চৌধুরীদের পাকা বাড়ী যখন তৈরী হয়, তখন বাড়ীর ছাদ কেবলই ফেটে পড়ে যায়। কত মিস্ত্রি এল, কেউ ছাদ ঠিক করতে পারে না। বাড়ী আর হয় না। দেয়ালগুলো তেমনি পড়ে রইল কিছুদিন হাঁ করে। আর বাড়ী নয়ত, যেন রাজপ্রাসাদ। চৌধুরীবাড়ীর তখন কী নাম-ডাক! বড় কর্তার নাম শুনলেই লোক ভয়ে কাঁপে। এই লম্বা, এই চওড়া ইয়া ছাতি, ইয়া গোঁফ, গায়ের রং ধবধবে ফর্সা। বুঝলি না,

গোপাল? তা, বড়বাবু হাটে ঢোল দিয়ে দিলেন, যে মিস্ত্রী ছাদ ঠিক করে দিতে পারবে তাকে পাঁচশ' টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।'

'যায়, যায়—কিছুদিন যায়। একদিন যমদূতের মত কালো, লম্বা, চোখ দুটো লাল জবা ফুল, একজন মিস্ত্রী এসে বাড়িটা অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুবে দেখল। তাবপব বলল—আমি ছাদ ঠিক করে দেব, কিন্তু বড় কর্তার সঙ্গে গোপনে একটা কথা বলব।

'তারপব বড় কর্তাকে মিস্ত্রী কানে কানে চুপি চুপি বলল—অমাবস্যাব রাত্রে পূজো দিতে হবে, হুঁজুর তবেই ছাদ খাড়া হবে। নইলে কারুর সাধ্যি নেই, কর্তা। বড়বাবু গোঁফে তা দিয়ে বললেন—ঠিক আছে। তাই হবে।

'সেই অমাবস্যার দিনটা ঘনিয়ে এল। টিপ্ টিপ্ করে সেদিন বৃষ্টি পড়ছিল। বড়বাবুদেব নায়েবখানাব ঘবে বন্দী একটা সুন্দব বামুনের ছেলেকে সেই গভীর রাতে স্নান করান হল। ছেলেটি কিছু বুঝতে পারেনি? কী ভয়ঙ্কব বাত্রি তার সামনে ঘনিয়ে আসছে। এদিকে মিস্ত্রী আগে থেকে ঘবের মেঝের মধ্যে অনেক গভীর কবে গর্ত কেটেছে। ইট দিয়ে বাঁধিয়েছে নিচটা তলায় একজনেব বসার মত জায়গা।

'অমাবস্যা রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হয়ে এল। বৃষ্টি আর বাতাস ক্রমশঃ বাড়ছে। বড়বাবু টেনেছেন। মিস্ত্রী ব্যাটাও খেয়েছে খুব। তারপর গভীর রাত্রে ছেলেটিকে মেঝের সেই গর্তের কাছে নিয়ে এসে মিস্ত্রী বলল—নিচে বসে তোমায় পূজো কবতে হবে। ঐ প্রদীপ জ্বলছে। এ পূজো গভীর রাত্রে একা ছাড়া হয় না। ছেলেটির মুখ ভয়ে শুকিয়ে আসছিল। চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়ছিল তার। বলছিল—বাবু, আমি পারব না পূজো করতে, আমাকে বাড়ী পৌঁছে দাও। আমার ভয় করছে। বড়বাবু ধমকে উঠলেন, কি! বাড়ী যাবি?

'ভয়ে ভয়ে ছেলেটি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল। গর্তের শেষ প্রান্তে একটা প্রদীপ জ্বলছে। হঠাৎ সিঁড়িটা তুলে নেওয়া হল। তারপরই ইটের পরে ইট পড়তে লাগল সেই গর্তে। পাঁচজন যোগাড়ে

লুকিয়ে ছিল কোথায়। একটা কান্না ভেসে এল। মিস্ত্রী বলল-- শালারা শুনসিছ কি? জলদি ইট ফেল। হঠাৎ একটা প্রবল ঘূর্ণি বাতাস ঈশান কোণ থেকে সারা বাড়ীব ওপর দিয়ে বয়ে গেল। তারপর সেই রাত্রে চূণ-শুরকি দিয়ে মেঝেটা গেঁথে দেওয়া হল। আর অন্ধকারে ইটের ঘা খেয়ে খেয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে বামুনের ছেলেটা চিরদিনের মত থেকে গেল সেই কবরের অন্ধকারে।'

বিস্মিত গোপাল আর মজুর দু'জনের হাতেব কাজ বন্ধ হয়ে গেছল। গোঁসাইজী থামতে তিনজনেই এক সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

গোপাল বলল, 'তা, এবার ছাদ দাঁড়াল!'

'হ্যাঁ। দাঁড়াল। আব ভেঙে পড়েনি। দেখিস্, কখনও যদি ঐদিকে যাস্, দেখে আসিস বাড়ীটা। হেঁ হেঁ, নদীতে লোহার পুল হচ্ছে, ও একটা মাথা যাবেই। তুই দেখিস গোপাল, আমার বাক্যি সত্যি হয় কি না!'

গোপাল গোঁসাইজীর কথা অবিশ্বাস করতে পারল না। তার মনে হল, সে যেন শুনছে, এই অন্ধকারে আলুক্ষেতের ওপারে বামুনের ছেলেটা অন্ধকারের কবর থেকে উঠে এসে কাঁদছে। আর তার সেই কান্নার একটানা শব্দটা আসন্ন রাত্রির ভিজে বাতাসে ভেসে ভেসে আসছে!

॥ ১১ ॥

একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু স্কুলের লাইব্রেরী ঘরে বসে ছিলেম। নমিতা, উমা, নন্দিতা ঢুকতেই উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

ওরা তিনজনেই নমস্কার করল।

তিনি হাত তুলে কি যেন বললেন। সেই অস্পষ্ট শব্দগুলি বোঝা গেল না। তারপর নিজেই তাঁর পরিচয় দিলেন—'য়ুনিভারসিটির ছাত্র আমি। এই অঞ্চলে এসেছি ষ্টাডি ট্যুরে। এখানে থাকার

জায়গা কোথায় পাওয়া যাবে জিজ্ঞেস করতে, একজন ভদ্রলোক এই স্কুলের হেড মিসট্রেসের কাছে আসতে বললেন। একটা ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন।'

নমিতা খুশি হয়ে বলল, 'আপনি আমাদের স্কুলেই থাকবেন। আপনার জিনিসপত্র।'

'সবই সঙ্গে আছে।' দূরে সুটকেস আর কম্বল জড়ান ছোট্ট একটা বিছানা দেখা গেল।

'আপনার খাওয়া-দাওয়ার কিছু বাধা আছে নাকি ?'

'আমরা একবেলাই খাই। সূর্য অস্ত গেছে। আজ আর কিছু খাব না।'

নন্দিতা বলল, 'না খেয়ে থাকবেন ? কতদূর থেকে এসেছেন !'

বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'আমাদের এইটিই নিয়ম।'

দেরি হচ্ছে দেখে উমা, নন্দিতা নিজেরাই গেস্টরুমটা ঠিক করতে লেগে গেল।

ভিক্ষু হাত মুখ ধুয়ে ঘরে এলেন : 'বাঃ, সুন্দর ঘরটি ত !' তারপর নমিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কোথায় গাছতলায় থাকব তা নয়, এ যে একেবারে রাজপ্রাসাদে এসে গেলাম !'

নন্দিতা বলল, 'আপনি কি নিয়ে এম· এ. পড়েন !'

'ফিলজফি ।'

নমিতা বলল, 'এই হল নন্দিতা আর এই হল উমা। নন্দিতাই আপনার দেখাশোনা করবে।'

আলো দিয়ে ওরা তিনজন ঘরে চলে এল। তিনজনের মনের মধ্যে এক অপরিচিত আনন্দ-ধারা বইছে। কোথাকার এক সন্ন্যাসী অতিথি হয়ে এসেছেন। এই গার্লস স্কুলের জীবনে এমন বিচিত্র অতিথি এসেছে কি ?

নন্দিতা ভাবছিল, এ কেমন সন্ন্যাসী ! কী অপরূপ রূপ ! এই হলদে পোশাক যেন সেই রূপকে আরও উজ্জ্বল করেছে ! টানা

টানা চোখ, যেন তুলি দিয়ে আঁকা ! কী অপূর্ব মুখশ্রী, মুণ্ডিত কেশ ! শান্ত ! ধীরে ধীরে কথা বলেন ! সে যেন কথা নয়, গান ।

আর উমা ভাবছিল সন্ন্যাসীর কথা নয়, নন্দিতার কথা। কেন এই সন্ন্যাসী মুহূর্তের মধ্যে নন্দিতার চোখে এত অধীর অচেনা আনন্দ এনেছে ! নন্দিতা সহজে কোন ছেলে দেখে চঞ্চল হবার মেয়ে নয়। সাধারণ ছেলে ওর মনে কোন রেখাপাতই করে না। ও সব সময়েই অসাধারণের পূজারী। ওর এই উন্নত, সংস্কৃত, গভীর শিল্পী মনের অন্তত কাছাকাছি পৌঁছতে পারে, এমন ছেলেকে উমা নিজে কখনও দেখেনি। এই সন্ন্যাসী কী করে সেই ঘর খোলার চাবিকাঠি পেল ! উমা বিস্মিত হয়ে কেবল নন্দিতাকে দেখতে লাগল, যে নন্দিতা অন্যমনস্ক, যে নন্দিতা গম্ভীর, যে নন্দিতা অনেক দূরের !

নমিতা ভাবছিল, আশ্চর্য জীবন এই সন্ন্যাসীর। বেশ সুন্দর বলছিলেন—কোথায় গাছতলায় থাকব, তা নয় রাজপ্রাসাদ। কোথায় দেশ ছিল সন্ন্যাসীর ? নিশ্চয়ই চট্টগ্রাম। কথার উচ্চারণ তেমনি ।

নমিতা ভাবছে, কাল ওঁকে দিয়ে ছাত্রীদের কাছে কিছু বলার ব্যবস্থা করলে হয়। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে উনি যদি কিছু বলেন। কোথায় ইতিহাসের এক পাতায় লেখক বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে দু'লাইন বলেছেন। কিন্তু এইচ. জি. ওয়েলস পৃথিবীর ইতিহাস লেখার শেষে যাঁকে "গ্রেটেস্টম্যান অব দি ওয়ার্লড" বলেছেন, তাঁকে এক পাতার মধ্যে ছাত্ররা জেনে ফেলবে, এ ভাবতেও নমিতার হাসি পায়। আশ্চর্য এই গ্রন্থকাররা !

নমিতা, উমা, নন্দিতা তিনজন যে যার ঘরে চলে গেল।

উমা বলল, 'নন্দিতা, তুই অন্যমনস্ক হয়ে উঠেছিস কেন রে ?'

'কোথায় ? তুই কি আজকাল 'থটরিডিং' অভ্যাস করছিস নাকি, পার্টনার ?'

নন্দিতা তেমনি বিছানায় শুয়ে আছে, আলোটাতে একটা বইয়ের আড়াল দিয়ে। খাওয়ার ডাক এল। নন্দিতা বলল, 'অতিথি

না খেয়ে রইলেন, আর আমরা খেতে যাচ্ছি। খারাপ লাগছে, পার্টনার।'

'কিন্তু ওটা যে ওঁদের ধর্ম। তুই কি করবি বল?'

'আচ্ছা, দাঁড়া; উনি কি করছেন দেখে আসি, যদি কিছু দরকার হয়। তুই গিয়ে খেতে বস্।'

নন্দিতা চলে গেল। গেস্টরুমের কাছে গিয়ে দেখল, স্বল্প আলোয় ভিক্ষু প্রার্থনায় বসেছেন। চোখ দু'টি মুদ্রিত, দেহ স্থির, উন্নত। যেন জীবনের স্পন্দন পাওয়া যাচ্ছে না।

নন্দিতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল সেই অপূর্ব ধ্যানমূর্তি। কে যেন তাকে সেই মূর্তিব দিকে টেনে রাখছে, যেমন করে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের অনন্ত জলস্রোত অদৃশ্য অজানা আকর্ষণে উদ্বেল হয়।

পরদিন সকালে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, উমা, নমিতা, নন্দিতা সকলে মিলে চা খেতে বসেছিল।

নন্দিতা জিজ্ঞেস কবল, 'আপনার নিশ্চয় একটা নাম আছে?'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য আছে।'

'কে কে ছিলেন বাড়ীতে, আপনার?'

সন্ন্যাসী একটু চুপ করে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'সন্ন্যাস নেবাব আগের জীবনের দিকে আমাদের সাধারণতঃ তাকাতে নেই। তবু আপনি জানতে চাইছেন।—আমার বাবা, মা, আব একটি বোন ছিল।'

'সব ছেড়ে চলে আসতে কষ্ট লাগেনি?

'না, কেবল বোনের স্মৃতিটুকু ছাড়া।'

নন্দিতা যেন চট্টগ্রামের সমুদ্রপারের নারকেল বীথি ঘেরা কোন এক সুদূর নির্জন গ্রামের বেড়া দেওয়া একটি কুটিরে জন্ম নিয়েছে। সেখানে তার দাদার সংগে ধুলো খেলে সে বড় হয়ে উঠেছিল। সেই দাদা একদিন সব ছেড়ে চলে গেল। একবারও পেছন ফিরে তাকাল না।

নমিতা আবার বলল, 'বোনটি খুব আদরের ছিল?'

'হ্যাঁ, আমাকে খুব ভালবাসত! সংসারে আমি যেন তার সব ছিলাম। তারপর চলে আসতে হল একদিন। ছোট স্নেহের আশ্রয়কে পেরিয়ে না এলে, বড় স্নেহের আশ্রয় যে পাওয়া যায় না! বাবা-মাকে বললাম—আমি চলে যাব, ভিক্ষু হব। তাঁরা শুনলেন, দুঃখ পেলেন, কিন্তু বাধা দিলেন না। কারণ, আমাদের দেশে এই ঘটনা নতুন নয়। কিন্তু ছোট বোন, সে ত কিছু বোঝে না! তার কাছে পৃথিবীর পথ যে পরিচিত নয়! তার কান্না থামান গেল না। যেদিন আসব, তার আগের সারাটা রাত সে কেঁদেছে। অভিমান করে কথা বলেনি। সূর্য ওঠার আগে আমাকে আমার গ্রাম ছেড়ে চলে আসতে হবে। আমি চলে আসছি। বোনটি কিছুদূর এসে কেঁদে কেঁদে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আমি একবার ফিরে তাকালাম। যদিও আমাদের পেছনে ফিরে তাকাতে নেই। সামনের পথ আমার কাছে তখন আবছা হয়ে উঠেছে।' সন্ন্যাসী মুখ নিচু করে আস্তে আস্তে ব'লে যাচ্ছিলেন।

আশ্চর্য! নন্দিতার চোখে জল এসেছে। নিজেকে কোনভাবে সে সংযত করে বলল, 'আর কখনও বাড়ী ফিরে যাননি?'

'না, যাইনি। কোন স্নেহ কোন মায়ায় আমাদের আবদ্ধ হতে নেই। সব সময় যেন আমাদের চলে যাবার জন্যে তৈরী থাকতে হয়। আপনাদের দর্শনে একটি খুব সুন্দর কথা আছে। গীতায় স্থিতপ্রজ্ঞতার লক্ষ্মণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে, সেই মন স্থিতপ্রজ্ঞ, "যঃ সর্বত্র অনভিস্নেহঃ"—যে মন কোথাও বদ্ধ হয়ে থাকে না, কোন মায়ার জালে নিজেকে জড়ায় না। সন্ন্যাস ধর্মেও এই কথা মেনে চলতে হয়। কোথাও বেশীদিন সন্ন্যাসীদের থাকতে নেই। 'চরৈবেতি'—এগিয়ে চল। তাদের কেবল চলতে হয়। এক বৃক্ষ ছায়া থেকে আর এক বৃক্ষ ছায়ায়, এক পথ থেকে আর এক পথে, এক নদীতীর থেকে আর এক নদীতীরে কোথাও থামতে নেই। থামলেই ভাল লেগে যাবে, মায়া আসবে, বন্ধন গড়ে

উঠবে। সন্ন্যাসীর জীবন, যেন কেবল অনন্ত পথ-চলার বিচিত্র আনন্দ।

ভিক্ষু থামলেন। সকালের এই মেঘলা নিস্তব্ধ ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশটুকু কখন করুণ হয়ে উঠেছে।

মরা নদীটার তীর দিয়ে হাটতে হাঁটতে সন্ন্যাসী স্বদেশবাবুর বেসিক স্কুলে পৌঁছালেন। দূর থেকে স্কুলটিকে ছবির মত মনে হয়। নারকেল, সুপুরি আর নানা গাছের আড়ালে বিচ্ছিন্ন অনেকগুলি খড়ের ঘর। সামনে একটি বড় পুকুর, প্রশস্ত উঁচু পাড়, ঘাট বাঁধান। গাছের নীচে একটি ছেলে বসে ছিল। সন্ন্যাসী দেখেই উঠে দাঁড়াল: 'নমস্কার।'

সন্ন্যাসী আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত তুলে অনুচ্চস্বরে বললেন, 'স্বদেশবাবু আছেন?'

'হ্যাঁ, আছেন। আসুন আমার সঙ্গে।'

স্বদেশবাবু চরকায় সুতো কাটছিলেন। সন্ন্যাসীকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন।

সেই ছেলেটি একটি মোড়া এগিয়ে দিল। 'বসুন আপনি।'

সন্ন্যাসী ও স্বদেশবাবু উভয়ে বসলেন। সন্ন্যাসী বললেন, 'আমি এখন নীলাপুর গার্লস স্কুল থেকে আসছি। আমি ইউনিভার্সিটির একজন ছাত্র। একটা স্টাডি-ট্যুরে এসেছি এ অঞ্চলে। আপনার একটু সাহায্য চাই।'

'বলুন, আমার যেটুকু সাধ্য আপনাকে সাহায্য করব।' স্বদেশবাবু আন্তরিকতা নিয়ে বললেন।

'আমি এই অঞ্চলের লোকের আচার-বিচার, ইতিহাস, সংস্কৃতি, এখানকার লোকের জীবিকা বা আর্থিক কাঠামো, এইসব তথ্য একটু জানতে চাই।'

এমন সময় হঠাৎ সেখানে একটি মেয়ে এসে নমস্কার করে

দাঁড়াল। তারপর বলল, 'আমি এখানকার অতিথি মন্ত্রী। আপনাকে আজ এখানে থাকতে হবে, আমাদের সঙ্গে।'

'তাই নাকি? তা মন্ত্রীর কথার অবাধ্য হই কি করে?'

ইতঃমধ্যে একটি ছেলে এক গ্লাস সরবৎ নিয়ে এল। আর প্লেটে কিছু ফল।

স্বদেশবাবু হেসে বললেন, 'এই এখানকার নিয়ম। সমস্ত কিছুর ভার ছেলে-মেয়েদের ওপর।'

এই অবসরে মেয়েটি চলে গিয়েছিল, একটু পরে সে এসে বলল, 'আপনার ঘরটা দেখে আসবেন চলুন।'

সন্ন্যাসী মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চললেন। যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কি?'

'ছায়া।'

'তা তোমার মন্ত্রিত্ব কদ্দিনের জন্যে?'

'এই এক মাসের জন্যে। তারপরে আবার ভোট হবে, ভোটে আবার নতুন মন্ত্রী হবে।'

ছায়া তার অসঙ্কোচ পদক্ষেপে, সাদা খদ্দরের শাড়ীতে অজস্র কালো চুলে একটি পরম প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে চলছিল। তারপর, নির্বাচিত ঘরটিতে এসে বলল, 'এই আপনার ঘর। এই বিছানা। এই দড়িটা টানলে কেউ না কেউ আসবে আপনার কাছে, আপনার কি দরকার জানতে।'

'বাঃ, সুন্দর ব্যবস্থা ত! তোমাদের সরকার দীর্ঘজীবী হোক্। কিন্তু এমনি কত মন্ত্রী আছে তোমাদের?'

'অনেক। যেমন শিক্ষা-মন্ত্রী, স্বাস্থ্য-মন্ত্রী, রান্না-মন্ত্রী, অনুষ্ঠান-মন্ত্রী। স্কুলের সব বিভাগের ভার এক একজন মন্ত্রীর ওপর। চলুন, এখন জ্যাঠাবাবুর ঘরে আপনাকে পৌঁছে দিই।'

ছায়া সন্ন্যাসীকে নিয়ে আবার স্বদেশবাবুর ঘরে ফিরে এল।

স্কুলটির তিনদিকে বাগান। সামনে দীঘির পাড়ে তরিতরকারির ক্ষেত। স্বদেশবাবু সন্ন্যাসীকে নিয়ে বাইরে এলেন। সকালের

আলোয়, সাগ্না বেসিক স্কুলটিকে একটি ছবি বলে মনে হচ্ছিল। একটু এগিয়ে এসে স্বদেশবাবু বললেন, 'এইটিই আমাদের প্রার্থনা ঘর। ওর সামনেই মন্দির।'

'কোন দেবতা থাকেন?'

'না, কোন দেবতা থাকেন না। গান্ধীজী একবার এসেছিলেন এখানে। এই ঘরে একটি সন্ধ্যা ছিলেন। এইখানেই তিনি প্রার্থনান্তিক সভায় ভাষণ দিয়েছিলেন। সেই স্মৃতি শুধু এ ঘরের মধ্যে আছে। আর কোন দেবতা নেই।'

সন্ন্যাসী স্তব্ধ হয়ে সেই ঘবের সম্মুখে একটু দাঁড়ালেন। একটি ঘটনা তাঁব মনে পডছিল, কে একটি শীর্ণ মানুষ সম্মুখের দূরের আকাশেব দিকে চোখ রেখে, দীর্ঘ শীর্ণ আঙুল প্রসারিত করে বলছেন, "আই ডু নট ফিয়ার ডেথ্—বাট আই ফিয়াব গড এলোন।" মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না। আমি ভয় পাই একমাত্র ভগবানকে। এই মন্দিরে তাঁরই পদচিহ্ন পডেছিল অন্য দেবতার প্রতিমূর্তি এখানে বসিয়ে রেখে লাভ কি?'

স্বদেশবাবু বললেন, 'ঐ আমাদের ক্লাশ হচ্ছে।'

সন্ন্যাসী দেখলেন, ছেলে-মেয়েরা মেঝেতে মাদুর পেতে বসেছে। যিনি পড়াচ্ছেন তাঁর জন্য একটা শুধু জলচৌকি আছে। সেখানকার একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'নমস্কার। আপনি কি বসবেন?'

সন্ন্যাসী মাদুরের একধারে বসে পড়ান শুনতে লাগলেন। বাংলা পড়ান হচ্ছে।

একটি ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা সোনাদা, আমরা যে ভাষায় কথা বলছি, এই ভাষায় কত লোক কথা বলে?'

'এই ভাষায় প্রায় সাড়ে সাত কোটি লোক কথা বলে। জান, পৃথিবীতে মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা সপ্তম স্থান অধিকার করে।'

একজন বলে উঠল, 'তাহলে প্রথম স্থান কোন্ ভাষার?'

'চীনে ভাষার।'

ওধার থেকে একজন বলে উঠল, 'কেন, ইংরেজী ভাষায় পৃথিবীর বেশি লোক কথা বলে না ?'

'না, ইংরেজী দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে।

পিছনের দিকের একটি মেয়ে বলে উঠল, 'আচ্ছা সোনাদা, এই আমরা যেমন করে কথা বলি, আমাদের সেই অনেক অনেক আগের লোকেরা এমনি করে কথা বলত ?'

সোনাদা হাসলেন। বললেন, 'খুব ভাল কথা জিজ্ঞেস করেছ ত ? অনেক অনেক আগের লোকেরা বললে ত ঠিক বোঝা যাবে না। আসলে ভাষাটা এ রকম ছিল না। প্রথমে ছিল বৈদিক ভাষা।'

'ওই যে—আমরা খাবার সময়, প্রার্থনার সময়, যে মন্ত্র বলি—সেই ভাষা—না ?'

'হ্যাঁ, প্রায় ওই ভাষা। ওই বৈদিক ভাষায় আর্যরা কথা বলতেন। আচ্ছা, কে বলতে পার—আর্যরা কখন ভারতে এসেছিলেন।'

একজন বলল, 'খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০ অব্দে।'

সন্ন্যাসী বললেন, 'বাঃ, সুন্দর পড়ানর ব্যবস্থা ত আপনাদের !'

'আমাদের কোন বই নেই। এমনি পড়ান হয়'

ওঁরা বেরিয়ে এলেন ক্লাশ থেকে।

সূর্যাস্তের পূর্বেই এই স্কুলের খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে যায়। তারপর সমবেত প্রার্থনা। প্রার্থনার পরে ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনা করে। প্রার্থনা সভায় সন্ন্যাসী ও স্বদেশবাবু এলেন। অনুষ্ঠান-মন্ত্রী ওঁদের মঞ্চে নিয়ে এল। মঞ্চটি স্থায়ী।

ঘরের আলোগুলো কমিয়ে রেখে, তাতে বই খাতা ঢাকা দেওয়া হয়েছে। সকলেই বসেছে নিঃশব্দে। ঘণ্টা পড়ল তিনটি। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই গীতার শ্লোক আবৃত্তি করতে লাগল। স্থিতপ্রজ্ঞতার লক্ষণ বর্ণনাকারী সেই মৃত্যুহীন শ্লোকগুলি অনুচ্চ শিশু কণ্ঠের সঙ্গীতে সারা ঘর ভ'রে তুলছিল। শ্লোক আবৃত্তির পর ক্ষণিক স্তব্ধতা। তারপর একটি ছেলে হারমোনিয়াম নিয়ে ধীরে ধীরে গাইতে আরম্ভ

করল—'মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ, তোমায় করি গো নমস্কার।'

সন্ন্যাসী বিস্মিত হয়ে এই প্রার্থনা, এই সঙ্গীত শুনতে লাগলেন।

চারিধারে রাত্রির প্রথম অন্ধকার জড়ো হয়েছে।

আবার খানিক স্তব্ধতা।

অনুষ্ঠান-মন্ত্রী দাঁড়িয়ে বলল, 'আমাদের পরম সৌভাগ্য, আজকের এই প্রার্থনা সভায় একজন সন্ন্যাসী এসেছেন। আমাদের ছাত্র-জীবনে এই দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমরা তাঁর মুখ থেকে কিছু শুনতে চাই।'

মুগ্ধ সন্ন্যাসী উঠে দাঁড়ালেন। এবং ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে শিক্ষামূলক অনেক কিছু বললেন।

পরদিন সন্ধ্যায় সন্ন্যাসী ফিরে এলেন।

সেদিন না আসার জন্য নমিতা, উমা, নন্দিতা অভিযোগ করল।

সন্ন্যাসী বললেন, 'কাজ শেষ হয়ে গেছে। ভোরেই চলে যাব।'

সন্ন্যাসী প্রার্থনায় বসবেন। ওরা ঘর ছেড়ে চলে এল।

নন্দিতার ঘুম আসছে না। সে কেবল বিচ্ছিন্নভাবে কি সব ভেবে চলেছে! সে কি কোন জন্মে এমন সন্ন্যাসী ছিল, এমনি পথকে সঙ্গী করে অজানা গ্রাম, নদী, বন পেরিয়ে কোন সমুদ্রের উপকূলের উদ্দেশ্যে চলে গিয়েছিল—যেখানে জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, দুঃখ নেই, সুখ নেই। যেখানে নির্বাণদীপ্ত আলোকে নতুন জগৎ উৎসারিত।

অথবা কোন জন্মে সে কি ভিক্ষু ছিল? নারকেল-সুপারিবীথি ঘেরা কোন গ্রামের বিষণ্ণ সকালের আলোয় সে কি চলে এসেছিল সকল কান্নাকে পিছনে ফেলে রেখে? সে কি নিজের ছোট গৃহ পেরিয়ে পৃথিবীর বিরাট গৃহের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল কোন জন্মে?

ভোর হয়ে আসছে। মরানদী আর বাবলা বনের উপরের আকাশটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। সন্ন্যাসী চলে যাবেন। না, তাঁর যাবার সময় নন্দিতা সেখানে যাবে না। জীর্ণ বস্ত্রের মত, এই

ত'দিনের ছোট ঘরটা, যে ঘরটা নন্দিতা নিজের হাতে সাজিয়েছিল গন্ধরাজ ফুল দিয়ে, তা পড়ে থাকবে একটা বিদায়ের কান্না নিয়ে।

এই রাত্রিশেষের নির্জন পথ ধরে সন্ন্যাসী চলে যাক্—চলে যাক্।

কেউ ওঠেনি। তবু নন্দিতা চুপি চুপি দরজাটা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ঐ সন্ন্যাসী চলে যাচ্ছেন মাথা নিচু করে উঁচু লোনা-মাটির পথ দিয়ে।

তখনো ভোরের আলো ফোটেনি। লোক চলাচলহীন নির্জন পথে রাত্রির শিশিরভেজা বিশ্রাম বিছিয়ে আছে!

দেখতে দেখতে আরো দূরে চলে গেলেন সন্ন্যাসী। সেই হলদে রঙের উত্তরী আর দেখা যাচ্ছে না, পথের বাঁকে কখন অদৃশ্য হয়ে গেছেন তিনি। সন্ন্যাসীকে পিছন ফিরে তাকাতে নেই। তিনিও তাকাননি। "যঃ সবত্র অনভিস্নেহঃ"—কোথাও থামবে না, কোথাও মনকে বাঁধা পড়তে দিও না। চল, এগিয়ে চল!

নন্দিতার চোখ ধীরে ধীরে আবছা হয়ে এল। এই পথ, প্রান্তর আর প্রভাতের পূর্ব দিগন্ত, সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। সব যেন এক সুদূর অন্ধকারের বেদনায় কখন ঢেকে গেছে!

নন্দিতা চমকে উঠল।

পার্টনার এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছে: 'ঘরে চল, নন্দিতা?'

আশ্চর্য! নন্দিতা দেখল, পার্টনারের চোখেও কখন জল ভরে এসেছে।

॥ ১২ ॥

নীলাপুরের হাটের আর নদীর ধারের চায়ের দোকানে আড্ডা-মারা ছেলেদের চোখে, কিংবা সেটেলমেণ্ট অফিসের কেরানীদের চোখে, বি. ডি. ও. অফিসের এই জীপটা ঠিক সহ্য হয় না।

না, জীপ বস্তুটার উপর তাদের কোন আক্রোশ নেই। আক্রোশ

তার আরোহীদের উপর। দিন-রাত এই জীপটা নদীর ধার দিয়ে বা লোনা মাটির উঁচু পথটা দিয়ে ধূলো উড়িয়ে দৌড়ুচ্ছে। আর তাতে সামনের আসনে একজন না একজন রঙিন প্রজাপতি থাকবেই।

'রঙিন প্রজাপতি' নামটা চায়েব দোকানের বসময় দিয়েছিল।

নীলাপুর হাই স্কুলে বসময় ক্লাশ এইট পর্যন্ত পড়েছিল। তার-পর আর অগ্রসর হতে পারেনি। ওই ইংরাজী ভাষাই যত ঝামেলা বাধিয়েছিল। থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার, আর প্রেজেণ্টটেন্স—এই এতগুলির দিকে নজর বেখে ভার্বের শেষে এস্ বসান যার তাব কর্ম নয়। রসময়ও তা পাবেনি। হেডমাস্টার মশায় একদিন বলে দিলেন, 'যাও বাবা, চরে খাবে। কিছু হবে না যখন, তখন এখানে জ্বালাতে এসেছ কেন?'

রসময় গুরুবাক্য লঙ্ঘন করেনি। পরদিন থেকে সে আর মাস্টার মশায়কে জ্বালাতে স্কুলে যায়নি। তা, রসময়ের খাওয়া-পরাব প্রাচুর্য না থাকলেও অভাব নেই। বাবার বিঘে দশেক জমি, আলু, বেগুনের ক্ষেত। কিছু পান চাষও হয়। তাতেই একরকম চলে যায়।

রসময় চায়ের টেবিলে ত্রিতালের বোল বাজাতে বাজাতে গ্রাম-সেবিকাদের এই প্রজাপতি নামটা দিয়েছিল। পরণে সর্বদাই দামী রঙিন শাড়ী, হাতকাটা পেটকাটা এবং পিঠকাটা ব্লাউজ। দুষ্টু হাওয়ায় প্রায়শই দেহের উপরিভাগ অনাবৃত। অকুণ্ঠিত কুন্তল দোলায়মান। মুখে প্রচুর পাউডার, ঠোঁটে লিপস্টিক এবং চোখে কাজল।

গ্রাম-সেবিকাদের এই রূপের প্রতি যদি নীলাপুরের ছেলেরা না তাকায়, তবে তাদের জীবন ও যৌবনের প্রতি রীতিমত একটা অশ্রদ্ধা দেখান হয়।

আক্রমণের আর একটা কারণও আছে। জীপে প্রায়ই ট্রাউজার আর হাওয়াই সার্ট পরা আর ডান হাতে ঘড়ি বাঁধা, কোন না কোন 'হিরো'কে দেখা যায়। মেয়েগুলি হেসে তাদের উপর ঢলে পড়ে। নীলাপুরে যে মানুষ আছে, এটা যেন তারা গ্রাহ্যই করে না! বস্তুতঃ

নীলাপুরের প্রতি এই অপমানের প্রতিশোধ, চায়ের দোকানের ছেলেরা নিজেদের মধ্যে গালাগালি আর খিস্তি করেই তুলে নেয়।

সেদিন সন্ধ্যায় আড্ডাটা জমেছিল ভালই। রসময়, পল্টু, ও-পাড়ার কেষ্ট, ফটকে সবাই জুটেছিল নদীর ধারের চায়ের দোকানে। একটা জীপ ধূলো উড়িয়ে দ্রুত চলে গেল সামনে দিয়ে।

রসময় চার পয়সার চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'আঃ।' তার এই পরিতৃপ্তি চায়ে না আর কিছুতে, তা বুঝতে কারুর দেরি হল না। পল্টু বলল, 'আচ্ছা রসাদা, এই প্রজাপতিরা দিন-রাত গ্রামের সেবা করেন, না আর কারো সেবা করেন, সেটা একবারটি ভেবে দেখেছ কি?

রসময় চায়ের কাপ থেকে মুখ না তুলে বলল, 'শালা মার গাঁট্টা'।

'শালা মার গাঁট্টা' শব্দটা রসময়ের একটা মুদ্রাদোষ! যখনি অতি মাত্রায় কোন রসঘন বস্তুর কথা বলতে হয়, তখনি রসময় এই শব্দটা প্রয়োগ করে।

রসময় বলল, 'গ্রাম-সেবিকারা সেবা করবে? দূর! দূর! গ্রামের লোকেদেরই ওদের সেবা করতে হয়। আর ওদের চাকরিটা কি জানিস? এই এদ্দূরে সরকারী বাবুরা এসেছেন। এখানে সিনেমা নেই, গড়ের মাঠ নেই, লাভার্স লেন নেই, গঙ্গার ধার নেই। আছে শালা কেবল এই তোর মরা নদী আর বাবলা বন—আর ধান ক্ষেত। তা বাবুদের এই একটু আধটু···বুঝলি না?'

'একটু আধটু' জিনিসটা রসময় চোখ টিপে বুঝিয়ে দিল।

ফটকে বলল, 'এদের দেশ কোথায় রে, রসা? কোন্ কিষ্কিন্ধ্যা থেকে এল এরা? সেইত গার্লস স্কুলের নমিতাদি, উমাদি! উমাদি না হয় দেশের মেয়ে। নন্দিতাদি? তারা কেউত এমনটি নয়! কী ভদ্র! কথাবার্তায়, চালে, চলনে!'

কেষ্ট বলল, 'হবে না? পেটে বিদ্যে আছে দু'অক্ষর। বি. এ. পাশ করেছে সে।'

'কেন, এদের পেটে বিছে নেই বুঝি? এরাও নাকি আই. এ, বি. এ. পাশ করেছে?'

রসময় আর স্থির থাকতে পারল না। টেবিলে একটা জোর চাঁটি দিয়ে বলল, 'আই এ, বি. এ পাশ করেছে! ওরা যদি ক্লাশ এইটে পাশ করে থাকে, তাহলে তখন তোরা আমার নাক কেটে দিস্।'

রসময় আবার বলল, 'তোরা লেখাপড়া জানা লোক চিনিস না। ও শালা, আমি দেখেই চিনতে পারি। ফটকেটাই ঠিক বলেছে। নমিতাদি, নন্দিতাদি এরা সত্যি লেখাপড়া জানা মেয়ে। এই, আর এক কাপ চা দে, বাবা। তা তোরা কি বুঝবি? সেদিন মিটিঙে নন্দিতাদি কি গাইল। তোর এ তল্লাটে কেউ এমনি গায়? তালে লয়ে একদম পাক্কা একচুল এদিক ওদিক নেই। কী গলা! কি কাজে একদিন সকালে ঐদিকে গেছলাম। দেখলাম নন্দিতাদি এমনি জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভৈরবীতে আলাপ করছে। আঃ, সে কি আলাপ! শালা আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তা এরা হল শিক্ষিতা। বুঝলি? আর গ্রাম-সেবিকারা এসেছেন 'রঙিন প্রজাপতি' হয়ে। কেবল ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াবেন, ফুর ফুর করে।'

কথাটা সমর্থন করে ফটকে বলল, 'তা শুধু উড়ে বেড়ান নয়, রসাদা, একটু পাপড়ির ওপর বসতেও শিখেছে। জানাদের বাড়ির ঐ যে ছেলেটা কাঁথিতে আই. এ. পড়ে, নামটা কি যেন? অমল? হ্যাঁ, অমল বুঝলে না, রসাদা? এখন একটু আধটু মধু আস্বাদন করছে।'

রসময় বলল, 'অমলের তা হলে ত তাগদ আছে বলতে হবে। শালা যেমন জিনিস তার তেমন ব্যবহারটা হওয়া ভাল। তোদের কারুর ত একফোঁটা তাগদ নেই। কেবল দেখে দেখে জিভের জল ফেলা। অমল তবু ত চেখে দেখল।'

রসময় পুনরায় ত্রিতালের বোল বাজানয় মন দিল।

অমলদের বাড়িটা নীলাপুর থেকে মাইল তিনেক পশ্চিমে। গ্রাম-সেবিকাদের গ্রামে কোথাও ত থাকতে হবে। মলি সেনগুপ্তা অমলদের বাড়িতেই অতিথি হয়েছিল কয়েকদিন। গ্রামের মধ্যে ওদেরই অবস্থা ভাল। তা, মলি দিনকয়েকের মধ্যে মাসীমা, মেশো-মশায়, অমলদা ইত্যাদি বানিয়ে ফেলে তার স্থায়ী আতিথ্যের পাকা ব্যবস্থা করে ফেলেছে। অমলদা বলতে ত মলি অজ্ঞান! সে কেবল অপেক্ষা করে, অমলদা কবে কলেজ থেকে ফিরবে। বেড়াবে, কেরাম খেলবে একসঙ্গে। মলি সেনগুপ্তা কৃতী মেয়ে। এই কৃতিত্ব না থাকলে মফঃস্বলের ব্লকে চাক্‌রী করতে আসা যায় না।

অমল কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। সবেমাত্র ছন্দ মিলিয়ে দু'একটা কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছে। নতুন বাংলা কবিতার এই শুভ জন্ম মুহূর্তে মলি সেনগুপ্তার আবির্ভাব। মলির সবচেয়ে বড় গুণ, সে হারমোনিয়াম বাজিয়ে সিনেমার আধুনিক গান গাইতে পারে।

অমল এই প্রথম মহকুমা শহরে গেছে। সেখানে দুটো সিনেমা হল আছে তার উপর কো-এডুকেশনের কলেজ। অমল শুনেছে সহপাঠিনীরা নাকি আধুনিক গান বলতে পাগল। এবং তাই নিয়ে অমলের বন্ধুরা রাতারাতি দিশি রীডের সস্তা হারমোনিয়াম কিনে আধুনিক গানের জোর অনুশীলন আরম্ভ করেছে।

অমল শুধু এসব দেখছিল। সে পাড়াগাঁ থেকে এসেছে। আধুনিকা তরুণীদের সম্পর্কে তার ভাল লাগার অন্ত নেই, কিন্তু ভীতিও নেই একথা বলা যায় না!

যে মহীয়সী অমলকে এই ভীতির অন্ধকার থেকে নির্ভয় আলোকে নিয়ে এল, সে মলি সেনগুপ্তা।

গ্রাম-সেবিকা মলি সেনগুপ্তার বয়স বছর পঁচিশ। অতি ছিপছিপে রোগা পাতলা গড়ন। চোখে মুখে পরিচ্ছন্ন দীপ্তি আছে। সুন্দর মুক্তোর মত দু'পাটি দাঁত নিয়ে মলি যখন ধীরে ধীরে কথা বলে, তখন তরুণ চিত্তে চমক লাগবেই। মলির তীক্ষ্ণ শিকারী চোখে এ চাঞ্চল্য আড়াল পড়ে না।

মলিকে পরদিন বি. ডি. ও. অফিসে রিপোর্ট দিতে হবে। কাজের রিপোর্ট। সপ্তাহে কি কি গ্রামসেবা করেছে সে। রিপোর্টের হিসাব অনুযায়ী মলির সপ্তাহের প্রতিদিন চব্বিশ ঘণ্টা খাটা উচিত। কিন্তু মলি সেনগুপ্তা অত বোকা নয়। তাকে সাতদিনে সাত ঘণ্টার বেশী খাটতে হয় না। আর সাত ঘণ্টার দু'ঘণ্টা যায় রিপোর্ট লিখতেই।

অর্থাৎ একটা কাজ মলি সেনগুপ্তা কবে থাকে, সেটা রিপোর্ট লেখার কাজ। অফিসেব তরুণ হেডক্লার্ক তাকে শিখিয়ে দিয়েছে, গভর্নমেণ্ট মানেই রিপোর্ট আর রিটার্ন। কাজেই রিপোর্টটা ঠিক রাখতে হবে। পার্মানেন্সি বলুন, প্রমোশন বলুন, সবই এই রিপোর্টের উপর নিভরশীল।

কিন্তু মাঝে মাঝে ঝামেলা হয় ইংরেজীতে রিপোর্ট লেখায়। মলি বহু কষ্টে তৃতীয় বিভাগে ম্যাটিক পাশ করেছিল। এই বিদ্যে নিয়ে ইংরেজীতে বানিয়ে বানিয়ে রিপোর্ট লেখা একটু কষ্টসাধ্য বইকি ? আর ইংরেজী না লিখলে মান থাকে না। বি. ডি. ও. সাহেব বাংলা ভাষাটা ঠিক পছন্দ করেন না। যতই হোক অফিসার ত ?

মলি রিপোর্টের নকলটা নিয়ে অমলেব ঘরে আস্তে আস্তে চলে এল। দুজনে মিলে লিখবে বলে। অমল কলেজে পড়ে, লেখাপড়াতেও ভাল।

গ্রীষ্মের ছুটি অমলের। বাইরে প্রখর রৌদ্র। কিন্তু অমলের এই মাটির দোতলা ঘরটা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা।

অমল একমনে কবিতা লিখছিল। চোখে তার সহপাঠিনী আরতির ছবি। আরতি দাস। তার সঙ্গে আই. এ. পড়ে। রং তাঁর উজ্জ্বল শ্যামল। মাথায় অজস্র ঢেউ খেলান কালো চুল। একটি পবিত্র কুমারী মূর্তি। কলেজের উঠোনে সে যখন ধীরে ধীরে হাঁটত, অমল তার নিটোল পা দু'টি কতবার ফিরে ফিরে দেখেছে। আশ্চর্য, সেই আরতিই কমনরুম থেকে একদিন অমলকে ডেকে তার ক্লাশের নোট-খাতা চেয়েছিল।

ক্লাশের সবচেয়ে বখাটে ফাজিল বঙ্কিমটা বলল, 'দে, ওর মধ্যে একখানা চিঠি ঢুকিয়ে দে। তোর কপাল খুলে গেছে রে! ওই প্রফেসাররা আরতির জন্যে পাগল, হালে পানি পায় না। আর তুই গ্রামের ছোঁড়া। আরতির তোকে ভাল লেগে গেল?'

অমল চিঠি দেয়নি। কেবল খাতাটা দিয়েছিল। আর খাতাটা ফিরে এলে অবাক হয়ে দেখছিল, আরতির দেওয়া পেন্সিলের দাগগুলো আরতির মত সুন্দর কিনা!

'ওকি অমলদা, কি লিখছ একমনে?' ঘরে ঢুকেই মলি বলল।

'এই একটু লিখছি!'

'সে ত দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু কি লিখছ তাই জিজ্ঞেস করছি।'

অমল তাড়াতাড়ি খাতাটা লুকিয়ে ফেলল।

না, মলি সেনগুপ্তার কাছ থেকে জিনিস লুকোন অত সহজ নয়। মলি ধরে ফেলল, 'দাও! দেখতে দাও!'

'আঃ, ছাড় ছাড়?' মলি খাতা টানতে গিয়ে নিজেকেই অমলের কোলের দিকে টেনে আনল। অমল মলির গোল খোঁপা থেকে কি একটা মধুর গন্ধ পাচ্ছিল। ওর চুলগুলো একটুও আরতির মত নয়। এই জন্যই এত কবরী বাঁধার কায়দা! না। পা দুটোও আরতির পায়ের মত সুন্দর নয়। মাটিতে না হাঁটলে বোধহয় পা সুন্দর হয় না। তবে চোখ দাঁত আরও সুন্দর, তীক্ষ্ণ। কিন্তু আরতির চুল, পা, সুন্দর হলে তার লাভ কি? সে কখনো সে চুল স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু মলিকে সে স্পর্শ করতে পারে।

মলির জয় হল!

'সে রজনীগন্ধা আজো থেকে গেল চেনার বাইরে।'

মলি কবিতাটা পড়তে লাগল। বা, সুন্দর হয়েছে! খুব সুন্দর হয়েছে! মলি তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে বুঝল, এ রজনীগন্ধাটি বাগানে ফোটা নয়, কলেজে ফোটা, এবং নিশ্চয়ই সুন্দর। আঃ, কী দুঃখ অমলদার, সেই রজনীগন্ধা চেনার বাইরে থেকে যাচ্ছে! মলি সেনগুপ্তা

হেসে অমলের গায়ে লুটিয়ে পড়ল : 'অমলদা, প্লীজ—বল না, তুমি প্রেমে পড়েছ ?'

মলি সেনগুপ্তার মুখে এসব কথা একটুও বাধে না। অমল কিন্তু লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

'কই, বললে না ত প্রেমে পড়েছ কিনা ? পড়েছ, না পড়-পড হয়েছ ?'

অমল বলল, 'কী যে বল তুমি ! ও এমনি একটা কবিতা !'

'আমাকে ফাঁকি দিতে চাচ্ছ ! বাবা সেগুড়ে বালি ! এই দুপুরবেলা নির্জন ঘরে বসে রজনীগন্ধার চিন্তা করা হচ্ছে আর কি না প্রেমে পড়নি ? ওসব কাকে বোঝাতে চাচ্ছ ? আচ্ছা অমলদা, তোমার রজনীগন্ধা আমার চেয়ে সুন্দরী ?'

মলি সেনগুপ্তা এমন করে হেসে তাকাল যে, অমল বরফের মত গলতে আরম্ভ করল। বলল, 'না না, কোথায় তুমি আর কোথায় আরতি !'

'তবে আমাকে নিয়ে একটা কবিতা লেখ না কেন ? লিখবে আমাকে নিয়ে ? বল ?'

॥ ১৩ ॥

বাড়ির চিঠিটা হাতে নিয়ে নমিতা চুপ করে লাইব্রেরী ঘরে বসেছিল। এই নীলাপুরে চলে আসার পর, নমিতার সঙ্গে তার বাড়ির যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে আসছে। সে ভেবেছিল, যে পরিবারের সঙ্গে তার কোন আত্মিক যোগ নেই, যে পরিবেশ তাকে পীড়িত করে সেখানে সে আর ফিরে যাবে না। একটি ভাল স্কুলের চাকরি, একটি স্কুলের কোয়ার্টার—এ পেলেই তার চলে যাবে. অবসর নেবার পর কোথাও একটা ছোট বাড়ি করে সে জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে।

কিন্তু বাড়ি থেকে চিঠি আসায় তার মনে হল, সব সম্পর্ক ছিন্ন

করা সম্ভব, রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করা সহজ নয়! বাবা খুব অসুস্থ। পরেশ চিঠি লিখেছে।

পীরিয়ড শেষ হতে শিক্ষক শিক্ষিকারা লাইব্রেরী ঘরে ফিরে এসেছিলেন। একটু গল্প গুজবের পরে আবার সকলেই ক্লাশে চলে গেছেন। কেবল উমা যায়নি। নমিতাদিকে এমনি করে বসে থাকতে সে কখনো দেখেনি। তাই জিজ্ঞেস করল. 'চিঠি কোত্থেকে এল, নমিতাদি?'

'বাড়ি থেকে।'

'সব ভাল ত?'

'না, বাবার খুব অসুখ লিখেছে।'

'কি রকম অসুখ?' উমা ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'তা ঠিক লেখেনি, তবে বাবার লিভারের ট্রাব্‌ল ছিল। কি জানি, তাই থেকে কিছু হবে হয়ত!'

'বেশ ত, তবে ভাবছেন কি অত?'

'ভাবছি, যাব কি না? এখানেও অনেক কাজ।'

'থাক্ কাজ। বাবার অসুখ, অত কাজের ভাবনা পরে ভাববেন।' উমা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'এক্ষুণি বেরিয়ে পড়ুন। রাত ন'টা নাগাদ হাওড়া পৌঁছে যাবেন। উঠুন।'

উমা নমিতার জামা কাপড় সব গুছিয়ে দিল। নন্দিতাকে ডেকে পাঠাল ক্লাশ থেকে। নমিতা চুপ করে ঘরে বসেছিল।

উমা বলল, 'গিয়ে অবশ্যই চিঠি দেবেন।'

কালাচাঁদবাবুকে নমিতা বলল, 'স্কুলটা এই ক'দিন দেখবেন। আমি একটা ছুটির দরখাস্ত রেখে যাচ্ছি। ফিরতে দেরি হতে পারে।'

নমিতা উমাকে চুপি চুপি বলল, 'অসিতবাবুকে কিন্তু খবরটা দিতে পারলাম না।'

রাত্রি দশটা নাগাদ নমিতা আবার তার পুরান পরিবেশে ফিরে এসেছে। সেই মূলি বাঁশের বেড়া-দেওয়া টিনের ঘর, শহরতলির উদ্বাস্তু

কলোনীর সেই পরিচিত পারিপার্শ্বিক। বৌদির ছেলে হয়েছে, দাদার চাকরি এখনও হয়নি।

নমিতা বাবার বিছানায় গিয়ে বসল। কেন যেন তার মনে হল বাবার সেবা যত্ন ঠিক হয়নি। অতি কষ্টে ফিরে তাকাল বৃদ্ধ পরমেশ্বর। তারপর থেমে থেমে অসুখের কাহিনীটা বলে গেল।

নমিতা বলল, 'ভোর হোক্ বাবা, কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার নিয়ে আসব।'

নমিতার মুখে 'বাবা' ডাক কতকাল বৃদ্ধ পরমেশ্বর শোনেনি। একটা অব্যক্ত বেদনায় সে নমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। নমিতা তার মেয়ে। সে যে নিজে কি, এই অসুখের শেষের দিনগুলিতে সে ভাল করেই ভেবে দেখেছে। কিন্তু তার মেয়ে এমন রূপে, গুণে সরস্বতীর মত কি করে হয়! বংশের একটি ছেলের ত কই কিছু হল না!

শহরতলির রাত্রিটা বেড়ে উঠেছে ক্রমশঃ।

দাদা ফিরে এসে দু'একটা মামুলি কথা বলার পর শুয়ে পড়ল।

পাশের বাড়ির আলো নিভে গেছে। শুধু পরমেশ্বরের মাথার কাছে একটা হ্যারিকেন টিম্‌টিম্ করে জ্বলছে।

পরমেশ্বরের মনে পড়ল, নমিতা তার মায়ের মত হয়েছে। তেমনি লেখাপড়ায় ঝোঁক, এক গুঁয়েমিটাও তেমনি আছে। নমিতার দাদু স্কুল মাস্টার ছিলেন। লোকে খুব মান্য করত।

'হ্যাঁরে, তর মার কথা মনে পড়ে?'

'পড়ে, বাবা।'

পরমেশ্বর আবার চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'কতদূর থেইক্যা আইছস, খাইয়া শুইতে যা মা।'

'না বাবা, আজ তোমার কাছে থাকব।' নমিতা উঠে গেল না।

'অসুখ হইলে তর মাও এই কথা কইত। কোথা দিয়া কি হইয়া গেল! সব চইল্যা গেল, সব বিষ—সব বিষ হইয়্যা গেল। দ্যাশ ভাগ হইয়া সব সব্বনাশ হইয়া গেল!'

দেশ ভাগ বাঙালী জাতির মেরুদণ্ডটিকে ভেঙে দিয়েছে। অর্থনৈতিক জীবন একদিন গড়ে উঠবে। কিন্তু নৈতিক জীবন? সে আদৌ আবার গড়ে উঠবে কি? উঠলে কত শত বছর পরে?

নমিতা ভাবতে পারে না। অথচ জনসাধারণ এই দেশ বিভাগ একদিন চেয়েছিল। একমাত্র গান্ধীজী চাননি। কিন্তু জনমত? জনমতকে নেতারা ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। সে ক্ষমতা, সে ব্যক্তিত্ব তাদের নেই। রাজনীতির সর্বনাশ খেলায় সাহস ধরতে পারে ক'জন?

শহরতলির অন্ধকার রাত্রিটা গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। একবার বাবার ঘুম ভাঙিয়ে ওষুধ দিল নমিতা।

পরমেশ্বর কেমন যেন অসহায় শিশুর মত পড়ে আছে।

হাসপাতাল থেকে নমিতা সন্ধ্যার একটু আগেই ফিরেছে। কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার সে আনিয়েছিল। হাসপাতালে নিয়ে যাবার পরামর্শ তিনিই দিলেন। সেই হাসপাতালে পরমেশ্বর মারা গেলেন। দাদা আর পাড়ার অনেকে শবদেহ শ্মশানে নিয়ে গেছে।

আশ্চর্য! এই ঘরে বা পাড়ার কোথাও শোকের কোন গভীর ছায়া নেই! মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, অগভীর হয়ে গেছে! স্নেহ ভালবাসার বন্ধন শিথিল হয়ে গেছে এখন। বৃদ্ধ পরমেশ্বরের মৃত্যু তাই একটি অনুল্লেখ্য, প্রত্যাশিত ঘটনা মাত্র। আর সংসারে যার প্রয়োজন ফুরিয়ে আসছে, তার মৃত্যুতে কান্না নিছক একটা অপব্যয়।

নমিতা কেবল ভাবছিল, জীবন কেমন করে পাথরের মত কঠিন হয়ে গেল এই ক'বছরের মধ্যে! অথবা এই হয়ত আধুনিক জীবন।

অথচ বাবার কথা ভাবতে গিয়ে নমিতার চোখে জল এল। সমস্ত বিরোধ সত্ত্বেও সংসারে সে তার সবচেয়ে আপন ছিল। কাল রাত্রে মায়ের কথা বাবার মনে হয়েছিল। নমিতার হাত নিয়ে নিজের কপালে রেখেছিল পরমেশ্বর—সমস্ত না-বলা বেদনার অপূর্ণতা পরমেশ্বর এমনি করেই প্রকাশ করেছিল।

বাবার সঙ্গে অনেক বিরোধ, অনেক বিবাদ। তবু দাওয়ার এই

শূণ্য কোণটার দিকে নমিতা তাকাতে পারছে না কেন? বিছানায় চুপ করে শুয়ে রইল নমিতা। তার জীবন থেকে এ জীবনের মত কেউ হারিয়ে গেল।

কখন সে ক্লান্ত হয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। সাইকেলের ঘণ্টার শব্দ পেয়ে উঠে বসল। 'টেলিগ্রাম। নমিতা দাশগুপ্তা।'

নমিতা দৌড়ে গেল। সই করে ছিঁড়ে ফেলল টেলিগ্রামটা।

টেলিগ্রাম করেছে অসিত।

এই মুহূর্তে সকল বেদনার ঊর্ধ্বে কে যেন তাকে একটি গোপন আনন্দলোকের স্পর্শ এনে দিল। অসিত বড়জোর খবর নেবার জন্য চিঠি লিখবে, নমিতা তাই ভেবেছিল। এ কথাও ভেবেছিল, অসিত যেমন পাগল, সে নিজেই না আবার এসে বসে! নিজে ডাক্তার, হয়ত এলে সুবিধা হবে, এই ভেবে। না এসেই ভাল হয়েছে।

নমিতা বাইরে উঠোনে নেমে সেই আতা গাছটার নিচে এসে দাঁড়াল। উঠোনে এলেই নমিতার ভাল লাগে। সারা খোলা আকাশটা তার চোখে পড়ে। এখন নমিতা তাকিয়ে দেখল, সেই প্রসারিত বিরাট আকাশে কোথাও যেন মৃত্যু-বেদনার ছায়া নেই।

এই মুহূর্তে নমিতার ভাল লাগল। অসিতের সঙ্গে মনে মনে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, অসিতের কোন আচরণে তার কোন বিশেষ প্রকাশ নমিতা দেখেনি। এ যেন একটা চরভূমি, বাইরের স্রোতের অন্তরালে গড়ে উঠছে শুধু!

নমিতার বাবার মৃত্যুতে, এই প্রথম সেই চরভূমিটা জলের সীমারেখা পেরিয়ে আলোর স্পর্শ পেল।

অসিতের টেলিগ্রামের ভাষাটা সেই আলোর স্পর্শ।

ভাল লাগল নমিতার, খুব ভাল লাগল। এই প্রকাশটুকুর প্রয়োজন ছিল। বস্তুতঃ এই প্রকাশটুকুইত জীবনের সুন্দরতমক্ষণ। সব ভালবাসাই কোন না কোন মুহূর্তে নিজেকে প্রকাশ করে ফেলে। কিন্তু জীবন যত জটিল হবে, মন যত পরিপক্ক হবে যত হিসাবী হবে, এই প্রেমের প্রকাশ তত অবরুদ্ধ হয়ে ওঠে কেন? নমিতা ভাবছে,

সে নিজে এবং অসিত বয়সের এমন এক স্তরে এসেছে, যেখানে কেউ নিজের ভাল লাগার, ভালবাসার মধুর দুর্বলতাটুকু প্রকাশ করতে চায় না। যেন ওটা একটা অপরাধ!

ওরা দেখে, জীবনের পাত্র যেন কোথাও কখনও পরিপূর্ণ হয়ে উপচে পড়ে না যায়!

আজ অসিতের টেলিগ্রাম সেই অতিক্রান্ত সংযমের সৌরভ নিয়ে এসেছে। শহরতলির এই টিনের আর মূলি বাঁশের বেড়া-দেওয়া ঘর, এই উঠোন, সব যেন তার কাছে সুন্দর হয়ে উঠেছে আজ।

এখন নমিতা স্কুলে নেই। এই অনুপস্থিতিটুকু সবচেয়ে ভাল লেগেছে বাসন্তীর। বাসন্তী পাশের কোয়ার্টারে বিপত্নীক গৌরীশঙ্করের জন্য একটু বিশেষ যত্ন নেবার চেষ্টা করে আসছে অনেকদিন থেকে

নমিতা আসায় তাতে বাধা পড়েছে।

নমিতার বাবার মৃত্যু সংবাদটা বাসন্তী গৌরীশঙ্করকে দিয়েছিল।

রবিবার সন্ধ্যাবেলা গৌরীশঙ্কর ঘরে বসে বসে বই পড়ছিল। বাসন্তী ঘরে এল। বই থেকে মুখ তুলে গৌরীশঙ্কর বলল, 'অসময়ে এত করুণা?'

বাসন্তী একবার দেখল, কেউ কোথাও নেই।

অন্ধকার হয়ে আসছে ঘরের মধ্যে। বইটা কেড়ে নিয়ে সে বলল, 'বলেছি না, সন্ধ্যেবেলা ঘরের মধ্যে বসে বসে পড়বে না?'

'তবে কি বাইরে বসে বসে পড়ব?'

'কথার ঢং দেখ না, অঙ্কের মাস্টারের অত রস ভাল না।'

'রস কি মিসট্রেসদের একচেটিয়া নাকি?'

বাসন্তী আরো কাছে সরে এসে বলল, 'ডাক্তার টেলিগ্রাম করেছে নমিতাদিকে।'

'সুখবর।'

'তুমি ত সুখবর বলেই খালাস। আমি বলছি, কেমন দুজনে জড়িয়ে পড়ছে দেখ।'

'আমরা যে জড়িয়ে আছি সেইটেই বা কে দেখছে ?'

'না, কেউ দেখছে না। এইত তোমার কাছে এলাম। সব সময় আসতে পারি না। নমিতাদিকে ভয় করে।'

'বুঝতে পারি, সেইজন্যে আমি অন্য স্কুলে চলে যাব।'

'আর আমি ? আমি বুঝি এখানে ইতিহাস ভূগোল পড়াবার জন্যে পড়ে থাকব !'

গৌরীশঙ্কর বাসন্তীকে একটু কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'না, তখন তোমার নতুন ছাত্র জুটবে।'

'হেঁয়ালি ছেড়ে বল, অত ঘোরাল কথা ভাল লাগছে না শুনতে।'

গৌরীশঙ্কর বলল, 'সোজা কথা, গেলে দুজনেই যাব।'

বাসন্তী সেই অন্ধকারে আস্তে আস্তে বলল, 'কি করে যাবে ?'

এই উত্তর শোনবার জন্য বাসন্তী কতদিন থেকে ব্যাকুল হয়ে আছে।

এক সময় চুপি চুপি বলল, 'আশ্চর্য ! কতদিন হয়ে গেল ! জীবন যদি এমনি করে চলে যায় ঃ তুমি কেন ভয় পাও বুঝি না ?'

গৌরীশঙ্কর ভীত গলায় বলল, 'অঙ্ক শেখাই। শেখাতে শেখাতে হিসেবী হয়ে উঠছি বড়। তোমার, আমার, স্কুলের দুর্নাম ?'

'দুর্নাম ?' বাসন্তী সোজা হয়ে বসে বলল, 'কেন দুর্নাম ? ভালবাসার মধ্যে দুর্নাম কোথাও নেই। আসলে তা নয়। তুমি আমাকে ভালবাস না, ভালবেসে পাগল হতে পার না। অসিত যেদিন বুঝবে নমিতাকে তার চাই, জানবে, সেদিন সে পৃথিবী ওলট পালট করে দেবে। এইত যৌবন !'

'আমি যৌবন পার হতে চলেছি, বাসন্তী—' গৌরীশঙ্করের গলাটা কান্নার মত শোনাল।

বাসন্তী সংযত করল নিজেকে। একটি অসতর্ক মুহূর্তে বিপত্নীক গৌরীশঙ্করকে সে আঘাত দিয়ে ফেলেছে। বলল, 'তবু তোমাকে চাই, এ চাওয়া ত আজকের নয়। চল, এবার আমরা চলে যাই। সময় আর নেই, থাকবে না।'

তখন রাত্রি হয়ে গেছে। সেই রাত্রির অন্ধকারে দু'টি মানুষ মুখোমুখি নীরবে বসে রইল।

একটু পরে কারা যেন খুব আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছিল আর তারই শব্দ শুনতে পাচ্ছিল দুজনে।

নন্দিতা চুপি চুপি বলল, 'পার্টনার, কে যেন কথা বলছিল রে, ঐ ঘরে?'

'তোর কি? আস্তে আস্তে চল, শব্দ করিস না।'

॥ ১৪ ॥

মাঠে মাঠে জল ভরে গেছে এখন। কোথাও কোথাও ধান গাছের চারা জলের উপর মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। এই বিস্তীর্ণ মাঠ, মাঝে মাঝে ধান গাছের চারার সবুজ সাম্রাজ্য, আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন সকাল। চারপাশে ছড়ান নীল-নীল গ্রাম। সে এক নতুন স্বাদ!

গ্রাম-সেবক অরবিন্দ গুন্‌গুন্‌ করে গান গাইতে গাইতে গ্রামের শেষের সরু পথটা দিয়ে যাচ্ছিল। এই সকালে নিজের গ্রামের ছবি মনে আসে তার। বাঁকুড়ার সেই কাঁকর-ছাওয়া লাল মাটির পথে এই সকাল কি ছায়া ফেলেছে সেখানে। 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ'—সত্যি কেন যেন মন ভুলায়।

'এই যে, তোমরা কি করছ?'—কয়েকজন চাষী মাঠে চাষ করছিল। তাদের জিজ্ঞেস করল অরবিন্দ।

'আজ ধান রোয়া হবে।'

'কী ধানের চারা?'

একজন মজুর বলল, 'দুধকলম'।

'জমিটা ঠিক করেছ?' অরবিন্দ বসে পড়ল রাস্তার উপর। পকেট থেকে এক বাণ্ডিল বিড়ি বের করল—'নাও তোমরা।' সকলকে

এক একটা বিড়ি দিয়ে নিজেই একটা ধরাল সে: 'তা, কি সার দিচ্ছ ?'

'কি আর দেব ? এই গোবর আর ছাই সার।'

'কেন, বি. ডি. ও. আপিস থেকে সার পাওনি ?'

জমির মালিক সদয় এবার বলল, 'না, দেয়নি। আগে যে বাবু ছিল সে বলল—বীজ, সার, ঋণ সব পাওয়া যাবে। আমরা জমি রেজেস্টারি করে দিলাম। তা, চাষের জো শেষ হতে বসেছে, কিচ্ছু নেই।'

অরবিন্দ নতুন এসেছে এখানে। কিছু না বলে, সে জুতো খুলে মাঠে নেমে পড়ল—দেখতে হবে জমিটা ঠিক নরম হয়েছে কিনা। হেঁটে হেঁটে একটু দেখল। হ্যাঁ, পায়ের তলায় নরম ঠেকছে।

সদয় অবাক! মজুররা তখন ধান-চারা খুলে রুইতে শুরু করেছে মাত্র। তারাও বাবুর কাণ্ড দেখে চেয়ে রইল। অরবিন্দ বলল, 'এক কাজ কর তোমরা। চারাগুলোকে সমান সমান করে দূরে লাগাও। আর এক এক সারিতে লাগাবে।'

সদয় ক্রমশঃ অবাক হচ্ছিল। সে বলল, 'কি করে হবে ?'

'আচ্ছা, বুঝিয়ে দিচ্ছি। দেখ, এই মাটি থেকেই সার নিয়ে চারাগুলো বড় হবে ত ? যদি চারাগুলো এলোমেলো করে লাগাও তবে কোন গাছটা কাছে, কোনটা দূরে হয়ে যাবে। কেমন না ? তাতে সব গাছ সমান সার পাবে না। আর দেখ, সারি বেঁধে লাগালে ধান কাটার কত সুবিধে! বুঝেছ ?'

সদয় মাথা নেড়ে বলল, 'কথাটা অবিশ্যি মন্দ নয়। কিন্তু কেমন করে রুইতে হবে ?'

'দাঁড়াও, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। হাত কয়েক দড়ি পাওয়া যাবে ?'

একজন মজুর একটা লম্বা দড়ি এনে দিল। অরবিন্দ জমির এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত দড়িটা টান করে বেঁধে দিল। এখন সহজ হয়ে গেল, ঠিক সারি পাওয়া যাচ্ছে।

সদয় দেখে বলল, 'ঠিক বটে ত!'

অরবিন্দ বলল, 'এবার রুয়ে যাও। দেখ, চারার গোড়ার এই এতটা যেন মাটির ভেতরে যায়। অরবিন্দ কয়েকটা চারা নিজেই রুয়ে দেখিয়ে দিল।'

মজুররা অরবিন্দের কাজ দেখে অবাক হচ্ছিল। একজন জিজ্ঞেস করল, 'আপনার দেশ কোথায় গো?'

সদয়ের বড় আনন্দ হল ছেলেটিকে দেখে। বয়স মাত্র বছর পঁচিশ। শ্যামল রং, ছিপছিপে। ভারি মিষ্টি মুখ।

সদয় ভাবছে, বেশ ছেলে। সরকারী চাকুরে বলে অহঙ্কার নেই। আগে যে বাবু ছিল, বাব্বা—সে যেন সাহেব! প্যাণ্ট জামা, হাতে ঘড়ি, মুখে সিগারেট!

'বাবা, তোমাদের খাবার নিয়ে এসেছি।'

একটি ষোল-সতের বছরের মেয়ে বাঁধের উপর খাবারটা রেখে দিয়ে বলল। বলেই নতুন লোক দেখে থমকে দাঁড়াল একটু!

সদয় বলল, 'মুড়ির সঙ্গে কি আছে রে?'

রেখা আস্তে আস্তে বলল, 'আখের গুড়।'

'তা, তুমি বাবা চাট্টি মুড়ি খাও না?' অরবিন্দকে বলল সদয়। 'তবে এখানে নয়, যাও বাবা রেখার সঙ্গে।'

গ্রামের সরু আঁকাবাঁকা রাস্তাটা দিয়ে, বেগুনের ক্ষেত ডাইনে রেখে, কোথাও সাদা শালুক ফুলে ভরা পুকুর বাঁয়ে রেখে অরবিন্দ রেখার সঙ্গে যাচ্ছিল। একটা বাঁশ বাগান ওরা পেরিয়ে গেল।

'তোমার বাড়ী কদ্দূরে?'

মুখ নিচু করে রেখা বলল 'এই এসে গেলাম।'

'আচ্ছা এটা কি গাছ?' একটা সোজা দীর্ঘ প্রকাণ্ড মোটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে অরবিন্দ জিজ্ঞেস করল। ঘন সবুজ পাতায় গাছটা ছেয়ে আছে।

অরবিন্দের অজ্ঞতা দেখে রেখা হাসি চাপতে পারল না। বলল, 'সে কি? আপনি এই গাছের নাম জানেন না?'

'না, জানলে আর তোমাকে জিজ্ঞেস করি?...তুমি হাসছ?'

'বাঃ, হাসলাম কোথায়? আচ্ছা, আপনার দেশটি কোথায় বলুন ত?'

অরবিন্দ জেলার নামটা বলল। বলেই রেখাকে জিজ্ঞেস করল, 'এরপর পিতার নাম, মশায়ের কি করা হয় ইত্যাদি জিজ্ঞেস করে বসবে না ত?'

রেখা এই সুন্দর দুষ্টুমিটুকুতে হেসে উঠে বলল, দরকার হলে করব বৈকি। তা শুনুন, এর মাম অর্জুন গাছ।'

'নাম কি করে জানব বল? এ গাছ আমার দেশে নেই।'

রেখা বলল, 'নেই? তবে কি গাছ আছে আপনার দেশে?'

'শাল, সেগুন, শিরীষ। তুমি শালবন দেখেছ?'

রেখা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'খুব সুন্দর বুঝি শালবন?'

'খুব সুন্দর। সেই ছোট ছোট পাহাড় শালবন আর ঢেউ খেলান মাঠ। ছবির মত সুন্দর। বনের ভেতর দিয়ে লাল মাটির রাস্তা চলে গেছে কত দূরে!'

রেখা থমকে দাঁড়াল। সে যেন সেই মাঠ শালবন আর ছোট ছোট পাহাড় দেখছে কোন অজানা গ্রামের ধারে দাঁড়িয়ে।

মুড়ি খেতে খেতে কথা হচ্ছিল। সদয় এসে গেছে।

অরবিন্দ বলল, 'রেখা স্কুলে যায় না?'

সদয় বলল, 'না, আগে স্কুলে পড়ত। আর এখন পডতে দিইনি। মেয়ে বড় হয়ে উঠছে।'

'সেই জন্যেই ত পড়ান উচিত।' অরবিন্দ বলল।

'পড়াশুনায় অবশ্য মেয়েটা ভাল ছিল, বাবু।'

রেখা একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, 'ক্লাশ এইট থেকে সেকেণ্ড হয়ে নাইনে উঠেছিলাম।'

অরবিন্দ অবাক হয়ে বলল, 'আপনি এই মেয়ের পড়া বন্ধ করে দিলেন?'

সদয় একটু চুপ করে থেকে বলল, 'পাড়ার লোকে দু'কথা বলে। কি করব বল ?'

'পাড়ার লোকে যদি বলে, এই জমিতে আপনি চাষ করবেন না, শুনবেন সে কথা ?'

'তা কি হয় বাবা, চাষ বন্ধ করতে নেই।'

'তেমনি পড়াও বন্ধ করতে নেই। ওটাও এক রকমের চাষ, জ্ঞানের চাষ। লেখাপড়া শিখলে কত জিনিস জানবে, কত দেশের কথা শুনবে। রেখাকে আবার ভর্তি করে দিন স্কুলে।'

সদয় চুপ করে রইল। কোন জবাব দিল না।

মাটির সরু রাস্তা। দু'পাশে বাঁশবন, মাঝে মাঝে নিম আর সজনে গাছ। রাস্তাটা পেরিয়ে সেদিন বিকেলে অরবিন্দ একটা ছোট্ট ঘরের উঠোনে এসে দাঁড়াল।

সামনের এ ছোট জমিতে বেগুন আর লঙ্কা চারা বসান হয়েছে। দূরে একটা প্রকাণ্ড আম গাছ শাখা-প্রশাখা মেলে উঠোনটাকে ছায়াচ্ছন্ন করে তুলেছিল। কবে কোন্ কালে এক পুষ্পবিলাসী একটি শিউলি ফুলের চারা এনে সেই উঠোনের একধারে লাগিয়েছিল। সেই চারা কবে বড় হয়েছে, প্রতিটি শরতের সকালে ঘাসে ও মাটিতে ঝরা ফুল বিছিয়ে রেখেছে। এই বর্ষায় সেই শিউলি গাছের পাতায় কোন সমারোহ আসেনি। শুধু শীর্ণ মৃতপ্রায় কয়েকটা শাখায় বিগত যৌবনের স্মৃতিচিহ্ন, বর্ষণ-প্রায় অপরাহ্ণে নিঃশব্দে জেগে আছে।

'ওস্তাদজী, ঘরে আছেন নাকি ?'

'কে ?' একটি বৃদ্ধ কাশতে কাশতে অন্ধকার ঘরের ভিতর থেকে জবাব দিলেন।

'আমি অরবিন্দ।'

লাঠি ঠুকতে ঠুকতে আস্তে আস্তে বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ। গৌরবর্ণ গায়ের চামড়া ঝুলে পড়েছে। মাথার চুল একেবারে ধবধবে সাদা। কিন্তু চুলগুলি দীর্ঘ। যৌবনকালে

ওস্তাদ মাথায় চুল রাখতেন। সারা শরীরে একটি প্রাচীন নির্জন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ যেন ছড়িয়ে আছে।

বৃদ্ধ বললেন, 'বস বাবা, বস।'

অরবিন্দ, খড় দিয়ে বোনা একটি আসনে বসে জিজ্ঞেস করল, 'শরীর কেমন আপনার?'

'ভাল নয়, ভাল নয় বাবা, কফ-কাশিতে বড্ড ভুগছি। হাত পা-গুলোও ফোলা ফোলা মনে হয়।'

'ভাল ওষুধ খান না।'

'খাচ্ছি, অসিত দিচ্ছে। কিন্তু ওতে কি শুনবে বাবা? যাবার সময় এসেছে, এ হল তারি আগাম ঘণ্টা। যাত্রা আরম্ভ হবার আগে যেমন কনসার্ট বাজে।' ওস্তাদ মহেন্দ্র অধিকারী তাঁর ক্ষীণ দৃষ্টি নিয়ে মৃতপ্রায় শিউলি গাছটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কথাগুলো বলছিলেন।

'কিন্তু ওস্তাদজী, আমি বলছিলাম কি, আপনি যাবার আগে কাউকে কিছু দিয়ে যান, আপনার এসব মহাবিদ্যা আপনি চলে গেলে সব ফুরিয়ে যাবে যে!'

ওস্তাদজী তেমনি গাছটার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'কাকে দিয়ে যাব, বাবা! ছেলে নেই, মেয়ে নেই, আর এসব জিনিস সবাইকে দেওয়া যায় না। তা তোমার মধ্যে লক্ষণ আছে, তোমার কপাল চোখ মুখ দেখলে বোঝা যায়। কিন্তু আমারও আর সময় নেই।'

'না না, আমার কথা আমি বলছি না।' অরবিন্দ বলল, 'আমার নেবার সাধ্য নেই, তা ছাড়া আমাদের সরকারী চাকরী করতে হয়, আজ এখানে, কাল সেখানে। আমি বলছিলাম, এই গ্রামের ছেলেরা যদি একটু আধটু চর্চা করে। সন্ধ্যেবেলা ক্ষেতের কাজটাজ শেষ করে যদি একটু বসে, তাহলে কেমন হয়? সব যে ওস্তাদ হবে এমন নয়, কিন্তু সকলে বসে একটু গান বাজনা করবে, একটু আড্ডা দেবে, ক্লাশ করবে—গ্রামে থাকতে হলে এগুলোও দরকার, নয় কি?'

ওস্তাদজী বললেন, 'গ্রামের দু'একটি ছেলে একটু শিখেছিল। অমর

বলে একটি ছেলে উঠেছিল ভাল। তা নানান কাজে থাকে। ওতে কি হয়, বাবা? এই আমার জীবনের কথাই ধর না, ঘর বাড়ী জমি জায়গা কোন কিছুর দিকে তাকাইনি। এই গান নিয়েই পড়ে রইলাম। স্ত্রী চলে গেল, এখন একা। এখন ভেবে দেখছি, কি পেলাম জীবনে? কোনদিন দারিদ্র্য ঘুচল না, একদিনও সুদিনের মুখ দেখলাম না। তা না ঘুচুক কিন্তু এত যে স্বর-সাধনা করলাম তবু ভগবানের স্বর কানে ত এল না বাবা, কই কোন সুর ত আমাকে তাঁর পায়ের কাছে পৌছে দিল না!'

শেষ অপরাহ্ণের ঘনিয়ে-আসা অন্ধকারে বসে ওস্তাদজী যেন কার চরণ ছুঁয়ে যাবার প্রতীক্ষা নিয়ে ঘাটের কাছে বসে আছেন!

একটু পরে ওস্তাদজী বললেন, 'নীলাপুর স্কুলে একটি মেয়ে সেদিন গান গাইছিল। কি গলার কাজ! বড় ভাল লাগছিল বাবা, বড় ভাল লাগছিল। নদীটার ধারে বটগাছের তলায় বসে বসে সেই গান শুনছিলাম। এমনি একটু ঠেকা দিয়ে দেখলাম, ও বাবা, তালে লয়ে একদম পাকা। মেয়েটি কোথাকার জান?'

'নীলাপুর গার্লস স্কুলের মিসট্রেস।'

'ওর গান একদিন শোনাতে পারবে? এই বুড়ো বয়সে বড্ড গান শুনতে ইচ্ছে করে। নিজের গলার সুর ত ফুরিয়ে আসছে।'

দূর থেকে সাইকেলের ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসছিল। সামনের সরু পথটা বেঁকে যাওয়ার জন্য গাছ-গাছালির আড়াল হয়েছে। আরোহীকে তাই দেখা যাচ্ছিল না। মুসলমানদের কবরখানার পাশ দিয়ে নদী-ধারের দিকে চলে যাওয়ার পথটা শুধু চোখে পড়ছিল।

শালুক ফুলে ভরা পুকুরটার লোনা মাটির পাড় দিয়ে অসিত আসছিল। ওস্তাদজীর বাড়ীর সামনে এসে অসিত সাইকেল থেকে নামল। তারপর উঠোনে সাইকেলটা রেখে একেবারে দাওয়ায় উঠে এল। বলল, 'কেমন আছেন, কাকা?'

'ভাল নেই, কফ-কাশি আদৌ সারছে না।' মহেন্দ্র অধিকারী বললেন।

অসিত ততক্ষণে স্টেথোস্কোপটা ওস্তাদজীর বুকে লাগিয়ে দিয়েছে: 'জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিন ত?...হুঁ, কফ আছে। ওষুধ খেয়েছিলেন?'

'খেয়েছি ত।'

অসিত একটু হেসে বলল, 'কেবল সুরের চর্চাই ত করেছেন। শরীরচর্চাও একটু আধটু করতে হয়।' আচ্ছা, আর একটা নতুন ওষুধ পাঠিয়ে দেব। ঠাণ্ডা জলে স্নানটা কয়েকদিন বন্ধ রাখুন।'

একটি ছেলে তিন কাপ চা দিয়ে গেল।

'আপনাকে নতুন দেখছি।' অসিত অরবিন্দের দিকে তাকিয়ে বলল।

'আমি এখানকার গ্রামসেবক—নমস্কার '

'নমস্কার। আপনি বেশিদিন আসেননি বোধহয়?'

'না। আপনার নাম খুব শুনছি, এ অঞ্চলে এসে।'

ওস্তাদজী বললেন, 'অসিত, তুমি বাবা নীলাপুরের স্কুলের সেই মেয়েটিকে জান, যে গান গায়?'

নন্দিতা? খুব ভাল করে জানি।'

'একদিন ওর গান শোনাবে?'

'আচ্ছা, একদিন শোনাব। নিয়েই আসব এখানে। ও ত আমার পেসেণ্ট। আমি এখন আসি। ওই মুসলমান পাড়ায় একটা রোগী আছে। দেখতে যাচ্ছিলাম। তাই আপনাকে দেখে গেলাম একবার।'

কয়েকটি আনন্দময় মুহূর্ত সঙ্গে করে নিয়ে অসিত আবার সেই পুকুর পাড় আর গাছ-গাছালির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। কথা বলতে বলতে কখন অন্ধকার হয়ে গেছে। সেই শিউলি গাছ বেগুন আর লঙ্কা গাছের ছোট ক্ষেতটা এখন আর ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। খঞ্জনী বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে একটি লোক নদী-ধার দিয়ে চলে গেল। দূর থেকে তার গানের ক্ষীণ সুরটা এখন এই অন্ধকারে ভেসে ভেসে আসছে।

অরবিন্দ বলল, 'আচ্ছা ওস্তাদজী, আপনার গুরু কে ছিলেন?'

'আমার গুরু ছিলেন পশ্চিমের এক ওস্তাদ। পঁচেটগড়ের নাম শুনেছ ত? শোননি? তুমি বেশিদিন আসনি এদেশে? সে ত শুধু একটা জায়গা নয়, সে যেন একটা তীর্থক্ষেত্রে। কত গুণীর পায়ের ধূলো পড়েছে সেখানে। কতবার যত্নভট্ট এসেছেন। একবার তাঁর নিজের হাতে লেখা একটি মূল্যবান গানের খাতা সেখানে ফেলে গেছলেন। এখনও সেটা আছে বোধহয়। তা, সেই পঁচেটগড়ের চৌধুরীরা পশ্চিম থেকে ওস্তাদ নিয়ে এসে দেশের ছেলেদের খাওয়া-পরা দিয়ে গান বাজনা শেখাতেন। সব রকম বাজনা শেখানর ব্যবস্থা ছিল—সেতার, স্বরোদ, এসরাজ, বেহালা, জলতরঙ্গ। অমন দুটি তীর্থক্ষেত্র এদেশে আর নেই। কিন্তু লোকে বুঝল না বাবা, সে সব। দেশ ভুলে গেল!'

তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ওস্তাদজী আবার বললেন, 'যাক, ওতে দুঃখ নেই। তা সেইখানেই গান শিখেছিলাম। ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর গুরুভাই ছিলেন যাদবেন্দ্র চৌধুরী।'

ওস্তাদজী, 'যাদবেন্দ্রবাবু' এই নামটি স্মরণ করে তাঁর উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে প্রণাম করলেন। বললেন, এই গুরুর পায়ের ধুলোর জোরে বাবা বুক ফুলিয়ে গান গেয়েছি। কোথাও গাইতে ভয় পাইনি। যত বড় আসর হোক না কেন? লোকে হাঁ করে থাকত, ওস্তাদ মহেন্দ্র অধিকারী কখন গান গাইবে!

'সেবার কি ব্যাপার হল শোন।' ওস্তাদজী হঠাৎ থামলেন। তারপর সেই ঘরের দাওয়ায় বসে জীবনের একটু ধূসর পরিচ্ছেদের পাতা খুলে ধরলেন। না, এখন যেন তার অক্ষরগুলো দেখা যাচ্ছে না, সব পর্দাগুলো যেন গলায় লাগছে না তার। অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে, মৃত্যুর মত ছায়াময় নির্জন, অস্পষ্ট অন্ধকার। সেই বিস্তীর্ণ অস্পষ্টতায় ওস্তাদ মহেন্দ্র অধিকারী যেন বড় কষ্টে একটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ধীরে ধীরে নিচু পর্দায় পড়ে যেতে লাগলেন।

॥ ১৫ ॥

—টিম টিম করে একটা হ্যারিকেনের আলো জ্বলছিল শুধু।

ওস্তাদজী বলে যাচ্ছিলেন, 'সেবাব ইসলামপুরেব চৌধুরীদের বিয়ে বাড়ীতে জলসা হচ্ছে। কলকাতা থেকে গাইয়ে বাজিয়ে এসেছেন, দেশের ওস্তাদরাও জড় হয়েছে। তখন চৌধুরীদের বাড়ীতে আমার যাতায়াত খুব, ছোটবাবু গান ভালবাসতেন। সব সময় বৈঠকে গোটা তিনেক তানপুবা, হারমোনিয়াম, পাখোয়াজ. তবলা সাজান থাকত। ফরাস পাতা থাকত সারা মেঝেতে। বাইরের ওস্তাদরা এলে, সেইখানেই গান হত।'

'বিয়ে বাড়ীর আসর অবশ্য সেদিন সেখানে বসেনি। কারণ বাড়ীর আত্মীয় স্বজন, চারপাশের গ্রামের লোক সব গান শুনবে—কলকাতা থেকে ওস্তাদ আসছে। আসর বসল নাটমন্দিবেব সামনের উঠোনে। উপরে রঙীন শামিয়ানা, সুন্দর কাজ করা। চারদিকে বড় বড় ডেলাইট। আসর ঝলমল করছে একেবারে। বাবুরা সিল্কের পাঞ্জাবি পরেছেন, আতর মেখে আর জর্দা দেওয়া সুগন্ধি পান খেয়ে খেয়ে আসরকে মাতিয়ে তুলেছেন।'

ওস্তাদ বললেন, 'আর একটু চা দিয়ে যাক্ বাবা, তোমাকে।'

অরবিন্দ বলল 'না না, চা থাক। আপনি বলুন।'

'তা আসর সুরু হতেই রাত প্রায় এগারটা হয়ে গেল। আমি, আমার তবলচী হীরু দাস, তানপুরা বাজাবার জন্যে একটা ছাত্র, সব আমরা একপাশে বসে আছি। কলকাতার গাইয়ে, তার বাহার কত! চালচলনে যেন কাউকেই মানুষ বলে গেরাহ্যি করে না।

'বাইরের গাইয়েদের আগে গাইতে দিতে হয়। তানপুরা বেঁধে নিয়ে ওদের একজন গান ধরলেন। 'দেশ' রাগ গাচ্ছে। গলাটা

একটু কর্কশ। ওই এক জিনিস বাবা, কেবল গান শিখলে হয় না গলা যদি সুরেলা না হয়, তবে সব ওস্তাদি মাটি।

'আমার কেন যেন আদৌ ভাল লাগছিল না। মনে হচ্ছিল রাগের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল না। গায়ক কেবল তান নিচ্ছেন, ফাঁকা তান। সুরের গভীরে যেতে পারছেন না। যাই হোক প্রায় একঘণ্টা পরে সেই গান থামল। ছোটবাবু বললেন—আর একটা হোক্।

'গায়কটি বললেন, তাহলে আপনারা কেউ তবলা বাজান। ইঙ্গিতটা হীরুর দিকে। হীরু আমার দিকে তাকাল। হীরু তবলাটা আবার বেঁধে নিল।

'তানপুবাও বাজতে স্বরু করল। আমার মনে হল, তানপুরাটা ঠিক বাঁধা নেই। চড়ার 'সা'টা একটু কম বলছে। গায়ককে বললাম—বোধহয় একটু নেমে গেছে সা'টা।

'আমার দিকে গায়কটি একবার তাকালেন। তা আমরা হলাম গাঁয়ের মানুষ, শহরের মানুষেব মত চকচকে নই। তাই বোধহয় গায়ক গ্রাহ্য করলেন না। অপমানটা গায়ে মেখে চুপ করে বসে রইলাম আমি।

'এবার বাগেশ্রী গাচ্ছে গায়ক। আলাপ চলছে ত চলছেই। দীর্ঘ আলাপের জন্যে একটু একটু গণ্ডগোল হচ্ছে আসরে। কতক্ষণ পরে গায়ক গৎ ধরলেন। কিন্তু গৎ ধরেই চালাকি আরম্ভ করলেন। হীরুর এই গেঁয়ো চেহারা দেখে, গায়কের কি রকম রোখ চেপে গেছে, হীরুকে অপদস্থ করবেনই।

'আমি নড়েচড়ে বসলাম। রাগে আমার গা জ্বলছিল। ছোটবাবু আমার মুখের দিকে তাকালেন। বুঝলাম, ছোটবাবু বলতে চাইছেন, দেশের মান রাখতে হবে, ওস্তাদ।'

অরবিন্দ একমনে শুনছিল।

ওস্তাদ বলে চলেছেন, 'ইঙ্গিতে হীরুকে চোরাই সমটা দেখিয়ে দিলাম। তবলাটা আর্তনাদ করে উঠল একবার। অনেক দরদ দিয়ে শিখিয়েছিলাম হীরুকে। হাতটাও ছিল ভাল। চাঁটি দিয়েই হীরু

ছুনে ধরল। খেলুক একটু গাইয়ে, অনেক খেলা ত আগে দেখিয়েছেন। কয়েক মিনিট, তারপর হীরু একটু লয় বাড়িয়ে ধরল চৌছুন। আঙুলগুলো আর দেখা যাচ্ছে না, কেবল শব্দ শুনছি, যেন রেসের ঘোড়া দৌড়ুচ্ছে পাহাড়ে রাস্তায়। গাইয়েকেই আমরা বাহবা দিচ্ছি—বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা ওস্তাদজী, করছি। এদিকে ওস্তাদজীর অবস্থা তখন কাহিল। হীরুর সঙ্গে লয় রেখে গাইবে, সে কি চাট্টিখানি কথা! সারা আসর থম থম করছে, কি হয়, কি হয়?

'কিছু সময় মাত্র। তারপর হঠাৎ গান থেমে গেল। কি হল? কি হল? এরি মধ্যে থামার ত কথা নয়! তান নেওয়াই হয়নি ভাল মত। এবার আর হাততালি পড়ল না। মুহূর্তে যেন একটা বিষণ্ণ সুর সারা আসরে ছড়িয়ে পড়ছিল।

'রাত ক্রমশ শেষের দিকে চলেছে। একটু শীত শীত করছে বাতাসে। সারা আসরের চোখে যেন একটা ঘুমের অলস মন্থর অনুভব। ওদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ছিলেন। উনি তানপুরোটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।'

অরবিন্দ জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি গাইলেন?'

'সেই আসরের দিকে চেয়ে একবার ভাবলাম, কি গাইব? রাত্রি শেষের বাতাসে করুণ সুর ভেসে আসছিল। 'চোখ বুজে ভৈরবীর ধ্যান করলাম। তারপর শুধু উদারার কোমল ধৈবত থেকে কোমল নিষাদের ওপর দিয়ে সুরে এসে দাঁড়ালাম।'

অরবিন্দের গায়ে রোমাঞ্চ হচ্ছিল। সে স্পর্শ পাচ্ছিল, একটি রাত্রি শেষের আসরের উপর দিয়ে ভৈরবীর আলাপের কান্নাগুলো, শিশিরের মত পথের ধুলায় কেমন নিঃশব্দে বিছিয়ে বিছিয়ে পড়েছে।

ওস্তাদ বললেন, 'সুরে ফিরে এলাম। এক সময় মনে হল, আমি নিজেই আমার জন্মের ভিটে ছেড়ে কোন দূর দেশে চলে গেছলাম। কত পথ, কত অচেনা নদী মাঠ শ্মশান কবরখানা পেরিয়ে আজ এইমাত্র নিজের এই ভাঙা ঘরে ফিরে এসেছি। এসে দেখলাম, যাবার ডাক

পড়েছে। আর ফিরে আসতে হবে না। সব আলাপ, বাঁট আর তান নেওয়া শেষ করে, সন্ধ্যেবেলা সমে ফিরে যাচ্ছি, ফিরে যাচ্ছি সুরে।'

॥ ১৭ ॥

সেদিন কলেজ থেকে ফিরে, অমল মলির চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে গেল। অমলকে মলি তাড়াতাড়ি বাড়ী যেতে বলেছে, তার খুব বিপদ। কিছু টাকাও দরকার। বিপদটা বাধিয়েছে নতুন বি. ডি. ও. রণজিৎবাবু। এমন স্টাফ-জ্বালান অফিসার নাকি মলি তার সারা জীবনে দেখেনি। খদ্দরের ধুতি আর সার্ট পরা এই তরুণ অফিসারটি বিচিত্র ধরনের। জীপের তোয়াক্কা করেন না। একটা সাইকেল নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান।

মলির রিপোর্ট পড়ে বড়বাবুকে তিনি সেদিন বলেছেন—মলি যেন তার সঙ্গে দেখা করে। মলি গতকাল বি. ডি. ও-র সঙ্গে দেখা করতে গেছল। রণজিৎবাবু মলির রিপোর্ট বের করে বলেছিলেন, 'বাংলা লিখতে জানেন? বাংলায় রিপোর্ট লিখবেন।' অত্যন্ত আস্তে আস্তে কথাগুলো বলছিলেন বি. ডি. ও.। কিন্তু প্রত্যেকটি কথা বজ্রের মত কঠিন মনে হচ্ছিল। বলছিলেন, 'গ্রামের কাজের জন্যে দিনে বার ঘণ্টা খাটার আপনার দরকার নেই। চার-পাঁচ ঘণ্টা কাজ করলেই চলবে। কিন্তু মনে রাখবেন, মিথ্যে রিপোর্ট লিখবেন না।'

পরের দিন বিকেলে, সেই দোতলার ঘরে অমলের সঙ্গে মলির কথা হচ্ছিল। মলি বলছিল, 'আমাকে চলে যেতে হবে, নইলে গ্রামের এই চেহারা দেখে বি. ডি. ও. আমার চাকরী খেয়ে নেবে। তখন কি হবে, অমলদা?'

'ছুটি নেবে বলছ যে?'

'নেব ত, কিন্তু হাতে কিছু নেই যে!'

'কত টাকা দরকার হবে তোমার?'

'গোটা পঞ্চাশ চাই অন্ততঃ।'

অমল আশ্বাস দিয়ে বলল, 'সে আমি সংগ্রহ করে দেব।' মলি সুন্দর করে অমলের দিকে তাকাল।

পরদিন ভোর হবার আগেই মলি চলে গেছে। কলকাতার শহরতলিতে মধ্যমগ্রামের দিকে কোথায় যেন মলির বাড়ি! ঠিকানা? ঠিকানাটা কি যেন? মলি অমলের খাতায় ঠিকানাটা লিখে রেখে গেছে বলেছিল।

অমল খাতাটা তন্ন তন্ন করে খুঁজল। না, ঠিকানা কোথাও নেই। মলি ঠিকানা লিখে যায়নি। তাতে কি? মলি গিয়েই চিঠি দেবে, আর টাকা পাঠাবে।

অমল অন্ততঃ সেই ক্ষীণ আশ্বাসটুকু স্মরণ করে এই সকালবেলায় বেশ খুশি হয়ে উঠল।

ওস্তাদজীর শরীর আদৌ ভাল যাচ্ছে না। তবু গ্রামের ছেলেদের আড্ডায় প্রতি সন্ধ্যায় এসে বসেন তিনি। অরবিন্দ আসে রোজ। ওস্তাদ তাঁর সেই জীর্ণ শরীরটা নিয়ে একধারে ঝিমিয়ে বসে থাকেন। হ্যারিকেনের আলোয় লম্বা, সাদা চুলগুলো আর ছায়াটা দেয়ালে একটা মৌন ছবি আঁকে শুধু।

কোনদিন বলেন, 'সুরটা দে। না না, 'সি' সাফ না, 'বি'তেই দে। হ্যাঁ, আচ্ছা খাদের শুদ্ধ নিষাদ, সুর, শুদ্ধ গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, চড়ার সুর।' ওস্তাদ আবার ঝিমতে থাকেন।

তারপর আবার কখন খাদের নিষাদে, ভরাট গলাটা বেজে ওঠে। সুর পেরিয়ে শুদ্ধ গান্ধারে এসে দাঁড়ান তিনি। গলাটা একটুও কাঁপে না, সমান ওজনে দাঁড়িয়ে থাকে। ধীরে ধীরে সেই আড্ডার অস্পষ্ট আলোয়, চারদিকে বাঁশঝাড, আমবাগান আর মরা নদীর ছায়াচ্ছন্নতায় একটি বেহাগের জন্ম হয়।

রাত ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। ওপাশের ঝোপ থেকে ঝিঁঝিঁর একটানা সুর এসে রাত্রিটাকে ক্রমশঃ দূরতর করে তোলে।

সেদিন অসিতের চিঠিটা নমিতাকে দিয়ে অরবিন্দ দাঁড়িয়ে ছিল।

চিঠিটা পড়ে নমিতা বলল, 'কতদূর যেতে হবে?'

'বেশী নয় মাইল দুই, নদীর ধার দিয়েই রাস্তা।'

অরবিন্দ সাইকেল নিয়ে চলে গেল।

নন্দিতা কথাটা শুনে ভয় পাচ্ছিল। ওস্তাদজীর অবস্থা খারাপ। তাঁকে নন্দিতার গান শোনাবেন বলে অসিতদা কথা দিয়েছিলেন। তাই তাদেব এক্ষুনি যাবার জন্য চিঠি লিখেছেন।

নন্দিতা বলল, 'উনি কত বড ওস্তাদ ছিলেন, ওঁকে আমি গান শোনাব! তাছাড়া গলা ঠিক নেই।'

উমা বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোব গলা আবাব কবে ঠিক ছিল? নে, হয়েছে চল।'

মরা নদীটার ধার দিয়ে, সেই বাবলা বনটা পেরিয়ে ওরা তিনজন দ্রুত চলছিল। নদী-ধারেব শ্মশান, শিরীষগাছগুলো আর আমবাগান পেরিয়ে পুকুরের পাড় দিয়ে ওরা এসে পৌঁছল ওস্তাদজীর বাড়ীতে।

নমিতা অসিতকে জিজ্ঞেস করল, 'কোন আশা নেই?'

অসিত শান্ত গলায় বলল, 'আমি ওঁকে শান্তিতে যেতে দিতে চাই।'

অসিতের কথা শুনে ওস্তাদজী বিবর্ণ চোখ মেলে নন্দিতার দিকে তাকিয়ে আবাব চোখ বুজলেন। আর নন্দিতা দেখল—এই সেই ওস্তাদ! বিছানায় শুয়ে আছেন যেন একরাশ শ্বেতপদ্ম!

নন্দিতা কি রকম মন্ত্রমুগ্ধের মত তক্তপোশের নিচে মাটিতে বসে পড়ল। চারদিকে লোকজন ভীড় করে এসেছে।

অসিত, নমিতাদি, উমা সকলে বিছানা ঘিবে আছে। একধারে কেরোসিনের বাতিটা জ্বলছে শুধু।

নন্দিতা আর ভাবতে পারছে না। এই মৃত্যু উৎসবে তার গান গাইতে কান্না পাচ্ছে।

সুর কানে যেতেই ওস্তাদজী আবার তাকালেন, দেখলেন নন্দিতাকে। নন্দিতা ভজন গাইছে।

ঘবেব আবহাওয়াটা ক্রমশঃ করুণ হয়ে উঠছিল।

ওস্তাদজী আবছা আলোয় উপরেব দিকে ছুটি হাত তুলে ধরলেন। ছ'চোখে অর্থহীন ভাব তখন স্থিব হয়ে আসছে।

সারা পৃথিবী ধূসর হয়ে উঠছে। কেবল নন্দিতা মাথা নিচু কবে গাইছে—'মত জা, মত জা।'

কী আনন্দ ওস্তাদজীর। তিনি গান শুনতে শুনতে চলে যাচ্ছেন। হঠাৎ গান থেমে গেল। যোগী চলে গেছেন। এই পৃথিবী থেকে অনেক দূরে, এই রাত্রির জগৎ পার হয়ে, অন্য কোন আলোকিত জগতেব দিকে।

ধীবে ধীরে ঘরের চারপাশে কালো অন্ধকাবগুলো ভীড কবে এল। মরা নদীব তীবে বাবলা বনে দূবেব মাঠে রাত্রি নিবিড হচ্ছে ক্রমশঃ। কবরখানাটা আর দেখা যাচ্ছে না। শুধু সেই অন্ধকাবে সামনের বেগুন আর লঙ্কা ক্ষেতের এক ধাবে শীর্ণ শিউলি গাছটা দেখা যাচ্ছে।

আশ্চর্য! আজ শেষ ঋতুর দিনে, সেই গাছটায় কি করে কয়েকটা ফুল ফুটেছে!

যে মানুষটি একদিন গাছটি লাগিয়েছিল, আজ তার চলে যাবাব দিনে হয়ত তাব উদ্দেশে—শেষ নিবেদনের জন্য।

মৃত্যুব মধ্যে কোথায় একটা মাদকতা আছে। সে মাদকতা, যে বাডীর লোক মরে শুধু সে-বাডীর নয়, তার চাবপাশের মানুষকে কেমন যেন আচ্ছন্ন করে তোলে। সে মাদকতা ঠিক ছঃখ নয়, বেদনা নয়, বোধ হয় শূন্যতাবোধ। একটি লোক ছিল তাদের মধ্যে; ভোরে, সন্ধ্যায়, বা বিকালে যাকে উঠানে বা ঘবের দাওয়ায় মাছুর পেতে বসে থাকতে দেখা যেত, সে লোকটি নেই। অথচ আর সব আছে, গাছ-পালা মাঠ ছোট্ট তরকারির ক্ষেত, ঘর তানপুরা—সব। শুধু যে জীবনকে ঘিরে এই মৌন পার্থিব বস্তুর সমাবেশ, সেই জীবনটি হারিয়ে গেছে!

ওস্তাদের বাড়ীর সেই মৃত্যু-আচ্ছন্ন খড়ের ঘরের দাওয়ায় অসিত,

নমিতা, উমা, নন্দিতা সব চুপ করে বসে ছিল। অরবিন্দ শবদেহ সংকারের আয়োজন করতে গেছে। দূরে নদীর ধার থেকে এই রাত্রিতে গাছ কাটার শব্দ ভেসে আসছে। রেখা বাড়ী গিয়েছিল। বড়দিদিমণি, উমাদিরা আসছেন শুনে সেও ছোট ভাইকে নিয়ে ওস্তাদের বাড়ীতে চলে এসেছে। পাড়ার সব লোক, বৌঝিরাও এসেছে ওস্তাদকে শেষবার দেখতে।

অদূরে কয়েকজন লোক জটলা করছে। শব সংকারের অনেক আয়োজন। বাঁশ কেটে নিয়ে এসে ছোট করে কেটে খাটিয়া তৈরী হচ্ছে। শুকনো কাঠ পাটকাঠি সংগ্রহ চলছে। কীর্তনিয়া ডাকতে লোক গেছে।

এই সব আয়োজনেব মধ্যে নদীধারের কাঠ কাটার শব্দটা. এই আচ্ছন্ন রাত্রিটাকে কেমন যেন ভয়ঙ্কব বিষণ্ণ করে তুলছিল!

নমিতা এই বিষণ্ণতার মধ্যে অসিতকে বড় কাছে পেল একটি অব্যক্ত বেদনা দুটি মানুষকে অনেক কাছে এনে দিয়েছে। এত কাছে যেন তাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায়। যে অসিত অনেক দূরের, এই মৃত্যুর দৃশ্যপট সে দূরত্বকে আজ সীমিত করে তুলছে।

নমিতা এতক্ষণে আস্তে আস্তে বলল, 'অবস্থা কখন থেকে খারাপ হচ্ছিল?'

'বিকেল থেকে। আমি এসে অবশ্য কিছু করিনি। মহেন্দ্রকাকা গান শুনতে চেয়েছিলেন আমি সেইটুকুই করেছি।'

নন্দিতা একপাশে চুপ করে বসেছিল। অসিত তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি? মনটা খুব খারাপ লাগছে?'

'কেমন লাগছে ঠিক বলতে পারছি না অসিতদা। মনে হচ্ছে, যিনি গান শুনতে শুনতে গেলেন—কি ভাগ্য নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন!'

ওস্তাদজী সর্বরিক্ত সৌভাগ্য নিয়েই জন্মেছিলেন। কিছু নেই তাঁর। শুধু এই কয়েক কাঠা বাস্তু ভিটে আর এই ছোট্ট খড়ের ঘরটা।

তবু এই ছোট ঘরটা কোন বর্ষণ রাত্রে রাজপ্রাসাদ হয়ে উঠত,

যখন ওস্তাদের সেই ভরাট গলায় দরবারী কানাড়ার বা মালকোশের আলাপ জমে উঠত, কি আরও শেষ প্রহরের দিকে আড়ানার।

সমস্ত সম্পদ হারিয়ে ওস্তাদজী সব সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন।

আয়োজন শেষ হয়ে আসছিল। হঠাৎ স্বদেশবাবু উঠানে এসে দাঁড়ালেন। নমিতা, উমা, নন্দিতা এগিয়ে গেল তাঁর কাছে।

স্বদেশবাবু ধীরে ধীরে বললেন, 'তোমরা সবাই এসে গেছ দেখছি—!' বলতে বলতে তিনি ঘরের ভিতরে গেলেন, একবার খাটের উপর শোয়ানো মহেন্দ্রকে দেখলেন, আবছা আলোয় সেই শুভ্র জীর্ণ শরীরটা একমাথা পাকা সাদা চুল নিয়ে চোখ বুজে নিথর হয়ে পড়ে আছে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ তিনি। তারপর তেমনি নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

'মহেন্দ্র আমার ছোট, তবু সে আগে চলে গেল—' কথাগুলো স্বদেশবাবু আস্তে আস্তে বললেন। কিন্তু কাকে বললেন বোঝা গেল না। হয়ত কাউকেই নয়!

নদী ধার থেকে কাঠ কাটার শব্দটা আর আসছে না।

রেখা কোত্থেকে চার কাপ চা নিয়ে এল।

অরবিন্দ এতক্ষণ শবদাহের আয়োজনের জন্য ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল। রেখা চায়ের কাপটা তার হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, 'ইস্, ঘেমে উঠেছেন একেবারে!'

অরবিন্দ কোমরের গামছা দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, 'জান? ওস্তাদজী আমাকে খুব ভালোবাসতেন। কত গল্প করতাম দু'জনে এই দাওয়ায় বসে। সে গল্প আর হবে না!'

রেখা অরবিন্দের ক্লান্ত বিষণ্ণ সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

এই শব সৎকারের আয়োজনের মধ্যে অসিত অপ্রয়োজনীয়।

মৃত্যু পর্যন্ত তার দায়িত্ব আছে। শেষ নিঃশ্বাস থাকা পর্যন্ত তাকে লড়তে হয়। তারপর তার কোন কাজ নেই। কত রোগীর বাড়ী থেকে সে লুকিয়ে চলে এসেছে, পাছে তাকে টাকা নিতে হয়। রোগীর বাড়ীর সকলে যখন কাঁদছে, তখন ডাক্তারদের কাবুলিওয়ালার মত টাকার জন্য বসে থাকাটাকে, অসিত বড় নিষ্ঠুরতা বলে মনে করে।

কিন্তু মহেন্দ্র কাকা কেবল রোগী নয়—সে রাগিনা, যার গলায় কত বিচিত্র সুর বেজে উঠত! তাই অসিত কিছুতেই যেতে পারছিল না।

অরবিন্দ এবং আরও অনেকে মিলে শবদেহ ঘর থেকে বের করে নিয়ে এল।

যে কয়েকটা শিউলি ফুল বেগুন ক্ষেতটার একধারে পড়েছিল, উমা সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে এসে শবদেহের উপর ছড়িয়ে দিয়েছে কখন।

অসিত খাটিয়ায় কাঁধ দিতে যাচ্ছিল। নন্দিতা বাধা দিয়ে বলল, 'সেই বিকেল থেকে আছেন, ক্লান্ত লাগছে আপনাকে। নাই বা কাঁধ দিলেন।'

অসিত কথাটা মেনে নিল—তা ছাড়া সে আদৌ অভ্যস্ত নয়।

অন্ধকার রাত্রির আকাশটা ভরে উঠল 'বল, হরি, হরি বোল" শব্দে।

বহুদিনের বহু স্মৃতির, বহু বেদনার গান যে ঘরের ছায়ায় বেজেছিল, ওস্তাদ সেই ঘর থেকে শেষবারের মত চলে গেলেন।

শব যাত্রীরা শবদেহ কাঁধে নিয়ে উঠান পেরিয়ে নদীধারের দিকে চলতে লাগল।

খড় দিয়ে তৈরী মশালের আলোয় দুপাশের বাঁশবন পুকুর নিমগাছ সজনে গাছ কিছুক্ষণের জন্য আলোকিত হয়ে উঠছে।

পেছনে কীর্তনিয়ার দল চলছে। খোল করতাল বাজছে। তার শব্দে, দূরের মাঠের বুকে ঘুমিয়ে-থাকা বিরাট আকাশের নির্জনতা বার বার ভেঙে যাচ্ছে।

'চলুন আমাদের সঙ্গে—আর থেকে কি করবেন?' নমিতা অসিতকে বলল।

অসিত আস্তে আস্তে ভাঙা গলায় বলল, 'হ্যাঁ এবার চলে যাব। নন্দিতা, নন্দিতা কোথায়?'

নন্দিতা কখন ঘরের ভেতরে গেছল। উমা খুঁজতে গিয়ে অবাক। নন্দিতা ওস্তাদের তানপুরাটার কাছে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তানপুরাটার সুরের তারটা ছেঁড়া।

এ তানপুরায় ওস্তাদ আর কখনো কোন সুর বাঁধবেন না।

॥ ১৮ ॥

মরা নদীর তীর ছেড়ে অরবিন্দ গ্রামের মধ্যে ঢুকল। অফিস থেকে বাসায় ফিরছিল সে। গ্রামের আঁকা বাঁকা পথগুলো এখন আর তার অচেনা নয়। সেই প্রকাণ্ড 'অজনি' গাছটা চোখে পড়ল অরবিন্দের। গাছটা দেখলে রেখার কথা কেমন করে মনে আসে। কেন যেন ভালো লাগে। সে ভালোলাগাটা কাউকে বলা যায় না। গোপন ভালোবাসার মত শুধু মনের মধ্যে অজানা গন্ধ ছড়ায়।

যেতে যেতে সেই জমিটা দেখতে পেল অরবিন্দ, যে জমিটায় সে কিছু চারা রুয়েছিল। এখন খুব সুন্দর ধান হয়েছে, পাশের অন্য জমিগুলোর চাইতে অনেক ভাল। সতেজ সবুজ পাতাগুলো দেখতে দেখতে চোখ তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। অরবিন্দ দাঁড়িয়ে রইল জমিটার ধারে। এই ক্ষেত এই ধান তাকে টানছে; ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না তার। কী করে যেন এই ক্ষেতের সঙ্গে, একটি স্নিগ্ধ কুমারীর নীরব ভালোবাসার স্মৃতি এক হয়ে মিশে গেছে তার কাছে

জমিটা রেখার বাবার।

'নমস্কার বাবু।'

অরবিন্দ চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখল, রেখার বাবা সদয় দাস তার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে।

'ও, আপনি কখন এলেন ?'

'এই আসছি, বাবু। এসে দেখি, আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জমি দেখছেন।'

'এই জমিতে আমি ধান চারা রুয়েছিলাম আর সেই জাপানী প্রথায় চাষটা দেখিয়ে দিয়েছিলাম, মনে আছে ? তাই যেতে যেতে ভাবলাম চাষটা কেমন হয়েছে একবার দেখে যাই।'

সদয় জমির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ধান খুব ভাল হয়েছে। আমি রোজ দেখি। শালার ধানগুলা মরবে, মরবে বলেই এত বাড়ন্ত হয়েছে।'

অরবিন্দ বলল, 'না না মরবে কেন ?'

'মরবে না ? বাবু, ধানের অনেক বিপদ। পোকা লাগতে পারে।'

'পোকা ? পোকা লাগলেই আমাকে বলবেন। এক রকম পাউডার পাওয়া যায়, তা দেব। ছড়িয়ে দেবেন। তাতেও না গেলে সদর থেকে লোক আনিয়ে ওষুধ স্প্রে করাবো।'

'সে আবার কি ?' সদয় জিজ্ঞেস করল।

'একদল লোক আছে তারা ওষুধ ছড়ায়, এই হোলির দিনে রং ছড়ানোর মত। ওতে পোকা মরবেই।'

'পোকা না হয় মরল, কিন্তু বন্যা ? বন্যা যদি হয়, কেলেঘাইর বন্যা। সে আপনি দেখেননি। সব ধান পচে সাফ হয়ে যাবে, পুকুরের মাছ পালাবে, মাটির ঘর পড়ে যাবে, গাছপালা সব মরে দেশ শ্মশান হয়ে যাবে।'

অরবিন্দ বলল, 'বন্যা হলে অবশ্য করার কি আছে। তবে দেশে যাতে বন্যা না হয়, তার জন্য অনেক কাজ চলছে।'

সদয় বলল, 'চলছে ! চলুক। বন্যা অবশ্য অনেক দিন হয়নি। এ অঞ্চলের দুজন কংগ্রেস নেতা সেবার খুব জোর লড়াই করলেন সরকারের সঙ্গে। তা, এ এক ঝামেলার ব্যাপার। নদীর বাঁধ দু দলের,

এক হল সরকারের বাঁধ, আর এক হল জমিদারের বাঁধ। আবার জমিদারের বাঁধ, সরকারের বাঁধ থেকে নিচু করে রাখতেই হবে। সেবার কুঞ্জবাবু বলে দিলেন মিটিঙে, সরকার যা করতে পারে করুক। বন্যা হলেই সব বাঁধ আমরা কেটে দেব, জল একেবারে সমুদ্রে গিয়ে পড়ুক। কোন বাঁধে যেন জল না আটকায়।'

একজন লোক বলে উঠল, 'সরকারের বাঁধে যে বন্দুক হাতে পুলিস থাকে গো!'

কুঞ্জবাবু বললেন, 'ঐ বন্দুকের ভয়টি আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে। আমরাই আগে বন্দুকের সামনে যাব, আপনারা শুধু কোদাল নিয়ে পেছনে থাকবেন। এই হাজার হাজার বিঘার জমির ধান পচে নষ্ট হয়ে যাবে, ঘর বাড়ী পড়ে যাবে, লোকে না খেয়ে মরবে, ম্যালেরিয়া কলেরায় দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে, এ আমরা আর সহ্য করব না। তার জন্য যা হয় হোক, যে বিপদ আসে আসুক। সব বিপদ আমরা কংগ্রেস কর্মীরাই মাথা পেতে নেব।'

অরবিন্দ এতক্ষণে জিজ্ঞেস করল, 'তা আর বন্যা হয়নি?'

'বন্যা একবার হয়েছিল বটে, তবে এদিকে নয়।' সদয় বলল 'চলুন, বলতে বলতে যাই। আপনার কাজ নেই ত?'

'না না, আপনি বলুন, এখন আমার কাজ নেই, অফিস থেকে এলাম।'

সদয় বলতে বলতে বাড়ীর দিকে এগুতে লাগল। 'বন্যা হয়েছিল সেই ১৯৪২ সালে সপ্তমী পূজার দিন রাত্রে। সাইক্লোন। সমুদ্রের বাঁধ ভেঙ্গে গ্রামের পর গ্রাম সাফ করে দিল! এক রাতের মধ্যে কাঁথি আর রামনগরের সমুদ্র-ধারের গ্রামের লোক গরু বাছুর সব মরে ভেসে গেল। ভোরে দেখলে মনে হবে না যে, সেখানে মানুষ-জন ঘরবাড়ী কোনদিন ছিল। কেবল মড়াগুলো বাঁধের পাশে এসে জমেছে। দু একটা বড় বড় গাছ দাঁড়িয়ে আছে শুধু, আদৌ পাতা নেই। আর সেইসব গাছে দু একজন করে লোক। সব শ্মশান হয়ে গেছল। হায়, সে সব কী দিন গেছে!'

অরবিন্দ তখন ছোট। তবু ১৯৪২ সালের কাঁথির সাইক্লোনের কথা মনে আছে তার। মহাপ্রলয় হয়েছিল। অরবিন্দ শুনেছিল, সেই সময় শ্যামাপ্রসাদ কাঁথি এসেছিলেন। বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে জেলার কংগ্রেস নেতারা, কর্মীরা সব জেলে। এই চরম দুর্দিনে হঠাৎ শ্যামাপ্রসাদ এসে পৌঁছলেন কাঁথিতে। কোর্টের খুব উঁচু ছাদটার উপর দাঁড়িয়ে দক্ষিণ দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন শ্যামাপ্রাসাদ। দক্ষিণ দিকেই সমুদ্র। তাকিয়ে দেখলেন কেবল জল; লোকালয়ের চিহ্নহীন জলপ্লাবিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর। সব, সব যেন সমুদ্র হয়ে গেছে। মানুষ আর গরুবাছুরের মৃতদেহ স্তূপীকৃত হয়ে উঠছে বালিয়াড়ির ধারে। শকুন উড়ছে, পচা গন্ধ আসছে মৃতদেহের।

মৃত্যু-বিস্তীর্ণ ধ্বংস স্তূপের পাশে এসে দাঁড়ালেন শ্যামাপ্রসাদ। কোর্টের সেই উঁচু ছাদটার উপর থেকে দূর সমুদ্রের ধ্বংসলীলার দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখে জল এসেছিল সেদিন। শুধু এক মুহূর্ত। তারপর গর্জন করে উঠলেন শ্যামাপ্রসাদ, প্রচণ্ড ভরাট গলায় ইংরাজীতে বলে উঠলেন এস. ডি. ও.-কে, 'সকাল থেকে ভীষণ ঝড় শুরু হয়েছিল, রাত্রে প্রলয় হয়। তখন আপনি কোথায় ছিলেন? কোথায় ছিল আপনার পুলিস ফোর্স। আজ পর্যন্ত কেন এক মুঠো রিলিফ দেওয়া হয় নি? কেন একজন লোককেও উদ্ধার করা হয় নি? কেন? কেন?'

গলাটা শুকিয়ে উঠেছিল এস. ডি. ও.র।

'আই নো, আই নো ইট'—আবার ব্যাঘ্র শাবক গর্জন করে উঠেছিলেন। সেই প্রলয় ঝড়ের রাত্রিটা এস. ডি. ও. নাকি কেবল মদ খেয়েই কাটিয়ে দিয়েছে। মানবতার নামে একটি প্রাণও রক্ষার চেষ্টা করেনি। ভোরের সেই শ্মশানে শুধু এগিয়ে এসেছিল আমেরিকান সৈন্যেরা। তাদের যা কিছু খাবার ছিল, শহরের বালিয়াড়ির উপর জমায়েৎ হওয়া লোকের মধ্যে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছিল তারা। বড় বড় গাছ পড়ে শহরের পথ ঘাট বন্ধ হয়ে

গেছল। ডিনামাইট দিয়ে গাছগুলো সরিয়ে আমেরিকান সৈন্যেরাই আবার রাস্তাটাকে যাতায়াতযোগ্য করেছিল। ক্যানেলের বাঁধটা ভেঙ্গে গেছল। তারাই বাঁধল সেই বাঁধটা।

টেলিগ্রাম ভেসে এসেছিল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডি. এম. খাঁন সাহেবের কাছ থেকে। একটি নিষ্ঠুর টেলিগ্রাম—ইংরাজ সভ্যতাব একটা কলঙ্কিত দলিল, 'মিড্‌নাপুর ইজ দি প্লেস অব রেবেল্‌স—লেট দেম ডাই।'

মরুক, মরুক ওরা ওরা সরকারকে বড্ড জ্বালায়। ওরা থানা ভাঙে, পুল ভাঙে, পোস্টাফিস পুড়িয়ে দেয়, থানা পুড়িয়ে দেয়, সরকারী অফিসারকে বন্দী করে রাখে। ওরা স্বাধীনতা চায়। বৃটিশ সরকার বেঁচে থাকতে থাকতে ওরা নিজেদের সরকার তৈরি করে। এতবড় স্পর্ধা সারা ভারতবর্ষের কোন জেলার হয়নি। ঝড় হয়েছে, দুর্ভিক্ষ হবে, মহামারী হবে, ইংরাজ সরকারের কিছু করার নাই; ওরা মরুক, মরুক, 'লেট দেম ডাই'।

অরবিন্দ নিজের মনে ভাবতে ভাবতে সদয়ের সঙ্গে উঠানে পৌঁছেছে কখন।

বাবা আর অরবিন্দদাকে আসতে দেখে, রেখা দাওয়ায় একটা মাদুর পেতে দিল।

অনেক দিন পরে রেখাকে দেখে ভাল লাগছে অরবিন্দের। এই ক'দিনে যেন সে আরও মার্জিত সুন্দর হয়েছে। নতুন ধাঁচে বিনুনি করে তার কালো দীর্ঘ চুলগুলো বেঁধেছে। রেখার মধ্যে আগে যে জড়তাটুকু ছিল, নীলাপুর গার্লস স্কুলে আবার ভর্তি হবার পর এখন আর তা নেই।

রেখা অরবিন্দকে বলল, 'কি খাবেন? চা না সরবৎ?'

সদয় বলে উঠল, 'আরে, আগে পা ধুতে জল দে। কদ্দুর থেকে এলেন?'

অরবিন্দ চমকে উঠল, 'না, না, জল লাগবে না।' তারপর রেখার দিকে তাকিয়ে বলল, 'পুকুর ঘাটটা কোথায় তাই দেখিয়ে দাও না।'

'ঘাটটা ভাল না, বড্ড পিছল। তার চেয়ে আমি জল এনে দিচ্ছি।'

এক বালতি জল এনে রেখা দাওয়ায় একটা চৌকি পেতে দিল। একটা পরিষ্কার গামছা এনে রাখল তার উপর।

অরবিন্দ কেবল অবাক হয়ে দেখছিল। এ এক অপূর্ব আতিথেয়তা এ অঞ্চলের। অতিথিকে পা ধোবার জল দিয়ে তাকে যেন দেবতার মত পূজা করে এরা। অরবিন্দ খুব সংকোচের সঙ্গে চৌকিতে গিয়ে বসল।

কিন্তু বিপদ হল যুগপৎ এক হাতে জল ঢালা আর এক হাতে পা ধোয়া নিয়ে এ এক কঠিন 'জিমন্যাসটিক্'। রেখা হাসতে হাসতে এগিয়ে এল, 'দিন্, জলটা আমি ঢেলে দিচ্ছি। বাবা, পা ধুতে গিয়েই ঘেমে সারা!'

অরবিন্দ হাঁফ ছেড়ে বলল, 'হবে না? তোমাদের এইভাবে পা ধোয়া যা, আর সার্কাসে দড়ির ওপর খেলা দেখানও তা।'

রেখা হাসতে হাসতে গামছাটা এগিয়ে দিল, 'নিন পা'টা মুছে ফেলুন।'

রেখা দুটো বাটিতে করে মুড়ি, দুধ আর কলা রেখে গেল।

অরবিন্দ খাবার ব্যবস্থা দেখে অবাক, 'এত খেতে হবে?'

সদয় বাটিটা তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে তাতে কলাগুলো মাখতে মাখতে বলল, 'এই চাট্টি মুড়ি খেতে এত ভয়? এখন জোয়ান বয়স। নিন বাবু, শুরু করুন।'

অরবিন্দ রেখাকে বলল, 'নাও, কিছু তুলে নাও।'

'না, নিতে হবে না,' রেখা ধমক দিয়ে উঠল, 'সারাদিনের পর এলেন, আর এই কটা মুড়ি খেতে পারবেন না।'

এই স্পর্শটুকু অরবিন্দের বড় ভাল লাগল। তার বিদেশের চাকুরী জীবনে সেখানে ভাই বোনের কোন স্নেহ নেই, সেখানে রেখার এই অযাচিত স্পর্শটুকু অরবিন্দকে মুগ্ধ করে তুলল।

এক সময় অরবিন্দ বলল, 'সে-ই বন্যার গল্প বলছিলেন না?'

সদয় অবশ্য বলতে পারলে বেঁচে যায়। খেতে খেতে সে আবার শুরু করল, 'তা সে সাইক্লোনে সাগর ধারের প্রায় সব শেষ হয়ে গেল। দীঘার কাছে একদল সৈন্য ছিল। কিন্তু এখন তার চিহ্নমাত্র নাই। সব সাফ। শহর থেকে সৈন্যেরা জল ভেঙে ছুটল তাদেব কাছে। কিন্তু কোথায কে ? সব ভাসিয়ে নিয়ে বালিয়াড়িতে ঠেকিয়েছে। খুঁজতে খুঁজতে তাদেব কয়েকটা মৃতদেহ পাওয়া গেল। তারপর যেখানটায় তাঁবু ছিল তাব কিছুদূরে বালি সবিযে কবর খুঁড়ল তারা। খুঁড়ে তার ভেতর মড়াগুলো ফেলে দিল, দিয়ে আবাব বালি চাপা দিল। আব সেই কববের ওপর কিগুলো পুঁতে দিল।'

অরবিন্দ বলল, 'ও, ক্রুশ খাড়া করে দিল।'

'হবে, হযত। এখনো গেলে সেইগুলো সমুদ্রের ধাবে আপনি দেখতে পাবেন।'

অরবিন্দ বলে উঠল, 'আপনি কতগুলো বন্যা দেখেছেন ?'

সদয একটু ভেবে নিযে বলল, 'তা দু তিনটে বন্যা দেখেছি। কেলেঘাইর বন্যা, বারচৌকা জলার বন্যা আর আপজলে বন্যা। জল নিকাশী না থাকলে, বেশী বৃষ্টিব জল বেরতে না পেবে যে বন্যা হয তাকে বলে আপজলে বন্যা। তা বন্যা হলে বড দুঃখ লোকেব। এই মাঠ ঘাট তখন জলে জলময়। দেখলে গাঙ বলে মনে হবে। এখান থেকে মঙ্গলামাড়োর হাট যাবেন ? যান, সোজা নৌকায় চলে যান।'

সদয একটু থেমে আবাব বলতে আরম্ভ করল, 'বন্যা হলে কিন্তু অনেক ঘটনা ঘটে। সেবার বারচৌকার জলার বন্যায় অনেকগুলো মাথা গেল।'

অববিন্দ চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল 'মাথা গেল ? মানে খুন হল ? কিন্তু খুন হল কেন ?'

'খুন হল বারচৌকার বাঁধ কাটানো নিয়ে। জলার ভেতরেও গ্রাম ঘরবাড়ী আছে লোকেব। চাষ বাস হয়। জল বেশী হলেই আগে

সেখানকার সব ডুবে যায়। সারা জলাটি তখন সমুদ্রের মত থৈ থৈ করে। লোকের ঘরবাড়ী সব পড়ে যেতে আরম্ভ করে। তখন তারা সব দল বেঁধে নৌকা করে বাঁধ কাটতে আসে। বাঁধ কেটে দিলেই জল বেরিয়ে এদিকে বন্যা হয়, তখন ওরা বাঁচে। সে এক লড়াইর ব্যাপার।'

সদয়ের মুড়ি খাওয়া শেষ হয়ে গেছল। একটি ছেলে এসে তামাক দিয়ে গেল।

উঠান এতক্ষণে অন্ধকারে ঢেকে গেছে।

সদয় আবার বলতে আরম্ভ করল, 'সে তখন লড়াইর ব্যাপার। গ্রামের সব জোয়ান ছোকরাকে রাত জেগে বাঁধ পাহারা দিতে হয়। হাতে লাঠি, বল্লম, চৌকিশর। চৌকিশর কি জানেন? লম্বা বাঁশের মাথায় ত্রিশূলের মত লোহায় বঁড়শি থাকে। খুব ধারাল, ছুঁড়ে দিতে হয়। লাগলে একেবারে বুকের এফোঁড়-ওফোঁড়। তা, তখন ঐ সব অস্ত্র নিয়ে বাঁধ পাহারা দিতে হয়। দু একটা বন্দুক, টর্চলাইটও থাকে।

'সেবার বারচৌকার জলায় প্রবল বন্যা হয়েছে। চারপাশের গ্রাম থেকে লোকজন পাহারা দিতে গেছে। জলার ভেতরে লোকেরাও দুদিন চেষ্টা করেছে বাঁধ কাটানোর জন্য। কিন্তু পারেনি। এপারের লোক খুব সজাগ হয়ে আছে। দূরে কোনরকম একটু নৌকায় শব্দ হলেই অমনি সাবা জলার পাড়ে চীৎকার শুরু হয়ে যায়।

'বারচৌকার লোকজনের মধ্যে এক বুড়ো ছিল। বুদ্ধিটা সে-ই বাতলে দিল।

'তারপর দিন অমাবস্যার রাত্রি। বৃষ্টি হচ্চে না তবে মেঘ খুব ঘন কালো থম্ থম্ করছে। একটা নৌকা নিয়ে এগিয়ে গেল একদল লোক। কিন্তু বাঁধের কাছে গেল না। শুধু দূরে দাঁড়িয়ে রইল ডোবা বটগাছটার কাছে, যেন এক্ষুনি ওরা বাঁধ কাটতেই নামবে, এরকম ভাব।

'জলার বাঁধের চারদিকের পাহারাওয়ালারা সেইখানেই জড়ো হল। রাত তখন দু প্রহর শেষ হয়ে গেছে। এমন সময় খবর পাওয়া গেল, দক্ষিণে রামজালির ঘরের একটু দূরে দুটো নৌকো করে প্রায় ত্রিশজন লোক ছুটে এসে বাঁধ কাটতে লেগেছে। টপাটপ কোদালের কোপ মারছে বাঁধে। একে নদীর বাঁধ জলের চাপে ভেঙে পড়ার মত ছিল, তার উপর কাটান পড়েছে। দশ মিনিটের মধ্যেই বাঁধ শেষ হয়ে যাবার কথা!'

সদয় বলে যাচ্ছিল 'জেলেপাড়ার চারজন তাস খেলছিল। বাঁধ কাটানোর শব্দ শুনেই তাস ফেলে দিয়ে লাফিয়ে উঠল। একজন মস্ত জোয়ান আর লাঠিয়াল ছিল। নাম বসন্ত। 'তবে রে শালা' বলে বসন্ত লাঠি নিয়ে দিলে দু'লাফ। পড়ল একেবারে বাঁধ কাটানোর কাছে। ওদেরও কয়েকজন পাহারা ছিল। বলা যায় না, কখন কি ঘটে। তা বাবু, একা বসন্তই সবকটাকে টিট করে মারল লাঠি একজনের মাথায়। মাথাটি ফেটে চৌচির, হাতের কোদাল হাতেই থেকে গেল। রক্তে লাল হল জলার বাঁধের কাদা মাটি।

'হঠাৎ কে একজন অন্ধকার থেকে একটি চৌকিশর ছুঁড়ল। বসন্ত ঠেকাতে পারল না। চৌকিশরটা বুকে গেঁথে একেবারে এফোঁড়-ওফোঁড়!

'এতক্ষণে খবরটা ছড়িয়ে পড়ছে। দক্ষিণের বাঁধটাই কাটানো হয়ে গেল। এখানে নৌকা রেখে সবলোককে ধোঁকা দিয়েছে জলার ভেতরের লোকেরা।

'হৈ, হৈ, করে লাঠি সোঁটা নিয়ে সব ছুটে চলল দক্ষিণে রামজালির ঘরের দিকে। ততক্ষণে বাঁধ ভেঙে গেছে। জলের স্রোতের গর্জন ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে।

'নৌকার লোকগুলো তখন বসন্তকে চৌকিশর গাঁথা অবস্থায় টেনে নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে দূরে বারচৌকার ভিতরে। অন্ধকারের মধ্যে চলে যায় যায়…।

'এমন সময় বট গাছটার আড়াল থেকে দড়াম্ দড়াম্ দড়াম্—তিনবার বন্দুকের আওয়াজ হল। সেই পালিয়ে-যাওয়া নৌকা লক্ষ্য করে এপারের গ্রামের জানাবাবুর হাতের রাইফেলটা গর্জন করে উঠল। তিনবার অন্ধকারটা জ্বলে উঠল শুধু। সেই আলোয় দেখা গেল, একটা, তারপর আর একটা—দুটো লোক নৌকায় গড়িয়ে পড়ল। আর উঠল না।

'মরা আর আহত লোকগুলোকে টেনে নিয়ে নৌকাটা দ্রুত পালিয়ে গেল রাইফেলের সীমানার বাইরে। তারপর আর কিছু নাই। শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। সেই অন্ধকারে বারচৌকা জলার জল কেবল থম থম করছে।'

গলাটা থামিয়ে সদয় হুঁকোটা একবার দেখল। না, কখন আগুন নিবে গেছে কল্কের।

অরবিন্দ জিজ্ঞেস করল, 'বন্যার সময় সব বছর এমনি খুন মারামারি হত?'

'হাঁ, প্রায় সব বছর। তবে সে বছর একটু বেশি, চারটে মাথা গেল। তা এসব মাথা গেলে লোকে মামলা মকদ্দমা করে না। কারণ লোক ত দু'পক্ষেরই মরেছে। জেল হোক, ফাঁসি হোক দু'পক্ষের লোকেরই হবে। তার চেয়ে লাশগুলোকে গুম করে দেওয়াই ভাল। গর্ত করে মাটিতে পুঁতে তার উপর কলা গাছ লাগিয়ে দাও, পুলিসের বাবাও টের পাবে না।

'তারপর একদিন মাঘ ফাল্গুন নাগাদ বারচৌকোর জল শুকিয়ে আসবে। আর সেই বন্যার পলিমাটি পড়া মাটিতে বেগুন, কুমড়া, উচ্ছে, নানান রবিশস্য অপর্যাপ্ত ফলবে। ততদিনে আবার জলার ভেতরের আর বাইরের গ্রামের লোকের মধ্যে যাতায়াত আত্মীয়তা শুরু হয়েছে। সাগরের জল শুকিয়ে তখন শুকনো মাঠ। তার ওপর দিয়ে পায়ে চলার রাস্তাটা সেই রামজালির ঘরের কাছ থেকে উত্তরে অমর্শি, পাথরঘাটা পর্যন্ত চলে গেছে। কেবল যার ছেলে মরল বা যার স্বামী মরল, তারাই শুধু ভুলল না দাঙ্গার কথাটা। মধ্যাহ্নে

শুকনো ফাঁকা নিষ্ঠুর যে জলাটা কেবল দূরে, অনেক দূরে রি·· রি করছে, তার দিকে তাকিয়ে তারাই কেবল কাঁদে, চোখের জলে বুকের কাপড় ভাসায়!'

কখন বৃষ্টি নেমেছিল। গল্প শুনতে শুনতে সে দিকে খেয়াল ছিল না অরবিন্দের। তার মনে হল, এগুলো গল্প কেন? এ যে ইতিহাস, অলিখিত ইতিহাস কত অজানা জনপদের, যে ইতিহাস কোনো দিন কেউ লেখেনি, লিখবে না। এমনি জলায় আবার বন্যায় সময় বা নতুন লড়াইয়ে প্রস্তুতির সময়, এই কাহিনী মুখে মুখে ফিরবে। কথাটা আবার যেন অশরীরী রূপ নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াবে কিছুদিন—'সেবার দাঙ্গার সময় চারটে মাথা গেছল, কি সেবার ওদের বন্দুক ছিল, এবার এরাও বন্দুক এনেছে কি সাঁওতাল এনেছে তীর চালাবে।'

তারপর? তারপর দাঙ্গা শেষ হবে একদিন। হঠাৎ পাহাড়-পুরের খালে টান পড়ায়, জল কমে গেলে সকলেই ভুলে যাবে সে কাহিনী। গ্রামের বৃদ্ধরা যারা এই দাঙ্গা দেখেছিল, বা যারা মুখে মুখে এই কাহিনীকে আগামী কালের জন্য রেখে যাচ্ছিল, তাদের সংখ্যা একদিন কমতে কমতে একেবারে শেষ হয়ে যাবে। কোনদিন কোন ঐতিহাসিক এই ইতিহাস লিখবে না—যদিও এই ইতিহাস গ্রামের অতি সাধারণ মানুষের ইতিহাস, তাদের জীবনের সুখ দুঃখ হাসি কান্নার ইতিহাস।

ছাতাটা নিয়ে অরবিন্দ উঠতে যাচ্ছিল। রেখা বেরিয়ে এসে বলল, 'মা আজ যেতে না বলছে। রাস্তাটা খুব খারাপ, বৃষ্টি হচ্ছে আর রাতও হয়েছে।'

অরবিন্দ লজ্জিত হল। সত্যি সে খুব অন্যায় করেছে। এত রাত পর্যন্ত কারুর বাড়ীতে বসে গল্প করলে, তারা ত থেকে যেতে বলবেই!

'কি হল? কি ভাবছেন এত?'

'না, রেখা আমি চলে যাই। এমন বেশী রাত কি?'

'হয়েছে, অনেক রাত হয়েছে। দিন ছাতাটা দিন।'

রেখা অরবিন্দের হাত থেকে ছাতাটা নিতে নিতে বলল, 'এই বৃষ্টির রাতে সাপ খোপ বেরোয়। এখন উনি চললেন বাসায়!'

অরবিন্দ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

খাওয়া শেষ করে অরবিন্দ তক্তপোশের বিছানায় এসে বসেছে। রেখা প্লেটে করে পান নিয়ে এল। ঘরের মধ্যে টিম্ টিম্ করে একটা হ্যারিকেন বাতি জ্বলছে। চারধারে রাত নিঝুম হয়ে আসছে।

আস্তে আস্তে রেখা বলল, 'শুয়ে পড়ুন। রাত অনেক হয়ে গেছে।'

রেখা সুন্দর করে মশারিটা গুঁজে দিতে দিতে মাথার কাছে এল, কি ভেবে চুপ করে একটু দাঁড়াল।

অরবিন্দ কিছু বুঝতে পারল না কেন সে দাঁড়াল; শুধু কী এক পরম তৃষ্ণায় সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে নিঃশব্দে রেখার হাতটা নিজের কপালে রাখতে বড়ো ইচ্ছে হচ্ছিল তার!

॥ ১৯ ॥

স্কুলের শেষ পিরিয়ডের আগে শিক্ষক-শিক্ষিকারা লাইব্রেরী ঘরে জড়ো হয়েছেন। নন্দিতা, উমা একধারে বসে বসে গল্প করছিল।

ভুবনবাবু হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে কি খুঁজতে লাগলেন। টেবিলের সব কিছু এলোমেলো করে ফেললেন, কিন্তু যা খুঁজছিলেন তা পাওয়া গেল না।

'খাতাটা কি হল ভুবনবাবু?'—নমিতার ক্রুদ্ধ গলা শোনা গেল ওঘর থেকে।

'খুঁজছি দিদিমণি।'

'আমাদের চিঠির কপিটাই আনুন না?'

ভুবনবাবু চিঠির কপির খাতাটা নিয়ে নমিতার ঘরে ঢুকলেন।

নমিতা কপিটা একবার, আর একবার গভর্নমেণ্টের চিঠিটা পড়তে লাগল।

উমা ঘরে ঢুকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে নমিতাদি?'

'হয়েছে? হয়েছে আমার শ্রাদ্ধ। এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট চায় না, হেডমিসট্রেসরা স্কুলের লেখাপড়া নিয়ে থাকুক। পড়াশোনার দরকার নাই, কেবল বড় বড় বিল্ডিং চাই, দামী দামী এপারেটাস চাই, ফার্নিচাব চাই। কেবল চাই না, ভাল করে পড়ানো হোক, ছাত্রীরা একটুলেখা পড়া শিখুক।—এই দেখ না বাড়ীর প্ল্যান, এস্টিমেট নিয়ে কী ঝামেলায় না পড়েছি! কিছুতেই ডিপার্টমেণ্ট এ্যাপ্রুভ করছে না। এটা ভুল ওটা ভুল। তা একবারই না হয় বলুক। যতবার যাবে ততবার ভুল বেরুবে। না, আমি পারব না এ সব। অসম্ভব, ইম্‌পসিব্‌ল্ আমার পক্ষে।'

ভুবনবাবু নমিতার কানের কাছে গিয়ে চুপিচুপি বললেন, 'দিদিমণি একটা কথা বলব?'

'অনেক কথাই ত বলছেন, বলুন এবার আজ কি বলবেন?'

'আসল কথা হল কি জানেন দিদিমণি, ডিপার্টমেণ্টের সবাই কিছু চায়। এই আর কি! তা শ'চারেক টাকা হলেই হবে। এই হল ওঁদের রেট্। তা হলে দেখবেন চক্ষু বুজে ওঁরা সব কিছু এ্যাপ্রুভ করে দেবেন, চেক্‌ও পেয়ে যাবেন তাড়াতাড়ি।'

নমিতা চমকে উঠল, 'ঘুষ দিতে হবে?'

'আহা, ঘুষ কেন বলছেন? এই কি বলে, একটু পারিশ্রমিক আর কি?'

'সেটা কি ঘুষ নয়? আপনি কি বলতে চান?'

'বলতে চাই কি দিদিমণি, এই পারিশ্রমিক না দিলে আমাদের পরিশ্রমই কেবল বাড়বে। দেখুন, এ পর্যন্ত পাঁচবার কলকাতা গেছি, থেকেছি, ঘোরাঘুরি করেছি। তাতে প্রায় আড়াইশ' টাকা বেরিয়ে গেছে। এখনও কূল দেখতে পাইনি। আরও কতবার যে যেতে হবে

কে জানে। শেষ পর্যন্ত যদি তাও হয়, তখন দেখবেন বিল আটকে গেছে।'

নমিতা স্তম্ভিত হয়ে গেল, 'বিল আটকে দেবে?'

'হাঁ দিদিমণি, জাল পাতা আছে চারদিকে। কোনো না কোনো-ভাবে আপনাকে এই জালে পড়তেই হবে।'

'থামুন ভুবনবাবু নমিতাদিকে কী সব বলছেন'—নন্দিতা ভুবন-বাবুকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিতে চাইল।

ভুবনবাবু নন্দিতার দিকে তাকিয়ে বিনয়ে গলে গিয়ে বললেন, 'আমাকে বকুন, গালি দিন আপনারা। কিন্তু একবার ডিপার্টমেণ্টে গিয়ে দেখে আসুন, আসল ব্যাপারটা কি? কেরানীবাবুরাই সব। তারাই ত আপনার গভর্নমেণ্ট চালাচ্ছে। ফাইলে তারাই যে 'নোট' দেবে, অফিসাররা তাতেই সই মারবেন। আর কেরানীবাবুরা? বুঝতেই পারছেন। তারা সবাই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির নয়।'

ভুবনবাবু বলে যেতে লাগলেন, 'শুনুন তা হলে বলি, সেবার ডিপার্টমেণ্টে কি কাণ্ড হয়েছিল। প্রথমে অনেক খোঁজাখুঁজির পর যখন পৌঁছাই তখন প্রায় সাড়ে এগারটা বাজে। দেখি সব লোক আসেনি। দু'একজন কেরানীবাবু এসে এদিক ওদিক খোস গল্প কর-ছেন। আমি বসে রইলাম। আরও আধঘণ্টা পরে বড়বাবু এলেন। আমার দিকে একবার ভাল করে তাকালেন। ঠিক যেমন ব্যাপারীরা ছাগল কেনার আগে, তাকিয়ে দেখে মালটার দিকে।

'আমি নমস্কার করে বললাম, নীলাপুর স্কুলটার প্ল্যান এস্টিমেট জমা দিয়েছিলাম, বড্ড দেরী হচ্ছে স্যার।

'হুঁ', বড়বাবুর শ্রীমুখ থেকে একটি সংক্ষিপ্ত শব্দ বের হল মাত্র।

'একটু যদি দেখেন স্যার, কি অবস্থায় আছে?

'ফাইল দেখতে হবে, বলে বড়বাবু কৌটো থেকে পান নিয়ে ধীরে ধীরে মুখে পুরলেন।

'ক্ষুদে ক্ষুদে কোথায় রে?

'ওধার থেকে ক্ষুদিরামের জবাব এল—যাই বড়বাবু।

'দে একগ্লাস জল দে বাবা!

'বড়বাবু এবার জল খেলেন। তারপর নস্যির কৌটো বের করলেন।'

'চুপ করুন ভুবনবাবু, বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলতে হবে না আর'—নন্দিতা আবার ধমকে উঠল।

'সত্যি বলছি দিদিমণি, এই বিত্তের হাত ছুঁয়ে বলছি'—

ভুবনবাবু গভর্নমেণ্টের চিঠিটার উপব হাত রেখেই বলতে লাগলেন—'কৌটো থেকে নস্যি নিয়ে নাকের গর্তে দিলেন ঠেসে। আমারই হাঁচি আসছিল। বহুকষ্টে চাপলাম। তারপব বললেন, হ্যাঁ কি বললেন? নীলাপুব স্কুল?

'বড়বাবু আমার দিকে কৃপাদৃষ্টি দিলেন। ভাবলাম, বোধহয় দেবতা তুষ্ট হয়েছেন।

'তা, ফাইল না দেখলে বলব কি করে? আপনি স্কুলের কে?

'আমি ক্লার্ক। ফাইলটা দেখে যদি একটু বলেন।

'ফাইল? বড়বাবু চোখ কপালে তুলে বললেন। ফাইল? ফাইল কি এখানে আছে মশায়? ফাইল উড়ছে মশায়, উড়ছে। পাখী যেমন করে ওড়ে এ ডাল থেকে সে ডালে। ফাইল কি পাওয়া যায় মশায়?

'ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছি। বাইরে সেই ক্ষুদে দাঁড়িয়ে ছিল। চুপি চুপি বলল, ফাইল চান? ফাইলের খবর চান?

'বললাম, চেয়ে ত ছিলাম। কিন্তু বড়বাবু যে বললেন ফাইল উড়ছে। এখন সেই উড়ন্ত ফাইলের খোঁজ পাব কি করে?

'পাবেন মশায়, পাবেন।

'ক্ষুদেই কায়দাটা বলে দিল। আবার ফিরে গেলাম।

'কী ফিরে এলেন যে—বড়বাবু নরম সুরে বললেন।

'বললাম, বড্ড কাজ ছিল। ক'দিন কলকাতায় বসে আছি। আর জানেন ত, আমাদের সেই কোন্ তেপান্তর থেকে আসতে হয়, কত খরচ হয়!

'হবেই ত মশায়, হবেই ত ? তা আর আমরা বুঝি না ? সেই জন্য ত কত সিমপ্যাথেটিকেলি আমরা মফঃস্বলের কেসগুলো ডীল করি।

'আমি আসার সময় পিয়ন ক্ষুদেকে ডেকে নিয়ে এসে এগারটা টাকা দিয়ে এলাম। ওর কমিশন একটাকা।'

নমিতা ধমকে উঠল, 'কেন দিতে গেলেন আপনি ?'

'দিদিমণি আপনি বুঝবেন না।' ভুবনবাবু হাত জোড় করে বলে উঠলেন, 'এই ওষুধ ছাড়া এই আপনার ভুবন কেন, স্বয়ং ভুবনেশ্বর এলেও ফাইল উদ্ধার করতে পারত না। চক্ষের নিমেষে উড়ন্ত ফাইল বড়বাবুর টেবিলে এসে গেল। বড়বাবু ফাইল খুলে দেখে বললেন, এখানে নয় উপরে গিয়ে তদ্বির করুন। বুঝলেন, তদ্বির করুন। গণ্ডগোল আছে।'

উমা, নন্দিতা চুপ করে ভুবনবাবুর কথাগুলো শুনছিল। নমিতা সোজা ভুবনবাবুকে বলল, 'এ টাকার হিসাব কেমন করে দেবেন ?'

'সে কথা আপনি এতটুকু ভাববেন না বড়দিদিমণি। সত্যিকার হিসাব দেখাতে গেলে আপনার বাংলাদেশের সবগুলো স্কুল একদিনে উঠে যাবে। একটা স্কুলও ধোপে টিকবে না।'

'তার মানে আপনি বলতে চান সব স্কুল ভুয়ো হিসেব পাঠায়, মিথ্যে রিপোর্ট দেয় ?

'সব স্কুল দিদিমণি, সব স্কুল। কাজেই এটা ত একটা ট্রুথ-এ দাঁড়িয়ে গেছে। এখন ভুয়ো আর মিথ্যে রিপোর্টগুলো সত্যি, আর সত্যি রিপোর্টগুলো ভুয়ো এবং মিথ্যে। বুঝলেন কিনা ? হেঁ, হেঁ...।'

ভুবনবাবু দার্শনিকের হাসি হাসতে লাগলেন। কিন্তু নমিতা হাসল না। ভুবনবাবুর মুখে এই সত্য দর্শনের নতুন সংজ্ঞা শুনে একটা কঠিন আঘাতে নির্বাক হয়ে বসে রইল শুধু।

নন্দিতা, উমা ক্লাশে চলে গেছে। ছুটি হতে আর দেরি নেই।

নমিতা পুরনো হিসাবের খাতাপত্র প্ল্যান এস্টিমেটের কপি গুছিয়ে রেখে আস্তে আস্তে নিজের ঘরে ফিরে গেল। কিছুদিন থেকে স্কুল সম্পর্কে তার ধারণা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। যে মন,

যে উৎসাহ, যে আন্তরিকতা নিয়ে নমিতা এই স্কুলকে নতুন করে গড়ে তুলবে বলে ভেবেছিল, বারবার আঘাত পেয়ে তার সেই মন, সেই উৎসাহ, স্তিমিত হয়ে আসছে। সে কেবল ভাবছিল, গভর্নমেন্ট কি ভাবে প্রতিষ্ঠানকে অসৎ হতে বাধ্য করে।

নমিতা সারাদিনের ক্লান্ত শরীবটা বিছানায় বিছিয়ে দিল। এখন ভুবনবাবুর কথাগুলো কেবল তার মনে কী একটা নিষ্ঠুর যন্ত্রণার মত বাজছে। সংসারেব বহুঅভিজ্ঞ বৃদ্ধ ভুবনবাবু বলছিলেন—এখন ভুয়ো আব মিথ্যে রিপোর্টগুলো সত্যি, আর সত্যি রিপোর্ট-গুলো ভুয়ো, মিথ্যে। এইগুলো ট্রুথ-এ দাঁড়িয়ে গেছে দিদিমণি।

নমিতা ভাবতে লাগলো—ভুবনবাবুর কথাগুলোর মধ্যে বাস্তব সত্যের স্পর্শ রয়েছে। তিনি কথাটা ঠাট্টার ছলে বলেছেন ঠিকই। কিন্তু কোথায় যেন এর শেকড় আছে। সত্যি কি মানুষ আজকের দিনে এই সমাজে এবসোলিউট অনেস্টি-র মধ্যে বাস করতে পারে? এর উত্তর কোথায় পাবে সে? ঘুষ না দিলে যদি বিল আটকে থাকে, তখন তার কি ক্ষমতা আছে যে, বাড়ী তৈরির হাজার হাজার টাকার ঝামেলা সে মিটিয়ে দিতে পারে! তবু নমিতা এতদিন একটি সত্যের কঠিন বুনিয়াদের উপরে দাঁড়িয়ে এই স্কুলকে নিজের মতো করে গড়ে তুলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু সেই সত্যের বুনিয়াদে যদি ফাটল ধরে তবে কিসের ওপর দাঁড়িয়ে কাজ করবে সে?

নন্দিতা, উমা দৌড়ুতে দৌড়ুতে নমিতার ঘবে ঢুকল।

উমা বলল, 'চলুন আজ জ্যাঠাবাবুর স্কুলে যাব একটু।'

নমিতার মনে হল, আচ্ছা, স্বদেশবাবুকে বললে, এই সমস্যার কি একটা সমাধান হয় না? বলল, 'জ্যাঠাবাবুর স্কুলে যাবে কেন?'

'উমা বলল, কাজ আছে। চলুন ত এখন।'

'নন্দিতা কানে কানে বলল, 'অসিতদাও আসতে পারে কিন্তু।'

নমিতা বিছানা থেকে উঠতে উঠতে হেসে বলল, 'তাতে কি হবে?'

অসিতকে নমিতা সত্যি অনেকদিন দেখেনি।

যেতে যেতে নমিতা অন্যমনস্কভাবে বলল, সত্যি এ রকম জানলে হেডমিসট্রেস হতাম না। আগেও মাস্টারি করেছি। তখন কেবল পড়িয়েছি।'

উমা বলল, 'এখন কেবল পড়ুন।'

নমিতা হেসে বলল, 'কি পড়ব আবার?'

'ভুবনবাবুর থিওরিগুলো। এখন পরীক্ষায় এই ধরনের প্রশ্ন আসবে, "ঘুষ দিবার আর্ট সম্পর্কে যাহা জান লিখ"—অথবা "নতুন সমাজের অগ্রগতির পথে ঘুষের অবদান," অথবা "বর্তমান সভ্যতার সহিত দুর্নীতির সম্পর্ক ক্রমবর্ধমান,—ইহা যুক্তিসহ প্রমাণ কর।"....'

নমিতা উমাকে ধমকে দিয়ে বলল, 'হয়েছে চুপ করো। রাস্তায় যেতে যেতে আর চেঁচিও না বাপু।'

নদীর পাড় ধরে ওরা তিনজন এগিয়ে যাচ্ছিল। বি. ডি. ও. অফিস, সেটেলমেণ্ট অফিস কিছু আগে ছুটি হয়ে গেছে। অফিসের কাজ শেষ করে, হাট-বাজার নিয়ে এখনও দু'একজন লোক আস্তে আস্তে হেঁটে চলেছে, নদীর পাড় দিয়ে।

নন্দিতা বলল, 'জানিস পার্টনার এখন যে বি. ডি. ও. এসেছেন, ভদ্রলোক বিয়ে করেননি এখনো। রাজী থাকিস ত বল। আর জানিস্, অসিতদার সঙ্গে তাঁর খুব ভাব।'

'তুই কি করে জানলি রে?'

'শুনেছি পার্টনার। অসিতদাকে খুব ভাল লেগেছে ভদ্রলোকের। এত বড় ডাক্তার, ব্রাইট কেরিয়ার—তবু অসিতদা গ্রামে পড়ে আছে জেনে বি. ডি. ও. নাকি—অবাক হয়ে গেছেন।'

উমা বললে, 'অসিতদাকে অনেকেরই ত ভাল লাগে রে ভাই। তাতে আর হ'ল কি?'

'হবে আবার কি?' নন্দিতা বলল।

'আমি বলছিলাম কি, ভালোলাগা আর ভালোবাসা এক কথা কি না?'

নমিতা হাস্তে হাস্তে বলল, 'আমি কিন্তু তোমাদের বড়দি।'

আশ্চর্য। এই পড়ন্ত বেলায়, শান্ত নদীর বাবলা বন ঘেরা উঁচু পথটায়, ওরা তিনজনে এখন খুব বন্ধু হয়ে উঠেছে। তিন বন্ধুর আলোচনা আবর্তিত হচ্ছে অসিতকে ঘিরে।

নমিতার মনে পড়ল, কতো দিন অসিতের সঙ্গে তার দেখা হয় নি। একদিন যে একটি স্নিগ্ধ পুষ্পকোরক ধীরে ধীরে সূর্যের দিকে মুখ তুলে চেয়েছিল, স্কুলের বিষাক্ত আবহাওয়ায় তা যেন ক্রমশঃ ম্লান হয়ে উঠছে। এই স্কুল, এই প্রভুত্ব তাকে জীবিকা দেবে। কিন্তু জীবন? জীবন কোথায় এই বালুপ্রান্তরের মধ্যে পাবে সে? কোথায় পাবে এই প্রায়-যৌবনোত্তীর্ণ বেলায় দুটি কি তিনটি শান্ত ছোট ঘর, একটু ফুলের ও সবজির বাগান, দু'একটি দুষ্টু সবল সুন্দর শিশু।

কিন্তু অসিত সেই পুরুষ, যাকে নিবিড় করে ডাকতে হয়, গভীর করে ডাকতে হয়। যে আসে না, যে চায় না, যে সহজ নয়, সাধারণ নয়, অথচ যার আকর্ষণ নারীত্বের ভিত্তিকে প্রবল ভাবে নাড়া দেয়। এবং অসিত যে সাধারণ নয়, সে যে স্বতন্ত্র, নমিতার ভালোলাগা সেইখানেই। যে পুরুষ বড় সহজে কাছে এগিয়ে আসে, সীমারেখা পেরিয়ে যায়, মেয়েরা তাদের ভালোবাসে না। কারণ সেখানে প্রার্থিতের জন্য তপস্যা নেই, অবকাশ নেই ধ্যানের, অবকাশ নেই অভিসারের, অবকাশ নেই প্রেমের সংগ্রামে জয়ী হবার আনন্দের।

নমিতার মনে পড়ল, কবেকার সেই একটি অন্ধকার রাত্রির কথা। এই জনশূন্য নদীর তীর দিয়ে ওরা আসছিল। অসিতের হাতে সাইকেল। অসিত শ্মশানটা দেখিয়ে ভূতের কথা বলেছিল। নমিতা ভয়ে চীৎকার করে অসিতের কাছে এসেছিল, অসিত কিন্তু কাছে আসেনি।

'নমিতাদি।'

নমিতা চমকে উঠল। পরক্ষণেই সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'কি হল আবার?'

'কিছু হয়নি', নন্দিতা বলল, 'আমরা এসে গেলাম বলে। এই শ্মশানটায় সেদিন ওস্তাদজীকে পোড়ানো হয়েছে।'

নমিতা দাঁড়াল, দেখল আসন্ন রাত্রিতে নদীতীরের শ্মশানটা কি একটা ভয়ঙ্কর রিক্ততা নিয়ে তাকিয়ে আছে।

নন্দিতা বলল 'এখন পুরবীর সময় রে ; সন্ধ্যা হয়ে আসছে।'

ওস্তাদের চিতার চিহ্নের ওপর সন্ধ্যার নিঃশব্দ পুরবী যেন শুদ্ধ গান্ধার থেকে ধীরে ধীরে কোমল রেখাব স্পর্শ করছে।

নন্দিতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল শ্মশানটা দেখছিল। পার্টনার ধমকে উঠল, 'চলবি ত? না শ্মশানের ধারে দাঁড়িয়ে রইবি?'

'আচ্ছা পার্টনার, আমি মরলে এইখানে পোড়াবি আমাকে? নদীর একেবারে কোল ঘেঁষে। মাঝে মাঝে জোয়ারের সময় নদীর জল ছুঁয়ে যাবে আমাকে। প্লীজ, পার্টনার বল না? মাঝে মাঝে তোকে কিন্তু আসতে হবে, বিশেষ করে যেদিন পূর্ণিমা, আসতেই হবে কিন্তু। কিছু নয়। একটু বসে চলে যাবি। না, না, ফুল দিতে হবে না, একটু কাছে, একটু মাটির ওপর না হয় বসলি। আমি শুধু তখন ঘুমিয়ে থাকব মাটির মতো!'

'নন্দিতা, এই ভর সন্ধ্যেবেলায় বলার আর কোনো কথা নেই, না? এই শ্মশানের ধারে এই সব হচ্ছে?' উমা ধমকে উঠল।

'সত্যি পার্টনার, আমার মরতে খুব ইচ্ছে করে। দেখিস্ আমি মরব, ঠিক তোদের এইখানেই মরব। এই বাবলা বনের ধারে, নদীর একেবারে কোলের কাছে আমি ঘুমুবো। দেখিস, তুই ঠিক দেখিস পার্টনার!'

নমিতা দেখল, নন্দিতার মুখে যেন কিসের একটা অজানা ছায়া। বলল, 'পাগলীটাকে নিয়ে ত বড্ড মুস্কিল দেখছি। উমা, ওর জন্য একটি রাজকুমার জোগাড় করে দাও ত দেখি, বেঁচে থাকতে চায় কিনা?'

উমা অবাক হয়ে বলল, 'রাজকুমার? হায় নমিতাদি, ওকে চেনো না। ওর ভালোবাসার কথা শুনবে নমিতাদি? ও ভালোবেসেছিল সেই সন্ন্যাসীকে, যাকে ঘর বেঁধে রাখে না, স্নেহ বেঁধে রাখে না, ভালোবাসা বেঁধে রাখে না, তাকেই!'

সত্যই। যা কিছু অপার্থিব, নন্দিতার ভালোবাসা তাকেই

ঘিরে। যেখানে মৃত্যু, যেখানে বিরহ, যেখানে বিদায়, সেইখানেই নন্দিতার প্রেম। আশ্চর্য এক মৃত্যু-বিলাসী মন নিয়ে জন্মেছে মেয়েটা। সে মন সুরের বেদনায় যেমন মগ্ন হয়ে থাকে, তেমনি এই রাত্রির শ্মশানের নিঃসঙ্গ অন্ধকারে, কি নদী আর বাবলা বনের দূর শূন্যতায়, কি সন্ন্যাসীর মতো উঁচু লোনা মাটির পথেব অচেনা যাত্রায়, তেমনি মগ্ন হয়ে থাকে।

কয়েকটি মুহূর্ত কেউ কোন কথা বলল না। এক সময় নমিতাই অবাক হয়ে বলল, 'সেই সন্ন্যাসীকে ভালোবেসেছিল নন্দিতা?'

নন্দিতা সেই অন্ধকারে পার্টনারের হাতটা জড়িয়ে ধরল শুধু। কোন কথা বলতে দিল না উমাকে।

সেই নদীপারে, বেসিক স্কুলটার একটু দূরে এবং শ্মশানটার একেবারে কাছে তিন বন্ধু কি এক অজানা বেদনার আভাসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তখন জোয়ার। দূব সমুদ্র থেকে যে স্রোত মরা নদীটার সঙ্কীর্ণ কোল দিয়ে এগিয়ে চলেছিল, নন্দিতা দেখল, সে স্রোতের জল এখনও ওস্তাদের চিতাটাকে বারবার ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। আর অস্থির ভগ্নাংশগুলি, সেই জলে ধীরে ধীরে সিক্ত হয়ে উঠছে।

এখন প্রায় জয়জয়ন্তীর সময়। নন্দিতার মনে হল ওস্তাদের গলাটা যেন, জোযাবের জলের মতো শুদ্ধ রেখাব থেকে কোমলগান্ধারটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে আসছে। তাবপব চলে যাবে উদারাব পঞ্চমে, কোমল নিষাদ আর শুদ্ধ ধৈবত স্পর্শ করে।

স্বদেশবাবুর ঘরের সামনে সুন্দর একটি আল্পনা আঁকা। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে ঘরে একগুচ্ছ বজনীগন্ধা। আর কোন বাহুল্য চোখে পড়ল না। নমিতা বুঝতে পারল, আজ একটু আগে কোন উৎসব হয়ে গেছে। কোথাও কোন শব্দ আসছে না। কেবল এই প্রশান্ত পরিবেশে সর্বপ্রকার বাহুল্যের আবর্জনা পেরিয়ে একটু আগে এখানে যে উৎসব শেষ হয়েছে সে উৎসব যে কত গভীর আন্তরিক নমিতার তা বুঝতে দেরি হল না।

উমা বলল, 'আজ জ্যাঠাবাবুর জন্মদিন। তাই স্কুলের সকলে মিলে একটু উৎসব করেছিল। অবশ্য জ্যাঠাবাবু তা চাননি।'

'আগে আমায় বলনি কেন? ছি, ছি, এমন দিনে কেউ খালি হাতে আসে নাকি?' নমিতা লজ্জায় ঘরের কাছে এসে দাঁড়িয়ে রইল।

উমা বলল, 'এ তোমার কলকাতা নয় যে বড়দি, এখানে লোক দেখান প্রেজেণ্টেশান আনতে হবে।'

স্বদেশবাবু মেঝেতে একধারে শান্ত হয়ে বসে আছেন। মাদুরের উপর শুভ্র খদ্দরের চাদর পাতা।

'আজ তোমরাও এসে গেছ?' স্বদেশবাবুর মুখে সেই প্রশান্ত হাসি ছড়িয়ে পড়ল। 'এ যে ভীষণ ব্যাপার দেখছি। আজ বুঝলাম আমারও একটা জীবন আছে, যে জীবন নিয়ে উৎসব করা যায়, কি বল তোমরা?'

অনুষ্ঠানমন্ত্রী এসে ওদের তিনজনকে নমস্কার করে প্রত্যেকের হাতে একটি করে সতেজ স্বর্ণচাঁপা ফুল দিয়ে গেল।

স্বদেশবাবু নমিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাজকর্ম আর সহকর্মীদের কেমন লাগছে?'

নমিতা একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'কাজ করতে কিছু অসুবিধে হচ্ছে।'

স্বদেশবাবু একটু ভেবে বললেন, 'সত্যকথাটি নিঃসঙ্কোচে বলার জন্য ভাল লাগল। দেখ, আমরা সব সময় অপরকে খুশী করে চলতে গিয়ে মন জুগিয়ে চলতে গিয়ে সত্যটাকে চাপা দিয়ে চলি। ওটা ঠিক নয়। ওতে নিজের কাছেই নিজেকে ছোট হয়ে যেতে হয়।'

'সব সময় কি সত্যকে মেনে চলা যায়? চলা কি সম্ভব?' নমিতা সোজা প্রশ্ন করল।

স্বদেশবাবু একটু চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'বোধহয় সম্ভব নয়। মহাভারতের যুধিষ্ঠিরকেই একবার কিছুটা মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া ঠিক নয়। যুধিষ্ঠিরের জন্য মহাকবি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও করেছিলেন।'

বাইরে সাইকেলের ঘন্টির শব্দ শুনতে পাওয়ায় তখনকার মতো প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে গেল। উঠানে এসে নামল অসিত আর একজন ভদ্রলোক।

উমা খুশি হয়ে বলল, 'উনিই নতুন বি. ডি. ও।'

অসিত নমিতা, উমা, আর নন্দিতার সঙ্গে রণজিৎবাবুব পরিচয় করিয়ে দিল।

রণজিৎবাবু বললেন, 'আপনাদেব সকলের নামেব সঙ্গে আমি কিন্তু পরিচিত।'

নমিতা বলল, 'উমা আপনাকে ভাল করেই চেনে। সেদিন ও বলেছিল আপনি নাকি এই ক-মাস এসে অসিতবাবুর খুব বন্ধু হয়ে উঠেছেন।'

রণজিৎবাবু হেসে উঠলেন। বললেন, 'ওঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব? বন্ধুত্ব সমানে সমানে হয়। উনি আব আমি? উনি কত বড। এ যেন আকাশ মাটির ফারাক।'

অসিত ততক্ষণে কোথায চলে গেছে।

এক সময় বণজিৎবাবু বলে উঠলেন, 'আপনার চবকা দেখছি না আজকে?'

স্বদেশবাবু শান্ত গলায় বললেন, 'সুতো কাটা ছেড়ে দিয়েছি, রণজিৎ।'

কথাটা শুনে সকলেই চমকে উঠলেন, উৎকর্ণ হয়ে থাকলেন।

স্বদেশবাবু কিছুটা আপন মনে বলতে লাগলেন, 'কথাটা শুনে তোমরা অবাক হচ্ছ, হওয়াই স্বাভাবিক কাবণ চরকা আমার জীবনের সঙ্গে দীর্ঘদিন জড়িয়ে ছিল। অবশ্য ভারতের মতো দেশে, বেকার সমস্যার সামান্য কিছু সমাধানের ক্ষেত্রে চরকার প্রয়োজনীয়তা আছে একথা স্বীকার করি। গান্ধীজী বলতেন, চরকা কাটলেই স্বাধীনতা আসবে। শুধু চরকা কেটে কিন্তু কোনদিনও স্বাধীনতা আসত না। চরকা ছিল একটা জীবনদর্শনের প্রতীক, যে জীবন সহজ অনাড়ম্বর আত্মনির্ভরশীল, এবং দরিদ্র মানুষের সঙ্গে

একাত্ম। তাছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধের একটা হাতিয়ার বলে চরকাকে মেনে নেওয়া হ'ত, একদল সংগ্রামী মানুষের ঐক্য এর মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠত। কিন্তু দেখ, আজ সেই সময়টা পাল্টে গেছে। আজ মনে হচ্ছে, যে জীবনদর্শনের কথা আমরা বলতাম, চরকা যার প্রতীক ছিল, সে জীবনদর্শন অনুসরণ সম্ভব নয়।'

স্বদেশবাবু একটু চুপ করে রইলেন তারপর আবার বলতে লাগলেন, 'চরকায় সুতো কাটি, আজ যেন একটা আত্ম-প্রবঞ্চনা। দেশের বড় বড় সমস্যাগুলোর দিকে চোখ বন্ধ করে রেখে, একটা আবরণ দিয়ে নিজেদের মনকে আমরা ঢেকে রাখি। বলি, বড়াই করি, আমরা গান্ধীজীর আদর্শের ধারক, বাহক। কিন্তু কথাটা মিথ্যা, একেবারে মিথ্যা। কেবল চরকা কেটে গান্ধীজী জীবন অতিবাহিত করেননি। তাঁর জীবন ছিল বিপ্লবের। এই বিপ্লব আমাদের অগোচরে ঘটে গেছে—একটা কাপুরুষ ভীত পরাজিত মন সকলের জানার অগোচরে কখন দুঃসাহসিক হয়ে উঠেছে। চরকাকে সেই বিপ্লবের পাশাপাশি দেখতে হবে। যে মানুষের মধ্যে সেই বিপ্লবের আগুন নেই, যে মানুষের কাছে চরকা কেবল বাড়ীর পাঁচ দশটা কাপড়ের প্রয়োজন মেটাবার উপায় মাত্র, সে মানুষ আর যাই হোক্ সমাজের মানুষের সঙ্গে একাত্ম নয়, সে সমাজের প্রতিনিধি নয়। সমাজের মানুষের সঙ্গে যে একাত্ম হবে, প্রতিনিধি হবে, তাকে সমাজের সবচেয়ে যা দুঃখের সমস্যা তাই নিয়ে সংগ্রাম করতে হবে। চরকা কাটার ব্যক্তিগত দুগ্ধপোষ্য জীবন তার জন্য নয়। রণজিৎ, নমিতা মা, তোমরা আমাকে ঠিক বুঝতে পারবে না। কিছুদিন থেকে মনটা বড় তিক্ত হয়ে গেছে।: স্বাধীনতার পরে দেশটা দুর্নীতিতে ভরে উঠেছে। এখানে সবচেয়ে অভাব ঘটছে মানুষের। আমার মনে হয়, আজকের দিনের এইটিই হ'ল বড় সমস্যা। একটা স্বাধীন দেশ গড়ে উঠবে তার যেটুকু সম্পদ আছে তাই নিয়ে। কিন্তু এই গড়ে ওঠার

যন্ত্র যদি গলদে ভরে যায় তবে দেশ গড়ে উঠবে কি করে? কে করবে দেশের উন্নতি?'

রণজিৎবাবু বিনোবাজীর প্রসঙ্গে তুললেন।

স্বদেশবাবু বললেন, 'বিনোবাজী পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, গান্ধীজীর বোধহয় একমাত্র উত্তরাধিকারী। কিন্তু আমার কি মনে হয় জান, বিনোবাজীর ভূদান আন্দোলন, আরম্ভ না হলেও কোন ক্ষতি হ'ত না দেশের। জমির মালিকানা একদিন কৃষকের হবে, তার জন্য ভূদান যজ্ঞের প্রয়োজন ছিল না। পৃথিবী সমাজতন্ত্রের পথে চলবে। সমাজতন্ত্র আপনিই উৎপাদনের উৎসকে সর্বসাধারণের হাতে তুলে দেবে এবং ভাবতের মতো দেশে তা অহিংসার পথেই হবে, তবে ধীরে ধীরে। আর তাবও প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ জনসাধাবণকেও দায়িত্ব নেবার যোগ্য হতে হবে। একদিনে এ দায়িত্ব আসে না; আব অহিংসার পথে হবে এই জন্য যে, সশস্ত্র বিপ্লবের স্বপ্ন ভারতবর্ষে সফল হবে না। অসামরিক ভারতবর্ষকে সশস্ত্র গণসংগ্রামেব বিরাট বণক্ষেত্রে রূপান্তরিত করার মতো নেতৃত্ব, কংগ্রেসবিরোধী পার্টিগুলির মধ্যে একান্ত অভাব। এই নেতৃত্বের মূল মন্ত্র কেবল বক্তৃতা নয় বা উর্বব মস্তিষ্কের প্রোপাগ্যাণ্ডাও নয়।

'আর একটা কথা। দেখ রণজিৎ, আজকে নতুন ভারতবর্ষ নির্মাণের ক্ষেত্রে, ভূমিহীনদের ভূমি ব্যবস্থার জন্য পদযাত্রা করাটা তাঁর জীবনের অপচয় মাত্র। ভূমিহীনকে ভূমি রাষ্ট্র দেবে, তার নিজের প্রয়োজনে। এই ভূমি সংগ্রহ আর বণ্টনের জন্য পদযাত্রার অভিযান অর্থহীন। এটুকু চিন্তা করলে বুঝতে পারবে, এই অভিযান দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি, যেটুকু যেখানে করেছিল, দুদিন যেতে না যেতেই তা মুছে গেছে। অনেক সময় নীতি ও বাস্তবতার মধ্যে দুস্তর প্রভেদ থাকে। গান্ধীজী বলেছিলেন, ইংরেজ রাজত্বে যতো ভারতীয় কর্মচারী আছেন, তাঁরা যদি একদিনে কাজ ছেড়ে দেন তবে ভারতবর্ষ সেই দিনই স্বাধীন হবে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। তেমনি জমির মালিকগণ তাদের জমির এক-

ষষ্ঠাংশ স্বেচ্ছায় ভূমিহীনের জন্য ছেড়ে যদি দেয় তবে দেশে কেউ ভূমিহীন থাকবে না—এই সত্যও বাস্তবে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। অথচ জমিদারী বিলোপ ভারতের প্রায় সব রাজ্যেই বিনা সংঘর্ষে ঘটেছে আইন করে। আইন করেছেন তাঁরা, যাঁরা জনপ্রতিনিধি। কিন্তু আইনকে কার্যকরী করবে, গভর্নমেন্টের সদিচ্ছাকে কাজে রূপায়িত করবে—এই মানুষেরই আজ অভাব, রণজিৎ। এই অভাব আজকের দিনের সবচেয়ে বড় সমস্যা। বিনোবাজীর দৃষ্টিতে এই অভাব বোধহয় ঠিকভাবে ধরা পড়েনি। পড়লে তিনি ভূমি ভিক্ষা না করে মানুষ ভিক্ষা করতেন, মানুষ তৈরির কাজে লাগতেন। স্বাধীন ভারতবর্ষে সবচেয়ে দরকার হয়েছে সৎ আর যোগ্য মানুষের।'

'নমিতা, রণজিৎবাবু তোমরা কিছু মনে করো না, চরকা বা বিনোবাজী সম্পর্কে যা বললাম এগুলো আমার একান্ত ব্যক্তিগত মত।'

নমিতা এতক্ষণ কেবল স্কুলের কথাটা ভাবছিল। ভাবছিল ভুবনবাবুর সেই মন্তব্য 'শ' চারেক টাকা দিয়ে দিন দিদিমণি; প্ল্যান, এস্টিমেট, চেক সব এসে যাবে। কোন ঝামেলা নাই।' নমিতার মনে হল—এই সমস্যার সঙ্গে স্বদেশবাবুর কথার কোথায় যেন একটা গভীর মিল আছে।

স্বদেশবাবু আবার বলতে লাগলেন, 'দেশের এই একান্ত প্রয়োজনের দিনে আমরা যারা একদিন স্বাধীনতার জন্য সবকিছু ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে গেছলাম, তারা চরকায় দশ লেচি, কুড়ি লেচি, সুতো কেটে কর্তব্য শেষ করে ফেললাম। আমার চরকা কাটা ছেড়ে দেবার আসল কথা এইখানে। এ একটা আত্মপ্রবঞ্চনা, আত্মরতিও বলতে পার, কেন না—ভাবলাম গান্ধীজী সুতো কাটতে বলেছিলেন, তাই যখন আমরা কাটছি তখন আমরাই গান্ধীজীর শিষ্য। আসলে গান্ধীবাদের বৈপ্লবিক দিকটাই খালি থেকে গেল। আমরা সেদিকে ফিরেও তাকালাম না।'

স্বদেশবাবু নিজের কথা বেশী করে বলেন না। নিজের চিন্তা, নিজের ভাবনাকে তিনি নিজের মধ্যেই সমাহিত করে রাখতে চান।

কিন্তু আজ এক দুর্বল মুহূর্তে বুনিয়াদী স্কুলে যখন তাঁর সপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হল, সেই সময় জীবনকে তিনি একবার বিশ্লেষণ করে দেখতে চাইলেন, জানতে চাইলেন—সত্যি কি তাঁর এই আন্তরিক শ্রদ্ধা গ্রহণ করবার যোগ্যতা আছে?

কিছুদিন থেকে তিনি লক্ষ্য করছিলেন, সরকারী অফিসের যে কটি শাখা নীলাপুরে স্থাপিত হয়েছে, সবগুলিতেই চরম দুর্নীতি চলেছে। নতুন বি.ডি.ও. রণজিৎ অবশ্য ব্যতিক্রম। তাঁকে সামনে পেয়ে স্বদেশ বাবু নিজের দুঃখের কথাগুলো বলে যাচ্ছিলেন। তিনি শুনেছেন, ইতিমধ্যে রণজিৎবাবুর বিরুদ্ধে ওপরে দরখাস্ত গেছে, কারণ এ রকম লোক থাকলে দুর্নীতির অসুবিধা হয়।

নমিতা বলল, 'আপনার চিন্তার সঙ্গে আমি একমত। স্কুলের কাজ করতে গিয়ে আমি প্রতি পদক্ষেপে বাধা পাচ্ছি এবং সে বাধা আসছে সরকারী অফিস থেকে। অন্ততঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীরা দুর্নীতির উর্ধ্বে থাকুক, এটাই হওয়া উচিত! সিমেন্ট আর লোহার ব্যবসার সঙ্গে দেশের ছেলেদের শিক্ষার ব্যবসাটাকে একই চোখে দেখা ঠিক নয়।'

রাত্রি প্রায় ন'টা হতে চলেছে। নদীপারের আকাশে জ্যোৎস্না উঠতে দেরী নেই।

মস্ত বড় বারান্দায় খেতে বসার ব্যবস্থা। এতগুলি ছেলে, কিন্তু কোথাও এতটুকু চীৎকার নেই। সকলেই নিঃশব্দে যে যার কাজ করে চলেছে। ছেলেরা আগেই বসেছিল। স্বদেশবাবু, রণজিৎবাবু, নমিতা, নন্দিতা ও উমা এল। একটু পরে অসিতও এসে একধারে বসল।

কিছুক্ষণ সকলেই নিঃশব্দে বসে রইল। তারপর একটি ছেলে সুন্দর সুরেলা উচ্চারণে উপনিষদের সেই শ্লোকটি আবৃত্তি করতে লাগল—

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু,
সহ বীর্যং করবাবহৈ।

'ভগবান আমাদের সকলকে সমভাবে রক্ষা করুন, সকলকে সমানভাবে বিদ্যাদান করুন, সকলকে সমভাবে সামর্থ্য দিন। মা বিদ্বিষাবহৈ'—আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ'।

নমিতার ভাল লাগল, খুব ভাল এই প্রার্থনাটুকু—যে প্রার্থনা একার জন্য নয়, সকলের জন্য, সকলের জীবনের কল্যাণের জন্য।

২০ ॥

নীলার মনে হয়, যৌবন এক বিস্ময় এবং সুন্দর বিস্ময়। এই মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি করে যেন এক রাশ লজ্জা এসে তাকে ঢেকে দেয়, ঢেকে দেয় নীলার আঠারো বছরের শরীরকে। নীলা নিজের এই রূপান্তরকে বার বার দেখেছে, দেখে দেখে সে মুগ্ধ হয়েছে, লুব্ধ হয়েছে, ধীরে ধীর ভালোবেসেছে তাকে।

ক্লাশের বন্ধুরা ঈর্ষা করে, নীলা এতো সুন্দর বলে। তার চোখে, মুখে, সুন্দর আঙুলগুলোতে এখন যৌবনের রক্তাভ পূর্ণতা। নীলার খোঁপাটা দুষ্টুমি করে খুলে দিয়ে ওরা কেউ বলে, 'বাবাঃ, এযে মেঘ নেমেছে রে! তোর চুলগুলো আমায় দিবি?'

আর একজন বলে, 'আমারি যে তোকে ভালবেসে-ফেলতে ইচ্ছা করছে রে নীলা।'

শান্ত, সুন্দর, নীলা ক্লাশের বন্ধুদের এ অত্যাচার নীরবে সহ্য করে। তার ভালো লাগে, বন্ধুদের এই প্রশংসাটুকু। যদিও বাইরে সে বলে—'তোরা বড্ড জ্বালাস কিন্তু। এতো সুন্দরের ওপর লোভ যখন, তখন সুন্দর ছেলে দেখে বিয়ে কর না, বাবা। তোদের হাত থেকে বাঁচি।'

'আমাদের হাত থেকে না হয় বাঁচলি, কিন্তু অসিতবাবুর হাত থেকে ?'

'আরে ওর হাতে না বাঁচাই ওর আনন্দ।'

'জানিস ও এখন অসিতবাবুর ধ্যানে ডুবে আছে।'

আর ফাজিল বন্ধু অশ্রুটা বলে ওঠে, 'জানিস ডাক্তারদের এনাটমি পড়তে হয়। দেহের সবকিছুই ওরা আগে ভাগে জেনে ফেলে। ওমা, কি লজ্জা!'

তখনকার মত নীলা চুপ করে থাকে। কিন্তু এই কথাগুলো কোন নির্জন মুহূর্তে বড় বেশী জীবন্ত হয়ে ওঠে, বড় বেশী মুখর হয়ে ওঠে তার মনের মধ্যে। তখন তার একান্তে ভাবতে ভাল লাগে, কোনো দিন অসিতদা এসে কখন তার কালোচুলেব খোঁপাটা দুষ্টুমি কবে খুলে দিয়েছে ; তার চোখে, মুখে, কপালে ভালোবাসার চিহ্ন এঁকেছে, তার সুন্দব শীর্ণ আঙুলগুলোয় আর একটি যৌবনের স্পর্শ লাগছে !

কত সময় নীলা একথা ভেবেছে। ভেবেছে নিজেকে দেখে। কিন্তু যখন সে তার ফাজিল বন্ধু অশ্রুর কথা ভাবে, যে বলেছিল, ডাক্তাররা আগে ভাগে সব জেনে ফেলে তখন নীলার খারাপ লাগে। সে ভাবে, প্রার্থিতের কাছে আর কোন বিস্ময়, কোন রোমাঞ্চ, কোন অজানা গোপন আনন্দ সে নিয়ে আসছে না! সে যেন বড় সহজ, বড় চেনা, রক্ত মেদ মাংস আর কঙ্কালের এক অতি পরিচিত সমন্বয়।

হোক! তবু সে পরিচয়, তার একান্ত আপন মানুষের কাছে অনাবৃত পরিচয়। সে পরিচয়ের মধ্যে লজ্জা আছে এবং আনন্দ আছে, যে আনন্দের স্পর্শ সে এখনও পায়নি।

নীলা যে পরিবারের মানুষ সেখানে এই চিন্তার কোন প্রস্তুতি ছিল না। এখনও যে আছে তাও নয়। তবে নীলাপুর গার্লস্ স্কুলের কয়েক বছরের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে, আধুনিক সমাজের যে আলো এসে পড়েছে, নীলার চিন্তার আর স্বপ্নের আয়োজন সেখান থেকেই সঞ্চিত।

কত দিদিমণি কলকাতা থেকে এখানে এসেছেন আবার চলে গেছেন। সকলেই সঙ্গে করে এনেছেন এক একটা নতুন জীবনের সন্ধান, যা নীলাপুর বা তার চারিদিকের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বন্দী নারী সমাজ এতদিন পায়নি। বার তের বছরেই বেশী বয়সের পুরুষেব সঙ্গে বিবাহ। মেয়ের দেহে যখন যৌবন, তখন পুরুষের দেহে যৌবনের ভাটা শুরু হয়েছে। তবু ছেলেমেয়ে হয়। কম বয়সে অনেকগুলি ছেলেমেয়ের জন্মদান, ঘর-সংসার, গরু-বাছুর এমন কি ক্ষেত-খামার পর্যন্ত সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম, গুরুজনের সেবা, আর দিনের বেলায়ও আলো যায় না এমন ঘরে রাত্রে স্বামীসহবাস। এই ত এ অঞ্চলের মেয়েদের জীবন।

এই ত গৌরীব বিয়ে হয়ে গেল ক্লাশ এইট-এ উঠতে না উঠতে। এখন হয়ত সে 'মা' হয়ে বুড়ী হতে চলেছে। আজ কি করে যেন এই বদ্ধ, সংকীর্ণ মৃতপ্রায় জীবনে একটা বিপ্লব ঘটে গেল! এখানে যে দিদিমণিরা এসেছেন, তাঁদের বয়সে এই অঞ্চলের মেয়েরা চার পাঁচ ছেলের মা হয়ে বুড়ী হয়ে যায়। তাদের মধ্যে যে একদিন যৌবন ছিল সাধ ছিল আনন্দ ছিল রোমাঞ্চ ছিল আজ তা গবেষণার বস্তু।

কিন্তু এই দিদিমণিরা যেন এক একজন উজ্জ্বল ব্যতিক্রম, প্রচলিত জীবন-মিছিলের এক একটি জীবন্ত প্রতিবাদ। এরা সেই বয়সে জুতো পায়ে দিয়ে সোজা হেঁটে স্কুলে যান। তাঁদের উজ্জ্বল চোখে মুখে কোন দূরাগত দেশের সংকেত, যেখানে নারী আর দাসী নয়, সুদিনের দুর্দিনের বন্ধু, সঙ্গী, যেখানে দু'জনের মিলিত শ্রমে সুস্থ সংসার গড়ে তুলবার কঠিন প্রতিজ্ঞা।

নীলার বয়স তখন আরো কম। এক নতুন দিদিমণি এলেন কলকাতা থেকে। কয়েকদিন পরে একজন ভদ্রলোক এসে হোস্টেলে থেকে গেলেন কিছুদিন। মাঝে মাঝে ওঁরা দু'জনে বেড়াতে যেতেন, এই লোনা মাটির উঁচু পথটা দিয়ে উত্তর দিকে, বাবলা বন আর নদীটার ধার দিয়ে। ক্লাশের বন্ধুরা কি করে যেন সন্ধান পায়।

অশ্রুটাই বেশী গোপন সংবাদ সংগ্রহে আগ্রহী। সে-ই খবরটা দিয়েছিল। বলেছিল, 'জানিস, ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে নতুন দিদিমণির ভালোবাসা হয়েছে রে, বুঝলি।'

নীলা বলেছিল, 'তুই কি করে জানলিরে ?'

'ও আমি দেখেই বুঝতে পারি। শুনেছি নতুন দিদিমণি চাকরী করে ঐ ভদ্রলোককে টাকা দিচ্ছেন, ভদ্রলোক এম-এ পড়েন। এম-এ পাশ হয়ে গেলেই একটা চাকরী। তারপর ওঁদের বিয়ে হবে বুঝলি ?'

'কেন ? এমনি ওঁদের বিয়ে হতে নেই ?'

'তুই একটা আস্ত বোকা। দিদিমণি জাতে বামুন, আর ভদ্রলোক নাকি অন্য জাতের। তাই ত বাড়ীর লোকেরা ঝামেলা বাধাচ্ছে। তা বাবা, নতুন দিদিমণি ঝানু মেয়ে। দেখিস ঠিক ম্যানেজ করে নেবে।'

অশ্রু কিছুদিন কলকাতায় ছিল! বাবা সেখানে সামান্য চাকরী করত। মারা যেতে এখন দেশের স্কুলে পড়ছে। শোনা যায় নাকি পাশের হাইস্কুলের একটা বখাটে ছোকরার সঙ্গে ওর চিঠিপত্র লেখালেখি চলে। দু'একদিন ছেলেটাকে নীলা নতুন পুলটার কাছে বটগাছের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতেও দেখেছে তা হলে নিশ্চয়ই ওদের দেখাশোনা হয়। অশ্রুর শীর্ণ শরীরটায় যৌবন যেন কখন শুকিয়ে গেছে তার পাপড়ি মেলার পূর্ব লগ্নে। তার অপূর্ণ মানসিকতায় এখন শুধু এই প্রেমের স্বপ্নের আনাগোনা!

নীলা অবশ্য এ সব ভাবেনি। সে ভেবেছিল এক নতুন জীবনের স্বপ্ন, এক নতুন পৃথিবীর ছবি, সেখানে জাত নাই, যেখানে দুটি সুস্থ পরিণত নরনারীর মিলিত হবার সামাজিক বাধার প্রাচীরগুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। নতুন দিদিমণি সেই দেশের জয়ধ্বনি বয়ে নিয়ে এসেছেন।

খবরটা জানার পরেই নীলা মনোযোগ সহকারে নতুন দিদিমণিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিল, দেখতে শুরু করেছিল। কিন্তু না,

দেখতে তিনি নীলার মত সুন্দর নন। রং শ্যামল, তবে মুখ সুশ্রী এবং বড় উজ্জ্বল। চোখ দুটোতে, নীলার মনে হয়েছিল, কী একটা কঠিন শপথ যেন জ্বলছে। এ বোধহয় ভালোবাসার শপথ। নতুন দিদিমণির বাঁ হাতে আঙুলে তারের কি একটা জিনিস ছিল। পরে সে জানতে পেরেছিল, নতুন দিদিমণি সেতার বাজান। সেতার শুনেছিল একদিন স্কুলের এক ফাংশানে। সে কিছু বুঝতে পারেনি। গান সে জানে না। সে কেন, তার পরিবারের কেউই জানে না, জানা যে প্রয়োজন সেটুকুও তারা জানে না। তবু দিদিমণির সেই ছবিটা তার মনে স্পষ্ট আঁকা আছে। দিদিমণি মাথা নীচু করে চোখ বুজে সেতার বাজাচ্ছেন। কখন অলস আঘাতে কবরীটা খুলে গেছে তাঁর, বুকের কাছে সেতারটা কেবল দুলছে আর একটি পর্দা থেকে অনেক-গুলি সুরের জন্ম হচ্ছে। সেই উজ্জ্বল মুখ চোখের প্রশান্তির মধ্যে নীলার মনে হল, যেন আরো কোনো আলো এসে পড়েছে। এক সময় তবলাটা বন্ধ হল। নতুন দিদিমণি মুখ তুলে চাইলেন।

তা, সেই দিদিমণি কয়েক মাস পরেই চলে যান। তখন ভদ্রলোক এম-এ পাশ করে কোথায় দূরে কোন কলেজে প্রফেসারি পেয়েছেন। ওঁদের বিয়ে হয়ে গেছে। এখন ছেলে হয়েছে একটি। নীলার খুব ইচ্ছে করে সেই ছেলেটিকে একবার আদর করতে, কোলে নিতে। ভালোবাসার সন্তান বোধহয় সুন্দর হয়ে থাকে। তা এসব খবর অশ্রুই দিয়েছিল। কিন্তু নীলার কাছে এ শুধু কেবল একটা খবর নয়; এ যেন এক নতুন পৃথিবীর সন্ধান।

নীলার সঙ্গে অসিতের পরিচয় অনেক পূর্বে। সেবার জ্বর হয়েছিল নীলার। অসিতদা তখন সবে ডাক্তার হয়েছে। এখানে এসে প্র্যাকটিসে বসেনি। গাঁয়ের হাতুড়েদের হাতে জ্বরটা কিছুতেই বশে আসছে না বলেই অসিতদাকে ডাকা হয়েছিল। তা অসিতদার নামটা তাদের মহলে খুব শোনা। পড়াশোনা করত না, তবে পড়লে যে খুব ভাল ছেলে হত—এই রকম একটা ধারণা এ অঞ্চলে তখন প্রচলিত ছিল।

স্বদেশবাবু ছেলেকে দেখার সময় পান না, কংগ্রেস করে আর জেল খেটে সময় চলে গেল তাঁর। নীলার পরিবারের সঙ্গে অসিতদাদের পরিবারের যে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, তাও নয়। নীলার বাবা ইংরেজভক্ত ছিলেন। পুলিসকে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছেন। স্বদেশীদের ঠেঙিয়ে ভূত ছাড়াবার ব্যাপারে দারোগাকে পরোক্ষে সাহায্য করেছেন। এখন অবশ্য সময় পাল্টেছে। তার বাবা, অসিতদার বাবার কাছে মাঝে মাঝে যান, দেশের সমস্যা নিয়ে কথাবার্তা বলেন। কংগ্রেসের গুণগান করেন!

অসিতদা এসেছিল তাকে দেখতে। সবেমাত্র কলেজ থেকে বেরিয়েছে সে। কি একটা কলেজ হাসপাতালে হাউস-সার্জন আছে।

বাবার সঙ্গে সঙ্গে অসিতদা ঘরে ঢুকল।

নীলা চম্‌কে উঠল। কেন চম্‌কে উঠল সে জানে না, কেন যে রোমাঞ্চিত হল তাও সে জানে। শুধু তার মনে হল কোথা থেকে এই পড়ন্ত বেলায় এই ঘরে এত আলো এসে ঢুকল! নীলা চোখ নামিয়ে নিল। কিন্তু আবার দেখতে ইচ্ছা করল—সেই অদূর অতীতের দুরন্ত কিশোরকে। কলকাতায় থাকলে বোধহয় মানুষ সুন্দর হয়? আচ্ছা, এই সরু সরু সুন্দর আঙুলগুলোয় অসিতদা মারামারি করত কি করে! আচ্ছা, এই চেহারায় ফুটবলের এত ভাল 'ব্যাক' খেলা যায়!'

'তোমার কিচ্ছু হয়নি।' অসিতদা হাসতে হাসতে বলল।

নীলা অসিতের সুন্দর দাঁতগুলো দেখছিল। বাঁ হাত দিয়ে অসিত নীলার হাতটা তুলে নিয়ে নাড়ী দেখল।

'জ্বর ক'দিন হল?'

'আজ পাঁচদিন।'

'রেমিশন হয়?'

'না'।

উত্তর দিচ্ছিলেন আগের ডাক্তার।

অসিতদা ষ্টেথেস্কোপটা কাণে লাগাল। বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'একবার বুকটা দেখব।'

নীলার বড় লজ্জা করছিল, বড় ভয় করছিল। কেঁপে কেঁপে উঠছিল সে।

'হাঁটু দুটো তোলত নীলা?'

অসিতদা নাম ধরে ডাকল। পেট টিপে টিপে কি যেন দেখল! তারপর ষ্টেথেস্কোপটা কান থেকে খুলে নিল। বলল, 'কি ঔষধ দিচ্ছেন?'

প্রেসক্রিপশানটা দেখানো হল।

অসিতদা শুধু ডাক্তারের মুখের দিকে চাইল একবার।

নীলার মনে হল, অসিতদা এর মধ্যে এত গম্ভীর হল কি করে?

হঠাৎ নীলার দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'তোমার কি খেতে ইচ্ছে করে নীলা?'

নীলার লজ্জায় কিছু বলতে ইচ্ছা করছিল না।

'বল? ভাত খেতে ইচ্ছে করছে? তাই না?'

'হাঁ।'

'কেমন ঠিক ধরে ফেলেছি?'

'কী আশ্চর্য, অসিতদা ছেলেমানুষের মত এমন সুন্দর হাসতে পারে!'

'বেশ, কাল থেকে ভাত খাবে।' বাবার দিকে তাকিয়ে বলল,

'মাছের ঝোল আর ভাত দেবেন ওকে। ভাতটা যেন বেশ নরম হয়।'

বাবা অবাক হয়ে বলল, 'জ্বরই ছাড়ছে না এখন ভাত দেব?'

'দেবেন, দেবেন, আমি বলছি, ভাত দেবেন।' অসিতদা ততক্ষণে একটা কাগজে প্রেসক্রিপশান লিখছে। কী সুন্দর হাতের অক্ষর-গুলো। লিখতে লিখতে বলতে লাগল, 'মিছেমিছি না খাইয়ে রোগীকে দুর্বল করার কোন মানে হয় না। নীলা হাসল একটু।

'তুমি ভাল হয়ে যাবে দুদিন পরে।'

'কোন ক্লাশে পড় নীলা ?'

'ক্লাশ এইট্-এ।'

'তাড়াতাড়ি ম্যাট্রিক পাশ করে ফেল ? কেমন ?'

অসিতদা উঠে পড়ল। বাবা পিছু পিছু গিয়ে বলল, 'ভিজিট ?'

অসিতদা ফিরে দাঁড়াল। বলল, 'না, ভিজিট লাগবে না। আমি ত এখন এখানে প্র্যাকটিস করছি না। করলে তখন নিশ্চয় নোব।'

বাবা খুশি হল, চারটে টাকা তার বেঁচে গেল। নীলাকে ওষুধ দেওয়া হল। কিন্তু ভাত দেওয়া হল না। সেই আগের ডাক্তার বললেন, 'রামো, রামো, ভাতটি দেবেন না, বাবু। ছোকরা ডাক্তার অসুখের কি জানে ? শতেক মারী ভবেৎ বৈদ্য—বুঝলেন কিনা ? আর দেখবেন বাবু, সাতদিনের আগে যদি এ জ্বর সারে, তবে আপনি আমার নাক কেটে ফেলে দেবেন।'

ডাক্তারের অবশ্য নাক কেটে ফেলে দেওয়া হয়নি, যদিও তৃতীয় দিনের পর আর নীলার জ্বর আসেনি। কিন্তু জ্বর ছাড়লেও অসিতদার ছবিটা নীলাকে কিছুতেই ছাড়ল না। নীলা বুঝেছে, সে উপলব্ধি করেছে, অনুভব করেছে যে, সে অসিতদাকে ভালবাসে ! তার কথা স্মরণ করতে, তার কথা বলতে, তাকে দেখতে তার সমস্ত হৃদয় উৎসুক হয়ে থাকে, উন্মুখ হযে থাকে।

এবং বন্ধুদের আনন্দের উৎস সেইখানেই।

নীলা আসছেবার পরীক্ষা দেবে। কিন্তু বইয়ের পাতা খুললেই যেন কয়েকটা ছবি তার সামনে ভেসে ওঠে। সেই মিটিঙের দিন অসিতদা বক্তৃতা দিচ্ছে। যখন গণ্ডগোল হয় তখন অসিতদাই সেই লোকগুলিকে সভা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। আর স্কুলে খাবার দেবার সময় কি ঠাট্টা ! ফাজিল বন্ধু অশ্রুই বলেছিল, 'নে অসিতবাবুর খাবারটা তু-ই নিয়ে যা নীলা। দেখ্ যেন ফেলে টেলে দিস্ না আবার। ইস্ এরি মধ্যে যে রাঙা হয়ে উঠছিস্‌রে ?'

ভাগ্যিস দিদিমণিরা কেউ ছিল না সেখানে। আর তখন নীলা

জানালা দিয়ে দেখছিল অসিতদা বড়দির সঙ্গে দাঁড়িয়ে কি কথা বলছে। কী কথা বলছিল ওরা? বড়দিকেও বেশ উজ্জ্বল লাগছিল তখন নীলার! সত্যি, অসিতদাটা যেন কেমন আলাদা মানুষ! ওর সামনে যে-ই যাক্, সেই কেমন যেন ছোট হয়ে আসে। আবার সখ করে ধুতি পাঞ্জাবি পরে আসা হয়েছে! বেশ লাগছে কিন্তু দেখতে। তা হোক্, যাই বল না বাবা, অসিতদাকে ট্রাউজার আর সার্টেই বেশ মানায়। সোজা, দোহারা চেহারা, স্মার্ট। খাড়া হয়ে চলে, যেন পৃথিবীর কাউকে সে কেয়ার করে না। ধন্যি সাহস ছেলের, মন্ত্রীকেই শুনিয়ে দিল দু কথা!

ক'দিন হল হোস্টেল থেকে বাড়ী এসেছে নীলা। দুপুরবেলা একটা বই নিয়ে তার ঘরে শুয়ে শুয়ে পড়ছিল। পাশের ঘব থেকে বাবা মার কথাগুলো ভেসে আসছে। মা খাটের একধারে বসে পান সাজতে সাজতে বলে যাচ্ছিল কথাগুলো। মা বলছিল, 'মেয়ের বিয়ে দেবার কথাটা ভাবছ কিছু?

বাবা বলল, 'হুঁ।'

'শোনো, অসিতের বাবার কাছে একবার যাও না?'

'যাব।'

'যাব ত বললে, কবে যাবে? জান অসিতকে নীলার খুব ভাল লাগে।'

'তুমি জেনে বসে আছ?'

'বুঝি গো, বুঝি। আমার মেয়ে, ওকে আমাকে পেটে ধরতে হয়েছিল। বুঝব না মেয়ের মুখ দেখলে?'

'মেয়ের মুখে অসিতের নাম লেখা আছে নাকি?'

মা রাগ করে উঠে গেল খাট থেকে। বাবা বলল, 'যাব, বাবা যাব। অনেকদিন থেকে ভেবে রেখেছি কথাটা। পরীক্ষার আগেই বিয়ে দিতে হবে। নইলে ফেল করলে আবার বিয়ে দিতে ঝামেলা হবে। যাব, এই শীগগির যাব।'

নীলার বুক কাঁপছিল অজানা আশঙ্কায়। আচ্ছা, অসিতদা যদি তাকে বিয়ে করতে না চায়!

তারপর আবার হোস্টেলে ফিরে এসেছে নীলা। এখানে অত অবসর নেই অসিতদাকে ধ্যান করার। প্রাইভেট পড়তে হচ্চে, সারাদিন বই নিয়ে বসতে হচ্চে। সামনেই পরীক্ষা। নীলা বলে, এটা তার অগ্নি পরীক্ষা।

নমিতা, নন্দিতা, উমা সেই বিকেল থেকে কোথায় যেন চলে গেছে। বাসন্তী তার ঘরে সেলাই করতে করতে ভাবছিল, কোথায় গেল ওরা! নদী পাড় দিয়ে উত্তর দিকে তিন জন যাচ্ছিল। তাহলে অসিত বাবুর বাড়ী গেছে বোধ হয়। বেশ চালু আছে নমিতাদি। ক'দিনই বা এসেছে এখানে। এরি মধ্যে ঠিক জায়গায় টোপ ফেলেছে বাবা!

তা রুচি আছে নমিতাদির। কলকাতার মেয়ে, বুদ্ধিও রাখে। নইলে অসিতবাবুর দিকে হাত বাড়ায়। এ অঞ্চলের সেরা ছেলে। বড় ডাক্তার। আর ডাক্তার জামাইয়ের জন্য ত বড়লোকের মেয়ের বাবারা হন্যে হয়ে উঠে! এই যেমন নীলার বাবা! বাসন্তী শুনেছে নীলার বাবা নিশিকান্তবাবু কালাচাঁদবাবুকে বলেছেন, 'যাক্ না ছেলে, বিলেত যাক্। যতো টাকা লাগে আমি দোব। তবে বাবা, মেয়েকে বিয়ে করে যেতে হবে।'

এ মন্দ নয়, মাঝখানে নমিতাদি এসে জুটে গেছে। এখন একটি বিন্দুকে ঘিরে দু'টি হৃদয়ের লেন দেন!

ভালোবাসার কথা মনে করার মধ্যেও যেন একটা মাদকতা আছে। এই মাদকতা শরীরের সমস্ত রক্তবিন্দুতে ছড়িয়ে পড়ে। নমিতার, নীলার, অসিতের কথা মনে মনে ভাবতে গিয়ে বাসন্তীর গৌরীশংকর-বাবুর কথা বেশী করে মনে পড়ল। সেই ভীরু গৌরীশংকর এখন হয়ত নিজের বন্ধ ঘরটায় শুয়ে আছে। না, ভদ্রলোকের বাইরে বেড়াবার বদ অভ্যাস নেই, আকাশের রঙ বদলের আয়োজন দেখার

মত অহেতুক পাগলামি ও নাই তার। হয়ত বিছানায় শুয়ে শুয়ে রেডিওতে আস্তে আস্তে গান শুনছে।

বাসন্তী নীচে নেমে এল। যা ভেবেছিল ঠিক তাই। গৌরী-শংকর বাবু বিছানার শুয়ে আছে। বাসন্তী আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে কপাটটা বন্ধ করে দিল। হয়ত কারুর চোখে পড়বে। কপাটটা বন্ধ করতে করতে চুপি চুপি বলল, 'কী, আবার এমন সময় শুয়ে আছ? কতবার বলেছি না, এখন একটু বেড়িয়ে আসবে বাইরে। তা নয়।'

'ভালোলাগে না।'

'তা লাগবে কেন? ওতে শরীর, মন ভাল হবে যে?'

গৌরীশংকর চুপ করে রইল।

'শরীরটা তোমার কিছুতেই ভাল যাচ্ছে না। না?'

'মনটাও।'

বাসন্তী কোন কথা বলল না। গৌরীশংকরবাবুর এই অসুস্থতাটুকু তার ভাল লাগে। ওর দুর্বলতাটুকু আছে বলেই ত বাসন্তী আজো ওকে ঘিরে রাখে। এবং সেইখানেই তার আনন্দ।

'একটু সরে এসো না কাছে।'

বাসন্তী আজ সরে গেল না। গৌরীশংকর ওকে জোর করে সরিয়ে আনল কাছে।

বাসন্তী আস্তে আস্তে বলল, 'কিছু মনস্থির করলে?'

'এখনো করিনি।'

'কোনদিনও করে উঠতে পারবে না।' বাসন্তী কোল থেকে গৌরীশংকরের হাতটা রূঢ়ভাবে সরিয়ে দিল।

আহত গৌরীশংকর বলল, 'কেন একথা বলছ?'

'বলছি, এতদিন দেখে দেখে।'

'আর না হয় কিছুদিন দেখ।'

'না আর নয়। এবার আমিই পথ দেখে নেব আমার। আমারও ত একটা জীবন আছে, স্বাদ আহ্লাদ আছে।'

'আমাকে ফেলে যাবে?' গৌরীশংকরের গলাটা যেন আর্তনাদ করে উঠল।

'যাবই ত? কোনো কাপুরুষকে নিয়ে মেয়েরা ঘর বাঁধতে চায় না, ভালোবসে না।'

'তুমি একটা কথা ভাবছ না বাসন্তী। এটা দেশের প্রতিষ্ঠান। এখানে কোন ঘটনা ঘটলে বড় খারাপ দেখায়।'

'না, না, দেখায় না, দেখায় না। কেন দেখাবে? এটা ত স্বামীজীদেব আশ্রম নয় যে ভালোবাসাকে খুন করে ফেলতে হবে, গলা টিপে মেবে ফেলতে হবে?'

'কোন দুর্নাম হবে না?'

'যাবা দুর্নাম বটায়, তাদের কখনো ঘটনার অভাব হয় না।'

বাসন্তীর কাছে বার বার 'কাপুরুষ' 'কাপুরুষ' শুনে শুনে গৌরীশংকর যেন হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। সত্যি কি সে কাপুরুষ? ভীরু? হ্যাঁ সত্যিই ত। নইলে বাসন্তীব সঙ্গে তাব কতদিনেব ভালোবাসা! কিন্তু মাথা উঁচু করে সকলের সামনে দু'জনে ঘর বাঁধবে, ভালোবাসার ঘর, এ সাহস তার কেন হয়নি?

কী এক উত্তেজনায় গৌরীশংকর সেদিন উদ্ধত হয়ে উঠল! বলল, 'বেশ তাই হবে, আমি রেজিগনেশন দিয়ে দিচ্ছি।'

বাসন্তী গৌরীশংকরের বুকে মাথা রেখে বলল, 'ও, এই তোমার বুদ্ধি? একটা চাকবী না ঠিক কবে রেজিগনেশান?'

'চাকরী, একটা পাওয়ার কথা ছিল দীঘার দিকে। পেলে ভালই হবে। শরীরটাও সারবে।'

বাসন্তী কিন্তু ভাবছে, আর এক সমুদ্রের কথা, গৌরীশংকরের নিবিড় স্পর্শের গভীরে। যে সমুদ্রের অতল জলের আহ্বান বাসন্তী শুনছে, সে সমুদ্র তাব একান্ত নিজেব পৃথিবীর। আলো নিবে গেছে মাঠ বন আর মরা নদী থেকে। একরাশ অন্ধকার ভরে উঠছে গ্রাম-ক্ষেত আর জলাভূমিতে। একটা থমথমে নির্জন রাত্রি আকাশ থেকে

নামছে ; নামছে পৃথিবীর মাটিতে ঘাসে, উদ্ভিদে। আশ্চর্য এক মুহূর্ত! এই মুহূর্তে অন্ধকারের গভীরে মুছে যেতে মিশে যেতে হারিয়ে যেতে একটা পাগল করা ইচ্ছা বাসন্তীর সর্বশরীরে উদ্বেল হয়ে উঠছে এখন!

॥ ২১ ॥

রাত্রির একটা ঘুমন্ত আমেজ আসছে ওপাশের একটা ঘরের এস্রাজের সুর থেকে। নন্দিতা একবার কান পাতল, শুনল, কি রাগ বাজছে। হাঁ দরবারী কানাড়া। দরবারী কানাড়ার একটা গৎ কেউ বাজাচ্ছে। না, হাত তৈরী নয়। তবু এই রাত্রে ঐ সুরটুকুই কেমন যেন নন্দিতার রক্তে চঞ্চলতা আনে। নন্দিতার ভাল লাগছে না। তার শরীরটাও কয়েকদিন থেকে ভাল যাচ্ছিল না। পার্টনারকে তবু বলেনি। বললে, আবার সেই কাঁচকলার ঝোল আর ভাত খেতে হবে মাসের পর মাস। না, সে আর তা পারবে না। বহুদিন খেয়ে দেখেছে ওতে আল্‌সার সারে না। বরং মাঝখান থেকে খেয়ে বেঁচে থাকার আনন্দটাই মাটি!

নন্দিতা এস্রাজের সুরে মন বসাতে চাইল।

উঠোনে পায়চারি করতে করতে স্বদেশবাবু নমিতাকে বলছিলেন, 'এই বেসিক স্কুলটাকে এখন যেভাবে দেখছ মা, এভাবে ছিল না। কত বছর পরিশ্রম করে একে গড়ে তুলেছি। না, মা, আমি একা নই— ছাত্র, মাষ্টার মহাশয়, গ্রামের লোক সবাই মিলে। নদীটা তখনও এত মরে যায়নি। পাশের এই বিশ বিঘা জায়গাটা এমনি পতিত পড়েছিল। নদীর পলিমাটিতে গড়ে ওঠা জমি, উর্বর। সেবার গান্ধিজী এসেছিলেন, ওইখানেই এক প্রার্থনা সভায় তিনি ভাষণ

দিয়েছিলেন। তাই ভাবলাম, তাঁর স্মৃতিকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে পারি। সেই হল এই বেসিক স্কুলের জন্মের গোড়ার কথা।'

স্বদেশবাবু আস্তে আস্তে বলে যেতে লাগলেন, 'এখানে একটা আদর্শ চালু করেছি মা। দেখেছ ত কয়েকজন শিক্ষক আছেন স্কুলে। তাঁরা তাঁদের পরিবার নিয়েই থাকেন। আমরা মাইনে দিই কিভাবে জান? স্কুলের তহবিল থেকে তিনি ততটুকু নেবেন যাঁর দরকার যতটুকু। তাঁর বেতনের মাপকাঠি তাঁর ডিগ্রি নয়, তার ন্যায্য প্রয়োজন।'

নমিতা বলল, 'একজনের ছেলেমেয়ে যদি বেশি হয় আর তিনি যদি নীচু ক্লাশে পড়ান, তবে তিনি উঁচু ক্লাশের টিচারের চেয়ে বেশী মাইনে পাবেন?'

'হাঁ, মা, তাই। একটু কষ্ট লাগছে ভাবতে, তাই না? কিন্তু এই হল এখানকার নিয়ম। বিদ্যাদান মা, এখানে ঠিক চাকরী নয়। এই মন নিয়েই এখানে আসতে হয়।'

উমার ডাক শুনে নমিতা চমকে ফিরে দাঁড়াল।

'নন্দিতা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে!'

'তাই নাকি? কোথায় সে?'

'ঐ বসে আছে।'

নমিতা কাছে যেতে নন্দিতা বলল, 'বড় যন্ত্রণা হচ্চে বড়দি, ঠিক আগের মত।'

নমিতা ভয় পেল। এই রাত্রে এখানে কি করবে বুঝে উঠতে পারল না।

স্বদেশবাবু কখন কাছে চলে এসেছেন!

দুটো সাইকেল নিয়ে দু'জন ছুটল অসিতকে ডাকতে। একটু পরে হট্-ওয়াটার ব্যাগ এসে গেল বিছানায়। নমিতা শুধু অবাক হয়ে দেখছিল। এদের কাউকে কেউ কোন নির্দেশ দেয়নি। এরা নিজেরাই সুশৃঙ্খল সৈনিকের মত সব কাজ করে চলেছে। স্বদেশ-বাবু বিছানার কাছে একটা মোড়ায় চুপ করে বসে আছেন শুধু।

অদূরে বাইরের উঠোনে কার দ্রুত সাইকেল থেকে নামার শব্দ পাওয়া গেল। তারপর পায়ের শব্দ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল। নমিতা শব্দ শুনে চিনল, অসিত আসছে। দ্রুত আসছিল অসিত। ঘরে ঢুকেই বাবাকে দেখে আস্তে আস্তে এগোতে লাগল।

বিছানার পাশে দাঁড়াল অসিত। নন্দিতা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে উঠছে।

স্বদেশবাবু সরে গেলেন ঘর থেকে।

নন্দিতাকে দেখতে দেখতে অসিত গম্ভীর হয়ে উঠল।

নমিতা ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করল—'ভয়ের কিছু আছে?'

পাশে একটি ছেলে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল নির্দেশের অপেক্ষায়। কলম বের করে অসিত কি লিখে তার হাতে দিল।

আবার একটা সাইকেল চলে যাওয়ার শব্দ উঠল স্কুলের উঠোনে।

নমিতা বলল, 'বলুন না, ভয়ের কিছু আছে নাকি?'

'না, মানে ঠিক এই মুহূর্তে নেই।'

'অসিতদা বড় কষ্ট। আর পারছি না'—নন্দিতা বলতে বলতে কেঁদে ফেলল।

নমিতা ভাবছিল, সেই শ্মশানের ধারে নন্দিতার মুখে কিসের ছায়া দেখেছিল সে। না, সে ছায়া অন্ধকারের নয়, আলোরও নয়। সে ছায়া অন্য কোন জগতের। তবে কি নন্দিতাকে বাঁচানো যাবে না? কই, অসিত কিছু বলছে না ত? অসিতের ওপর যে তার অনেক বিশ্বাস! অনেক নির্ভর!

দৌড়ুতে দৌড়ুতে কম্পাউণ্ডার ঘরে এসে ঢুকল। নন্দিতা, উমা এই নির্বাক লোকটিকে সেই ওস্তাদের মৃত্যুর দিনে একবার দেখে ছিল।

উমার কেবল মনে হচ্ছে, মৃত্যুর সঙ্গে আজকের সন্ধ্যার সমস্ত ঘটনা যেন মিলে যাচ্ছে কেমন করে!

'বড় কষ্ট হচ্ছে, না?' অসিত নন্দিতার কাছে বসতে বসতে বলল।

'আর কষ্ট থাকবে না।'

'তোমার পায়ে পড়ি অসিতদা, আমাকে ভাল করে দাও।' নন্দিতা আবার কেঁদে ফেলল।

অসিত এ্যাম্পুলটা ভাঙতে ভাঙতে বলল, 'কি আপদ! মরতে দিলে তো মরবো 'জান ত অসিত ডাক্তারকে, যমরাজার সঙ্গে লড়ার সুযোগটা পেলেই সে বেঁচে যায়। ছোটখাটো অসুখের চিকিৎসা করে তার সুখ নেই। হ্যাঁ, দেখি হাতটা। উমা, ব্লাউজের হাতাটা তুলে ধরত একটু। ভোরে দেখবে নন্দিতা, তুমি ভাল হয়ে গেছ।'

কথা বললে বলতে অসিত ইন্‌জেক্‌সানটা দিয়ে ফেলেছে।

একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল নন্দিতা।

ঘর থেকে অসিত আর নমিতা বাইরে এল।

সেই কতক্ষণ থেকে নমিতা অসিতের সঙ্গে একটু কথা বলার অবকাশ খুঁজছে। কিন্তু আজ সারা সন্ধ্যায় তা সম্ভব হয়নি। তারপর এই আকস্মিক ঘটনা।

নমিতা একসময় জিজ্ঞেস করল, 'কেমন দেখলেন?'

'ভাল নয়! ওকে এখান থেকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে।' একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল অসিত।

'এখানে চিকিৎসা হবে না?'

'না, পাড়াগাঁয়ে এ চিকিৎসার সুযোগ কম। এক্সরে করা দরকার। অপারেশনও করতে হতে পারে।'

'তা হলে কি হবে?' নমিতা অবাক হয়ে অসিতের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল।

অসিতের মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া। সেও ভয় পেয়েছে বলে মনে হল নমিতার।

নমিতার মনের কথা বুঝতে পেরে অসিত বলল, 'ভয় পাইনি, তবে নিরুপায় বোধ করছি। আর একবার 'রিল্যাপ্স' করলে ঠেকান কঠিন হবে।'

‘রিল্যাপ্স যে কোন সময় করতে পারে ?’

অসিত গম্ভীর হ’য়ে বলল, ‘ভয়ত সেইখানেই।’

নন্দিতা এখন অঘোরে ঘুমুচ্ছে। নমিতা আর উমার জন্য ঐ ঘরেই বিছানা করা হয়েছে। পাশের ঘরে অসিতের। স্বদেশবাবু আর আসেননি। সমস্ত খবর নিয়েই তিনি শুতে গেছেন। নমিতার চিঠি নিয়ে দু’টি ছেলে একটু আগে সাইকেল নিয়ে হোস্টেলে চলে গেছে।

রাত্রিটা ক্রমশঃ গভীর হতে চলেছে। নদীপাড়ের এই রাত্রির কেমন যেন একটা সিক্ত সৌন্দর্য আছে! দূরের গ্রামগুলো ঘুমিয়ে রয়েছে তখন। শুধু মাঝে মাঝে পথের দু-একটা কুকুরের চীৎকার ভেসে আসছে বহুদূর থেকে।

নমিতা তাকিয়ে দেখল, উমা পার্টনারের হাতটা কোলের কাছে টেনে নিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। কেবল নমিতাই জেগে আছে। তার ঘুম আসছে না, কিছুতেই ঘুম আসছে না। কেমন যেন আজ সন্ধ্যার ঘটনাগুলো তার স্নায়ুগুলোকে বিক্ষিপ্ত করে গেছে।

পাশের ঘরেই বোধহয় অসিত ঘুমিয়ে আছে। দরজা খোলা। আলোটা প্রায় নেভানো বলে মনে হয়। নমিতা একবার ভাবল, সে অসিতের কাছে যায় একটু। আস্তে আস্তে এই গভীর রাত্রে একটু নিবিড় হয়ে বসে দু’জনে গল্প করে। অসিত এড়িয়ে যেতে চায় অর্থাৎ ওটা যে কাছে আসতে চাওয়ার বাইরের প্রকাশ, নমিতা সেকথা বুঝতে পারে। না, ছিঃ! নমিতার যেতে নেই। সে একজন হেডমিস্ট্রেস। এই সামান্য ইচ্ছাকে তার দূরে সরিয়ে দেওয়া উচিত।

কিন্তু নমিতা যে নারী! সে হেডমিস্ট্রেস—কিন্তু এ তার বাইরের আবরণ, জীবিকা। সে সর্বোপরি নারী—যে নারী প্রার্থিত পুরুষকে ভালোবেসে পাগল হতে পারে এবং সেইটাই তার সুস্থ মনের পরিচয়। সে ভালোবাসতে পারে, এ যে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, পবিত্র সম্পদ!

নামিতা আস্তে আস্তে উঠে এল।

নিঃশব্দ পায়ে এসেছে নমিতা। তবু অসিত বই থেকে মুখ তুলে তাকালো। না, অসিত ঘুমোয়নি। কি সব বড় বড় বই নিয়ে, আড়াল-দেওয়া আলোয় গভীর মন দিয়ে পড়ছিল অসিত। নমিতাকে ইশারায় বসতে বলল।

'তুমি ঘুমোওনি ?'

নমিতা ক্লান্ত গলায় খুব আস্তে আস্তে বলল, 'না।'

'তুমি কেন ঘুমোওনি ?'

অসিত বলল, 'খুঁজে দেখছি গ্যাসট্রিক আলসারের লেটেস্ট কোন মেডিসিন বেরিয়েছে কিনা।'

নমিতা অবাক হয়ে গেল, বলল, 'পেয়েছ ?'

'না পাইনি।'

'তবে ?'

অসিত বইটা নিঃশব্দে বন্ধ করে খুব আস্তে আস্তে বলল, 'যা পেলাম তা অন্য কিছু।'

নমিতার সারা দেহে রোমাঞ্চ হল। কী এক অনির্বচনীয় আনন্দে বেদনায়, আশঙ্কায় কেঁপে উঠল সে!

২২ ॥

পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন সন্ধ্যাবেলা সদয় দাওয়ায় বসে হুঁকো টানতে টানতে রেখার আল্পনা আঁকা দেখছিল। সেই কবে প্রথম ধান পাকলে ভাল দিন দেখে এক আঁটি ধান কেটে নিয়ে এসে চালের উপর তুলে রেখেছিল সদয়। আজ সেই ধানের আঁটি, গোবর

দিয়ে লেপা উঠোনে নামিয়ে এনে খুঁটির সঙ্গে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। পূজো হবে রাত্রির প্রথম প্রহরে।

সদয় অন্যান্য বছর নিজেই পিঠুলির জল আর কলাগাছের সরু ডাঁটা থেঁতো করে সেই ধান-আঁটির চার ধারে গোল করে ঘর টানত। সেই ঘরের ভেতর ধানের গাদা, গরু, লাঙ্গল আঁকত। এ বছর রেখা নিজেই তা করছে। সদয় অবাক হয়ে দেখছে, রেখার হাতের সেই ঘর টানাটা ছবির মত কেমন সুন্দর হচ্ছে।

তামাক টানতে টানতে সদয় জিজ্ঞেস করল, 'এগুলো কে শিখালো তোকে রে?'

'বলব? আগে বল, ভাল হয়েছে কিনা?'

বুড়ী এসে বসল সদয়ের কাছে। সদয় বলল, 'দেখেছ কি রকম হচ্ছে।'

সদয়ের বৌ সুন্দর করে হাসল। সদয় তামাক খেতে খেতে পরম তৃপ্তিতে খামারের আল্পনাগুলো দেখছিল।

'মা পিঠে নামেনি এখনো?'

পিঠেপুলির দিকে রেখার মন পড়ে আছে, কখন সেদ্ধ হয়ে নামবে।

'তুই আয় না, দুটো হাতে হাতে তৈরি করে দিবি। একলা আর কত বানাব?'

'না মা আমি তৈরী করতে পারব না, দেখছ না আমার কত কাজ!'

উঠোনে অরবিন্দ এসে দাঁড়াল। রেখা চকিতে মুখ তুলে একবার তাকিয়ে, আবার মুখ নিচু করল।

অরবিন্দ সেই স্বল্প আলোয় আল্পনা-আঁকা রেখাকে দেখছিল—যে নিজেই লজ্জায়, আনন্দে, এই উঠোনে পূজোর দিনে, পরিণত ফসলের মত কখন সুন্দর হয়ে উঠেছিল!

হুঁকো রেখে দিয়ে সদয় একগাল হেসে বলল, 'এই মাদুরে এসে বোসো।'

অরবিন্দ মাদুরে বসতে যাচ্ছিল রেখা ডাকল, 'অরবিন্দদা দেখত আল্পনাগুলো কেমন হয়েছে ?'

রেখা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছিল। 'এই ঘরটা দেখেছ ? এই পুকুর, কলাবাগান, উঠোন, পেছনের বাঁশঝাড়।'

সদয় উঠে ভেতরে গেল। পিঠেপুলি হয়ে থাকলে যেন অববিন্দকে দেয়। বেচারা এই উৎসবেব দিনেও ঘব ছেড়ে বিদেশে পড়ে আছে।

অববিন্দ রেখার আল্পনা আঁকার কাছে বসতে বসতে বলল, ঘর, খামার, পুকুর, বাগান সব আঁকলে। কিন্তু ঘরেব মানুষ ত কই আঁকলে না ?'

রেখা হেসে বলল, 'হয়েছে বাবা, হয়েছে। এবার একজন লোক এঁকে দিচ্ছি। তা হলেই ত হল ?'

অরবিন্দ গম্ভীর হয়ে বলল, 'না হল না, ঘর আছে স্ত্রী নেই, তা হয় না। তুমি এক কাজ কর, ঐ লোকটার একপাশে একটি সুন্দর বৌ এঁকে দাও—দেখো যেন মাথায় খুব চুল থাকে, হাত পা যেন নিটোল হয়, মুখ সুন্দর হয়,—'

রেখা কিন্তু লজ্জায় আর কিছু আঁকতে পারলো না।

ঘরের কপাটের ফাঁক দিয়ে উঠোনে কি করে যেন কিছুটা আলো এসে পড়েছে তখন।

লোকটির কথা শুনেই রণজিৎবাবু সাইকেল থেকে নামলেন। অসিতের সঙ্গে একটা জরুরী ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু এঁর কথা শুনেই তাঁর মেজাজটা পাল্টে গেল। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'সে কি, এখনও আপনারা আলুচারা, সার পাননি ?'

বি. ডি. ও. যে এমনভাবে অবাক হবেন সুধীর জানা তা বুঝতে পারেনি। সরল মন নিয়েই কথাটা সে বলেছিল। একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'গ্রামসেবককে বলেছিলাম। উনি বললেন, ওপর থেকে

আসেনি এখনও। আর নাকি দরখাস্ত পিছু পাঁচটা করে টাকা দিতে হবে'।

রণজিৎবাবু মনে মনে ভেবে দেখলেন একটু। হাঁ, আলু চারা, সার, এসব অবশ্য আলুচাষের মরশুম শেষ হলেই সাধারণত আসে। এইটাই নিয়ম। সরকারী কর্মদক্ষতার এগুলি উজ্জ্বল নমুনা ঠিকই!

কিন্তু তিনি বার বার চিঠি লিখে, টেলিগ্রাম করে তদ্বির করে এ বছর ঠিক সময়েই আনিয়েছেন। কিন্তু এতদিন তা বিতরণ করা হয়নি জেনে অত্যন্ত অবাক হলেন তিনি!

দ্রুত সাইকেল ছুটিয়ে রণজিৎবাবু যাচ্ছিলেন। গ্রামসেবকের বাসাটা তাঁকে খুঁজে বের করতে হবে। আশ্চর্য! এইসব সরকারী ষ্টাফ, এই লাল ফিতার ফাঁস, তাঁর সকল চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে, সমস্ত পরিকল্পনার গলা টিপে হত্যা করছে। না অসম্ভব! সরকারী অফিসে কাজ করা অসম্ভব! দেশ গড়ে তোলার পক্ষে এই এডমিনিষ্ট্রেশান সম্পূর্ণ অযোগ্য।

কী একটা যন্ত্রণা তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলছিল! শুধু গ্রাম-সেবকের এই ঘটনা নয়, এ ঘটনা ত সরকারী প্রশাসনের একটা ভগ্নাংশমাত্র। সারা প্রশাসন ব্যবস্থাই তাঁকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে! তিনি কি অধ্যাপনায় ফিরে যাবেন? আবার নতুন করে কি জীবন শুরু করবেন?

সামনে একটা নালা পড়ায় সাইকেল থেকে নামতে হল তাঁকে।

কিন্তু এ নালাটা বন্ধ করতে কতো আর মাটি লাগবে? অথচ গ্রামের লোকের যাতায়াতের অনেক সুবিধা হবে নালাটা বন্ধ করে দিলে! গ্রামের লোক নিজেরা কেন করবে না এটা! তিনি সকলকে বলবেন একদিন। না স্টেট রিলিফ নয়। ওতে মাটি চুরি করেই ফাঁক করে দেবে। উঃ, কী সমাজে বাস করছি আমরা!

সামনে একটা স্কুল ঘর পড়ল। গ্রামের ছেলেরা পড়ছে। বাঃ দরিদ্র ঘরের সঙ্গে দরিদ্র শিশুদের কেমন আশ্চর্য মিলে গেছে!

চালে খড় নেই, খুঁটিগুলো ভেঙে গেছে। ছাত্রদের গায়ে জামা নেই। ছেঁড়া ময়লা নোংরা ছোট ছোট প্যাণ্ট! দুর্ভিক্ষ দিনের মত কঙ্কালসার চেহারা!

স্বাধীন ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নাগরিক তৈরী হচ্চে! রণজিৎবাবু ভাবছিলেন, এদেশের দারিদ্র্য দূর হতে কত হাজার বছর লাগবে?

দুটো গ্রাম পেরিয়ে এসেছেন ইতিমধ্যে। কয়েকটি মেয়ে একটা অগভীর ঘোলা জলের অপরিষ্কার পুকুর থেকে কলসিতে করে জল নিচ্ছিল। রণজিৎবাবু নামলেন।

'একি খাওয়ার জল নিয়ে যাচ্ছ মা?' একজন প্রৌঢ়াকে জিজ্ঞেস করলেন বি. ডি. ও.। মাথায় একগলা ঘোমটা টেনে, প্রৌঢ়া ফিস্ ফিস্ করে কে উত্তর দিল বোঝা গেলনা।

'গ্রামে আর কোন ভাল পুকুর নাই?'

মেয়েটি মাথা নাড়ল।

রণজিৎবাবু নোট বই বের করে গ্রামের নামটা লিখলেন। একটা নলকূপ এ গ্রামে করতেই হবে!

আবার উঠলেন সাইকেলে। বেশী দিন আসেননি তিনি এ অঞ্চলে। তবু এতদিনে সব গ্রামে তাঁর একবার যাওয়া উচিত ছিল।

তাসগুলো লুকোবার আগেই রণজিৎবাবু দাওয়ায় উঠে এসেছিলেন। গ্রামসেবক সত্যেন গাঙ্গুলি ভাবতেই পারেনি যে বি. ডি. ও. এই সকালে তার বাসায় আসতে পারেন! এ একটা অসম্ভব ব্যাপার!

রণজিৎবাবু অবাক হয়ে গ্রামসেবকের আসবাবপত্র দেখছিলেন। কেমন একটা ধাঁধা লাগছিল তাঁর। যে বেতন এ পায়, তাতে এর সিকিভাগ স্ট্যাটাস নিয়েও থাকা যায় না!

সত্যেন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'স্যার এক কাপ চা?'

'না, ধন্যবাদ। চা খেতে আমি আসিনি। আপনি আজ একটার

আগে অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।' রণজিৎবাবু আর কিছু না বলে সাইকেলে উঠলেন।

বেশ সেজে গুজে ট্রাউজার হাওয়াই সার্ট চড়িয়ে, ডান হাতে ঘড়ি বেঁধে অফিসে এসে পৌছল সত্যেন। কিন্তু কেন যেন তার বড় ভয়-ভয় করছিল আজ। এ বি. ডি. ও.র সামনে সে, দু'একদিনের বেশী যায়নি। ইতস্ততঃ করতে করতে ঘরে ঢুকল সত্যেন।

রণজিৎবাবু একবার তাকালেন। 'বসুন'।

একটা ফাইল খুললেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন, 'এ অঞ্চলে আলু চারা কখন লাগায় জানেন?'

সত্যেনের গলা শুকিয়ে আসছিল। বলল, 'এই আষাঢ়-শ্রাবণ মাস নাগাদ। ঠিক বলতে পারছিনা, স্যার!'

'ক'দিন এসেছেন এ ব্লকে?'

'মাস ছয়েক হবে।'

'হুঁ। হরিশপুর গ্রামের চাষীরা চারা, সার পায়নি কেন?'

সত্যেন কিছু বলতে পারল না।

'আপনি দরখাস্তের সঙ্গে টাকা চেয়েছিলেন?' বি. ডি. ও.র গলা বড় গম্ভীর।

সত্যেন তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'না, স্যার ঠিক, মানে....'

'মানে যা বোঝার আমি ঠিক বুঝেছি'—রণজিৎবাবু বললেন।

'আপনার রিপোর্টগুলো দেখলাম। এসব আমি বিশ্বাস করিনা! ফাইলে নোট দিলেই চাষ বাড়বে, ফসল বেশী হবে—ওসব সাহেবী কায়দা আমার জন্যে নয়। আলুচারা কোন্ সময় লাগায়—এ কথা যিনি জানেন না, আমার ব্লকে তাঁর স্থান হবে না। ঘুষ নেওয়াও চলবে না আমার ব্লকে। একটা 'নোটসীট' টেনে নিলেন রণজিৎবাবু।

সত্যেন আর বসে থাকতে সাহস পেল না!

॥ ২৩ ॥

সদয় রেখার বিয়ে স্থির করে ফেলেছে।

রসময় পাত্রী দেখতে আসেনি। কারণ পাত্রী তার আগে থেকেই দেখা আছে। আর রেখাকে দেখাব পর থেকে আর কোন মেয়ে তার নজবে লাগছে না। বি. ডি. ও. অফিসের জীপে চড়ে ঘুরে বেড়ানো আধুনিকাদের দেখে দেখে আর যাই হোক তার চোখটা তৈরী হয়েছে। তা রেখা বড়সড় হয়েছে, সুন্দর করে ঘুরিয়ে শাড়ী পরতে শিখেছে, শিখেছে নানানভাবে কবরী বাঁধতে আর চটি পায়ে দিয়ে নির্ভয়ে হেঁটে যেতে। রসময়ের মতে এ একটা রীতিমত প্রগতি।

আগামী কালই বিয়ে। কিন্তু মরে গেলেও রেখা রসময়কে বিয়ে কববে না।

রেখা অনেক চিন্তা করে স্থিব কবল, আজ রাত্রেই সে একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলবে। তার বারবার অরবিন্দদার কথা মনে পড়ছিল। এমন করে আর কোনোদিন মনে পড়েনি ওকে। সেই বর্ষার রাত্রে, সেই বন্যার গল্প বলার দিন অরবিন্দ তাদেব বাড়ীতেই থেকে গিয়েছিল। রেখার ভালোলাগে তাকে, সে-ই রেখার পড়ার ব্যবস্থা করেছিল বাবাকে বলে। অরবিন্দেরও রেখাকে ভালো-লাগে, সে বুঝতে পারে। ভালো লাগার আনন্দ কখনও কি গোপন থাকে? রাত্রে শোবার সময় রেখা যখন তার মশারিটা লেপের মধ্যে গুঁজে দিতে গিয়েছিল, তখন রেখা ঘেমে উঠেছিল, সারা শরীর কাঁপছিল তার। কিন্তু সে তবু সরে আসেনি। কি করে যেন এই মৃদু আকর্ষণটুকু ভাল লাগছিল তার।

অরবিন্দদার সেই দেশের কথা, রেখা কতবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করছে। সেই ঢেউ-খেলানো বিরাট মাঠ, শালবন, ছোট

ছোট পাহাড়, রাঙা মাটির পথ, বাবা, মা। সে কতবার স্বপ্নে দেখেছে, কতবার সে দেশের ধুলোয় তার কাপড় রাঙিয়েছে রেখা।

রেখা দ্রুত চলছিল। এখন নদীতে জোয়ার! কবরখানার কিছুটা ডুবে গেছে জলে। অন্ধকার পেরিয়ে পূর্বদিগন্তে ভোরের আলোর পূর্বাভাস দেখা দিচ্ছে। শুকতারা নিভে গেছে। রেখা চলেছে, অতীতের অন্ধকার ঠেলে,—সে চলেছে আলোর দিকে, মুক্ত জীবনের দিকে। নীলাপুরের পারিপার্শ্বিকের শত শত বছরের প্রচলিত প্রথাকে অতিক্রম করে, রেখা নতুন বিপ্লব আনছে !

এক সময় মাঠ থেকে, নদীতীর থেকে, শ্মশানের মাটি থেকে, বাবলা বন থেকে, আলোর দূত সব অন্ধকার দূর করে দিল। এখন সূর্যোদয় হচ্ছে। রক্তবর্ণ সূর্য উঠছে আকাশে, নতুন জনপদে।

ভোর থেকে উঠে অসিত বাগানে একটু পায়চারি করছিল। হলুদরঙের শাড়ি পরা একটি মেয়ে এসে তাকে প্রণাম করল।

অসিতের মনে হল মেয়েটিকে সে কোথায় যেন দেখেছে। হাঁ, মহেন্দ্র কাকার মৃত্যুর দিনে।

'আমি রেখা, নীলাপুর স্কুলে পড়তাম। নমিতাদির ছাত্রী।'

কাপড় দেখে তার মনে হল, যেন মেয়েটি বিয়ের কনে। অসিত আরও অবাক হতে লাগল !

'আমাকে একটু আশ্রয় দিতে হবে অসিতদা।' রেখা মুখ নিচু করে বলল।

'আশ্রয় ?' অসিত কিছু বুঝতে পারল না।

'আমি পালিয়ে এসেছি বাড়ী থেকে। বাবা জোর করে এক বখাটে ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চান। আমি মরব তবু তাকে বিয়ে করতে পারব না।' বলতে বলতে রেখার কান্না পাচ্ছিল।

একটু সময় অসিত স্তব্ধ হয়ে রইল তারপর হঠাৎ একটা উচ্চহাস্যে উঠোন ভরে গেল। অসিত বলল, 'তাই বল্‌? ওই হতভাগা

অরবিন্দের জন্য পালিয়ে এসেছিস্। ঠিক করেছিস্। আরে, যাকে ভালোবাসবি তার গলায়ই মালা দিবি। নিশ্চয়ই দিবি। একশ'বার দিবি।'

ভোরের আলোর মত নির্মল আনন্দে অসিতের মনটা ভরে উঠল।

রেখা অনেকটা সহজ হয়েছে এখন। আর তার ভয় নেই। সে নিশ্চিত আশ্রয়ে এসে পড়েছে।

রেখা বলল, 'অসিতদা, ওরা, মানে রসময়রা, যদি গণ্ডগোল করে? যদি জোর করে ধরে নিয়ে যেতে চায় আমাকে?'

অসিত আবার হেসে উঠল। বলল, 'তাহলে তোর অসিতদা আছে কি করতে?'

এই পথটা তেমন বেশী নয় কিন্তু জোরে সাইকেল চালিয়েও যেন আজ তা শেষ হতে চাইছে না। অরবিন্দের জন্য কতবড় সুখবর অপেক্ষা করে আছে, সে নিজেই জানে না! অসিত যেতে যেতে ভাবছিল।

স্টোভ জ্বালিয়ে চা করছিল অরবিন্দ। অসিত সাইকেলটা রেখেই বলে উঠল, 'ওঠো!'

অরবিন্দ অবাক!

'কোথা যাব?'

'না, আদৌ সময় নেই, ওঠো।'

'কোথায় যাব বলবেন ত? অফিসের কাজ আছে আমার!'

'আজ তার চেয়েও জরুরী কাজ আছে তোমার।'

'দাঁড়ান, আপনাকে এক কাপ চা করে দি।'

'না দরকার নেই, জামা পরে নাও।'

অরবিন্দ কিছু বুঝতে পারছে না। তবু জামা পরে এসে দাঁড়াল।

অরবিন্দ সামনে বসতেই অসিত লাফিয়ে উঠল সাইকেলে।

বাড়ী পৌঁছে অসিত বলল, 'দেখত একে চিন্‌তে পার কিনা?'

অরবিন্দ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল রেখার দিকে। তার যেন

ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। গায়েহলুদের পোশাকে রেখা স্থির নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারই সামনে মুখ নত করে।

মাথায় হাত দিয়ে দাওয়ায় বসেছিল সদয়। চারদিকে একটা বিষণ্ণ পরিবেশ। এ দুঃখের কথা সে কাউকে বলতে পারছে না, বিয়ের কনে ঘর থেকে পালিয়ে গেছে। আবার এক আশঙ্কায় বুক ভরে আসে তার, যদি মেয়েটা জলে ডুবে মরে, কি গলায় ফাঁস দেয়? ক'দিন থেকে কেবল মুখ শুকানো করে ঘুরছিল। বৌও বলছিল বিয়ে ভেঙ্গে দিতে। তা সে দেয়নি। এখন বুঝছে, দিলেই ভাল হত।

ডাক্তাব বাবুকে আসতে দেখে সদয় আরও ভয় পেয়ে গেল। তাহলে ডাক্তারবাবু কি কোন খবর দিতে আসছে?

বিয়েব মন্ত্র পড়ছে দুজনে—বেখা আর অরবিন্দ। সদয় তার ?ৌ মনে মনে খুশি হয়েছে এমন বর পেয়ে। তা নাই বা হল এক জাতের। মেয়েও খুশী হয়েছে। এই ত মন্ত্র পড়তে গিয়ে রেখা লজ্জায় আনন্দে রাঙা হয়ে উঠেছে! দেখে দেখে আনন্দে চোখে জল আসে সদয়ের।

এমন সময় বাইরে থেকে গণ্ডগোলের শব্দ এল।

কারা যেন উঠোনে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করছে। বিয়ে নষ্ট করে দিতে চাইছে। বাইরে যারা ছিল, তারা অনুরোধ করছে, গণ্ডগোল না করে চলে যেতে।

কিন্তু রসময় অত বেরসিক নয়। খবর পেয়ে লাঠিসোঁটা নিয়ে সদলবলে এসে গেছে। তাড়ি টেনেই এসেছে। হ্যাঁ, প্রতিশোধ তারা নেবেই। এ অপমান রসময় সহ্য করবে না, বাপের জন্মে রসময় কক্ষনো কারুর কোন অপমান সহ্য করেনি।

সদয় এসে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে বললা 'বাবা আমার ঘাট হয়েছে। বিয়ে হয়ে যাক, যা দণ্ড লাগে দেব। কি করব, মেয়ে যে বিয়ে করতে চাইল না।'

একজন সাকরেদ বলে উঠল, 'ওসব ফেরেপ্পা-বাজি চলবে না।'

সদয় মনে মনে কেবল ভগবানকে ডাকছে, বিয়েটা হয়ে যাক। তাবপর যা হয় হবে। কিন্তু ডাক্তারবাবু আসছে না কেন? ডাক্তার বাবু ত বলেছেন, তিনিই সব সামলাবেন।

দেখতে দেখতে প্রায় একটা দাঙ্গা বাধার উপক্রম হল। আত্মীয় পাডাপড়শীরা এতক্ষণ অনুবোধ উপরোধ করছিল। কিন্তু সব অনুবোধ ব্যর্থ হওয়ায়, পাড়ার দু-একজন ছোকবা—তাবাও লাঠি নিয়ে এসে রুখে দাঁড়াল। বিয়েবাডীব মেয়ে নিয়ে পালাবে? ইয়ার্কি পেযেছ! গাঁয়ের সম্মান রাখতে হবে না? চারিদিকে হৈ হৈ চীৎকাব গালাগালিতে বিয়েবাড়ীব বাতাস ছেয়ে গেল।

বসময় বলে উঠল, 'চালাও শালা। লাগাও কুরুক্ষেত্র। হয়ে যাক দ্রৌপদী হবণ।'

'এ্যাই রসময়! খববদার।'

'চোপরাও শালা।'

'মুখ সামলে কথা বলিস্ কিন্তু?'

'কেন কি করবি?'

'মেরে লাস বানিয়ে ছেড়ে দেব?'

রসময়ের এক সাকরেদ লাঠি নিয়ে দৌড়ে গেল।

'তরে রে শালা * *।'

হঠাৎ উঠোনে সাইকেলের ঘন্টির শব্দ পাওয়া গেল। সকলে ঘুরে তাকাল সেদিকে। অসিত নামল সাইকেল থেকে। নেমেই জিজ্ঞেস করল, 'কি, এত গণ্ডগোল কেন?'

উত্তরটা কেউ দিল না। হঠাৎ রসময়ের দিকে নজর পড়ল অসিতের।

রসময় বিনয়ে গলে গিয়ে বলল, 'এই যে ডাক্তারবাবু, নমস্কার। তা কেমন বিচার দেখুন তো। আমার সঙ্গে বিয়ে দেবে বলে এখন অন্য বর এনে জুড়ে দিয়েছে। বিচারটা দেখুন একবার! বলুন, এ অপমান করা না?'

'দিয়েই যখন ফেলেছে রসময়, তখন রেখা তো অন্য লোকের স্ত্রী। নয় কি? তুমিই বল?'

'হাঁ, ঠিক কথা ডাক্তারবাবু?'

'অন্য লোকের স্ত্রীকে নিয়ে কি এসব বিশ্রী কাজ করা ভাল?'

'না ডাক্তারবাবু, তা ভাল নয়।'

'তবে গণ্ডগোল করো না। বিয়েবাড়িতে এসেছ, খেয়ে দেয়ে চলে যাও। ব্যস, ফুরিয়ে গেল।'

সারা আবহাওয়াটা যেন শান্ত হয়ে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যে।

রসময়ের এক বন্ধু একটু তড়পাচ্ছিল। আর একজন তাকে টেনে নিয়ে বলল, 'গায়ের জোর দেখাসনে ফট্‌কে। ডাক্তারবাবুর এক ঘুঁষিতে তোর মাথার মত তিনটে মাথা শালা ছাতু হয়ে যাবে!'

খেয়ে দেয়ে যাবার সময় রসময় হঠাৎ এককাণ্ড করে বসল। বিয়ের যেসব কাপড়-চোপড় নিয়ে এসেছিল, তা থেকে একটা ভাল শাড়ি বের করে নিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে বলল, 'বৌদিকে এ শাড়িটা প্রেজেণ্টেস্যান দিয়ে দেবেন, ডাক্তারবাবু।'

অসিত বলল, 'বাঃ, আমি কেন, তুমি নিজে দিয়ে যাও! এসো আমার সঙ্গে'।'

অসিত রসময়কে নিয়ে এল বরবধূর কাছে। অরবিন্দ আর রেখা তখন বসে আছে। সলজ্জ রেখাকে দেখে রসময় স্তব্ধ হয়ে গেল। কোন রকম করে শাড়িটা রেখে নমস্কার করে বাইরে চলে এল সে।

আশ্চর্য! অসিত দেখল, সেই উদ্ধত রসময়ের চোখের কোণে জল ছল্‌ছল্‌ করে উঠছে!

॥ ২৪ ॥

হাঁ, তাগদ আছে বি. ডি. ও. রণজিৎবাবুর।

খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে নীলাপুরে আর তার চারপাশের গ্রামে। বি. ডি. ও. রণজিৎবাবু ওপরে লিখেছেন, এই মরানদীটাকে সংস্কার করতে হবে। করলে হাজার হাজার একর জমিতে দু'বার ফসল ফলবে। নদীর পারে মাঝে মাঝে কংক্রীটের স্লুইশ বসিয়ে মাঠে জল নেওয়া চলবে। সমুদ্রের সঙ্গে তখন যোগাযোগ সহজ হবে, ব্যবসা-বাণিজ্য আবাব গড়ে উঠবে, মরানদীব তীরের গ্রামগুলো জাগবে।

ওপরে রণজিৎবাবু লিখেছেন। এনকোয়ারী এলো বলে। গ্রামে গ্রামে রটে গেছে,—এই রোগা, খদ্দর-পরা. শ্যামল রঙের যুবকটিব নাকি অসাধ্য কিছু নেই।

আর পড়াশুনা? কি করে পাশের সব গাঁয়ের লোক জেনেছে সারা পৃথিবীর ইতিহাসটা নাকি রণজিৎবাবুর নখদর্পণে। কোথায় কোন্ দেশ, কি করে উন্নতি করেছে, কোন্ দেশের ছাত্ররা নিজেরাই রেল লাইন তৈরি করেছে, খাল খুঁড়েছে, নদীর মাটি কেটেছে, কোন্ দেশে মরুভূমির ভেতর দিয়ে খাল তৈরি করে গোটা মরুভূমিটাই উর্বর চাষের জমি করে ফেলেছে। সব জানেন ভদ্রলোক! রণজিৎবাবু বলেছেন, বলেছেন গ্রামের ছেলেদের।

নীলাপুরের জীবনে এখন পালাবদলের ইতিহাস।

তবু রণজিৎবাবুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। ওঁকে না সরালে কেরাণীদের, কি গ্রাম সেবকসেবিকাদের, কি উঠতি দালালদের, আদৌ সুবিধে হচ্ছে না। সব মারা পড়বে কাজ করতে করতে। যদি এত কাজ করতে হবে, তবে সরকারী চাকরীতে আসা কেন রে বাপু!

সওদাগরী অফিসের চাকুরী করা ভাল। তাছাড়া নানান অসুবিধা দেখা দিচ্ছে রণজিৎবাবুকে নিয়ে। উপরি নেওয়া ত ডকে উঠে গেছে।

বেসিক স্কুলের একটা ঘরে স্বদেশবাবু চুপচাপ বসেছিলেন। একটু আগে রণজিৎ এসেছিল। বলেছিল, তার বিরুদ্ধে অনেক বেনামী চিঠি কমিশনারের কাছে গেছে। সেসব বড় কঠিন অভিযোগ। রণজিৎ একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বড় বেশী যুক্ত হয়ে পড়েছে। অবিবাহিত রণজিৎ নাকি রাত্রে গার্লস স্কুলের এক মিস্ট্রেসের সঙ্গে অন্যত্র কাটায়।

এই নিয়ে নীলাপুর ব্লক অফিসে, বাজারে কারা সব পোস্টারও লাগিয়ে গেছে। সরকারী অফিসার হিসেবে এগুলি অবশ্যই সাংঘাতিক অভিযোগ।

স্বদেশবাবু জিজ্ঞেস করছিলেন—'এখন তুমি কি করবে?'

হাসতে হাসতে রণজিৎ বলল, 'মিথ্যার কাছে মাথা নোয়াব কেন? আমি সব অভিযোগের উত্তর দিয়েছি ডিপার্টমেণ্টকে। জানিয়েছি, এ ব্যাপারে যে কোন রকম তদন্তের জন্য আমি প্রস্তুত। এবং সত্য উদ্ঘাটনের জন্য এই তদন্ত হওয়াই উচিত। আর দেখুন, আমি আমার কাজ করে যাব। সত্যিকারের কাজ করতে গেলে এসব বাধা আসবেই। এ বাধা আমি পেরিয়ে যাব। এখন অনেক কাজ! এই মরানদীটা আমি কাটাতে চাই।'

স্বদেশবাবু ভাবছিলেন, পড়াশোনা—সাহস, সততা, বুদ্ধি কর্তব্যবোধ। এই ছেলেই ত স্বাধীন ভারতবর্ষের যৌবনের প্রতিনিধি। স্বদেশবাবু ভাবলেন মন্ত্রী কুঞ্জবাবুকে তিনি লিখবেন। তিনি যদি সত্যের খাতিরে ছেলেটিকে কিছু সাহায্য করতে পারেন। আর এ অঞ্চলের তাতে অনেক উপকার হবে। হ্যাঁ, আজই লিখবেন তিনি।

একটু পরে একটি ছেলের সঙ্গে নিশিকান্তবাবু ঘরে এসে ঢুকলেন।

'আসুন, আসুন।' স্বদেশবাবু উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলেন অতিথিকে।

'তা কেমন আছেন, সব ভালত? নিশিকান্তবাবু বসতে বসতে বললেন,

'হাঁ এক রকম ভালই। দিন চলে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছি মৃত্যুর দিকে।' স্বদেশবাবু ধীরে ধীরে বললেন।

অনুকূল হাওয়া বুঝে এক সময় নিশিকান্তবাবু স্বদেশবাবুর কাছে সরে এসে কথাটা পাড়লেন। বললেন, 'আপনার কাছে বড় দরকারী কাজে এসেছিলাম। অভয় দেন ত বলি।'

স্বদেশবাবু বললেন—'না না, নির্ভয়ে বলুন।'

নিশিকান্তবাবু অসিতের সঙ্গে নীলার বিয়ের প্রস্তাবটা তুললেন।

স্বদেশবাবু কিছুক্ষণ কি ভাবলেন। তারপব বললেন, 'এর উত্তর যে আমি দিতে পারছি না নিশিকান্তবাবু। ছেলেকে আমি সেভাবে তৈরি করিনি! ছেলে তার যোগ্য সঙ্গিনী বেছে নেবে। যদি বেঁচে থাকি, তাকেই আমি মেয়ের মত মেনে নেব। কিন্তু সঙ্গিনী বাছবাব ভার তার যে একেবারে নিজের!'

'তা, আপনি বাবা, আপনি বৌমা ঠিক করবেন না?'

'না। কালটা পাল্টে গেছে নিশিকান্তবাবু। এবং ঠিক পথেই পাল্টেছে। সত্যি ত, ছেলে যোগ্য হয়েছে। আমি কেন তার কাজে হাত দেব। আপনি এক কাজ করুন, খোকাকেই বলুন।'

নিশিকান্তবাবু আবার বললেন, 'টাকা পয়সা আমি যথেষ্ট দেব। শুনেছি ছেলে বিদেশে পড়তে যেতে চায়। পাঠিয়ে দিন। যতটাকা লাগুক, বুঝলেন কিনা, সব আমি দেব। আর, আমার ছেলেই বলুন মেয়েই বলুন, ঐ মাত্র একটি। নিজের মুখে বলতে শোভা পায় না—মেয়ে আমার সত্যি সুন্দরী, এবার স্কুল ফাইন্যাল দেবে।'

স্বদেশবাবু তেমনি স্থির হয়ে বসে রইলেন।

উঠোন থেকে রোদ মুছে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

নিশিকান্তবাবু সরবৎ খেতে খেতে একসময় ফিস্ ফিস্ করে

বললেন—'প্রস্তাবটা আপনি করুন না। তাহলে আমার পক্ষে সুবিধে হয়। অসিতবাবুকে যতদূর জানি, তিনি আপনার কথা অমান্য করবেন না।'

স্বদেশবাবু শান্ত গলায় বললেন—'আমার দিক থেকে বলাটা খানিকটা আদেশের মত হয়। যেন আমি চাই, এইটিই বুঝায়। একটু ভেবে দেখুন। এটা ছেলের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'আপনার নয় কেন?'

স্বদেশবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'না না, আমার নয়। ছেলে কাকে নিয়ে জীবনে সুখী হবে তা সেই বেছে নেবে। তা বাছবার যোগ্যতা আমার নেই।'

'তাহলে কি যা শোনা যায় সত্য?' চালটা ব্যর্থ হওয়ায় নিশিকান্তবাবুর গলার স্বরটা একটু রূঢ় হয়ে উঠল।

স্বদেশবাবু চম্‌কে তাকালেন—'কি শোনা যায়?'

'নীলাপুরের হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে নাকি আপনার ছেলের,···· এই কি বলে?····'

স্বদেশবাবু মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেন। তাঁর আত্মসম্মানে আঘাত করল কথাটা। তবু শান্তভাবে তিনি বললেন—'যা আপনি শুনেছেন তা হয়ত সত্য, হয়ত সত্য নয়। কিন্তু সত্য মিথ্যায় আমার কিছু যায় আসে না, নিশিকান্তবাবু।'

তারপর একটু থেমে আবার বললেন, 'তাহলে শুনুন। আপনাকে আর একটু অনুরোধ করব—এখন ছেলের কাছে আর এ প্রস্তাব নিয়ে না যাওয়াই ভাল।'

ক্ষুণ্ণ মনে নিশিকান্তবাবু উঠে গেলেন।

ডিসেম্বর মাস শেষ হয়ে আসছে। নমিতা সেদিন অফিস ঘরে বসে বসে খাতা-পত্তর দেখছিল। আর ক্লাশ নাইনের নতুন বুকলিস্টটা তৈরি করবার চেষ্টা করছিল। নন্দিতার অসুখের জন্য স্কুলের অনেক কাজ জমে আছে।

গৌরীশংকর আর বাসন্তী ঘরে ঢুকল। নমিতা হাসতে হাসতে বলল—'কি খবর দুজনের?'

গৌরীশংকরবাবু বললেন, 'একটা অনুরোধ ছিল।'

নমিতা এই ধরনের ভূমিকার জন্য প্রস্তুত ছিল না। বলল, 'কি? ছুটি চাই? ছুটি পাওনা থাকলে নিশ্চয় নেবেন।'

বাসন্তী বলল 'ছুটিটা বড় বেশি দিনের।'

'কদ্দিনের জন্যে?'

বাসন্তী মুখ নিচু করে বলল, 'আমরা এ স্কুল থেকে চলে যাচ্ছি।' যাচ্ছি শব্দটায় নমিতা বুঝতে পারল, এদের যাবার সব আয়োজন শেষ হয়েছে।

নমিতা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ কি কথা ভেবে শুভ্র হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বাঃ বেশ লাগছে। ওরা নতুন করে নির্ভয়ে সংসার পাতবে। সেখানে নমিতা নেই যাকে এড়িয়ে চলতে হবে। ওরা দু'জনে বড় কাছে আসবে। বাসন্তী প্রাণ ভরে অসুস্থ গৌরীশংকরবাবুর সেবা করবে। ওদের ছেলে মেয়ে হবে। দুষ্টু ছেলেগুলো উঠোনের গন্ধরাজের পাতা ছিঁড়বে, ফুল ছিঁড়বে।

গৌরীশংকরবাবু পদত্যাগপত্রটা এগিয়ে ধরলেন।

নমিতা চিঠিটা নিতে নিতে বাসন্তীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাকে খুব ভাল লাগছে দেখতে আজ। এখন ত আর আমি হেডমিসট্রেস নই; আমি নমিতা দি। কেমন?'

বাসন্তীর বড় লজ্জা করল। বলল, 'আপনি খুব ভাল নমিতাদি। আমি কক্ষনো আপনার ওপর রাগ করিনি। আর হেডমিসট্রেসের কাজ করতে হলেই একটু কঠিন, একটু কঠোর হতেই হয়। আর দেখুন, উনি দীঘার কাছে একটা স্কুলে চান্স পেয়েছেন। শরীরটা ত ভাল নয়। ওখানকার ক্লাইমেট ওঁর পক্ষে ভাল হবে।'

নমিতা বলল, 'এটা আমি কমিটিতে প্লেস করে 'এ্যাকসেপ্ট' করিয়ে দেব। কিচ্ছু ভেব না। নতুন সংসার পাতবে তোমরা, আর দিদি হয়ে আমি এইটুকু করতে পারব না?'

ওরা ছ'জনে খুশি হয়ে চলে গেল। স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। নমিতা এখন একা ঘরে বসে আছে। আর হাতে কাজ পড়ছে না। নমিতা ভাবছে, ভাবতে গিয়ে তার ভাল লাগছে এবং কোথায় সে একটা বিষণ্ণতার আভাস পাচ্ছে। বেলা শেষ হবার আগে ওরা বাসা বাঁধবে। সেই দীঘার কাছে, সেই সমুদ্রের কাছেই ওদের নতুন ঠিকানা। বাসন্তী আর চাকরী করবে না। ওরা তখন নতুন জীবনের যাত্রী।

বিছানায় শুয়ে আছে নন্দিতা। বড় ক্লান্ত, শীর্ণ। যেন বিছানার সঙ্গে মিশে আছে সাদা শরীরটা।

এখন শেষ বিকেল। শীত পড়ছে। তবু জানালাটা খুলে দিল পার্টনার। নন্দিতা ম্লান চোখ মেলে দেখল, নদীতে বাবলা বনে আলো নিভছে।

এক সময় বলে উঠল, 'এই একরকম ভাল হয়েছে পার্টনার— কলকাতা যেতে হবে না।'

উমা বিছানাটা ঠিক করতে করতে বলল, 'খুব ভাল কথা। গেলে ভাল হয়ে যাবি যে।'

'নারে, ভাল আমি হব না। আচ্ছা পার্টনার?'

'কি বলছিস?'

'আমার তানপুরাটার বোধ হয় তার নেই?'

'তানপুরা আবার কি হবে?'

'একটু বাজাতাম। না, না, গান গাওয়া আমার ফুরিয়ে গেছে। ফুরিয়ে গেছে সেই কবে থেকে! শুধু সুরে বেঁধে একবার বাজাতাম। বড় ভালো লাগে। ঠিক সুরে বাঁধলে, তানপুরার সুর বড় ভালো লাগে শুনতে!'

উমা তানপুরাটা দেয়াল থেকে নামিয়ে এনে কভারটা খুলে ফেলল। সত্যি ছ'টো তার ছেঁড়া।

'কতদিন বাজাইনি। আচ্ছা তার পাওয়া যাবে না এখানে?'

'এখানে কোথায় পাবি! দেখি আনাতে পারি কিনা। কাল কাঁথি যাচ্ছে একজন। তাকে আনতে বলব।'

'তাই বলিস। তুই একটু ছেঁড়া তার হাতে দে। ঐ তারটা দেখালেই দোকানদার কত নম্বরের তার বুঝতে পারবে।'

উমা তানপুরাটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে এল।

'তুই এখানে একটু কাছে বস না?'

উমা সরে এসে নন্দিতার খুব কাছে বসল।

নদীতে ওখন ছায়া ঘন হয়ে উঠছে। একটা নৌকো পাল তুলে ভাটায় ধীরে ধীরে চলে গেল।

'পার্টনার, আচ্ছা, কতদিন তোর সঙ্গে কাটালাম বল ত?'

উমা নীচু গলায় বলল, 'সেই বহরমপুরে, ফার্স্ট ইয়ার থেকে।'

নন্দিতা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'কি করে যেন জীবন জড়িয়ে যায় রে। ভাবি, ভাবতে আশ্চর্য লাগে, যার সঙ্গে কোন যোগ নেই, সেই সবচেয়ে আপন হয়ে ওঠে। তাকে ছেড়ে চলে যেতে সবচেয়ে কষ্ট হয়।'

নন্দিতা বড় আস্তে আস্তে কথাগুলো বলছিল। আর উমার মনে হচ্ছিল সবগুলো শব্দ যেন চোখের জলে ভিজে উঠছে।

নন্দিতা আবার বলতে লাগল, 'তুই কত ভালবেসেছিস, কত সেবা করেছিস। আর অসিতদা? কোন জন্মে ও সত্যি আমার দাদা ছিল। ওর একটু সেবা করতে কেন যেন খুব ইচ্ছা করে আমার! তোরা এসব কেন করেছিস, আমি জানি না। আর তোর হাতে আমার অগোছাল জীবনটাকে তুলে দিয়েই আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। এবার তোর একা চলার দিন।'

উমা নন্দিতার ক্লান্ত চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া অশ্রুটুকু নিজের হাতে মুছে দিল।

নন্দিতা সেই থেকে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। কী সুদূর ধূসরতা সারা ক্ষেতের বুকে শুয়ে আছে!

একটি স্তব্ধ সন্ধ্যা এখন উঠান পেরিয়ে ঘরে আসছে।

অনেকক্ষণ পরে নন্দিতা বলল, 'আচ্ছা পার্টনার, তোর সেই সন্ন্যাসীকে মনে পড়ে?'

'সেই সন্ন্যাসীর কথা আবার কেন বলছিস?'

'আমার খুব মনে পড়ে। দূর থেকে যেন তাঁকে যেতে দেখি, তিনি যেন চলে যাচ্ছেন, এই উঁচু লোনামাটির পথটা দিয়ে। আর হয়ত দেখা হবে না। 'যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু, এবার এ জীবনে, তবে তোমায় আমি পাইনি যেন সে কথা রয় মনে।' সেই-টুকুই যেন মনে থাকে, শুধু সেইটুকুই, সেইটুকুই!'

পাশ ফিরে শুতে শুতে নন্দিতা আবার বলল, 'এখন রাত কত হল পার্টনার? ও সাতটা। 'হে সখা, মম হৃদয়ে রহ', কি রাগ মনে পড়ছে না এখন। হাঁ, ছায়ানট, ছায়ানট। পার্টনার, তানপুরার তারের কথা মনে আছে?'

অসিত, নমিতা দু'জনে ঘরে ঢুকলো।

নন্দিতা বহু কষ্টে পাশ ফিরে শুতে শুতে বলল, 'অসিতদা এলে এত ভালো লাগে। জানো পার্টনার, আমার মনে হয় আমি ভাল হয়ে যাব। কত বড় ডাক্তার আর আমি ভাল হব না?'

নমিতা অসিতের মুখের দিকে তাকাল। কি একটা গভীর চিন্তা সেখানে মেঘের মত থম্‌থম্‌ করছে।

'আজ ইন্‌জেক্‌শান দেবে না?' নন্দিতার ডাকে চমক ভাঙল অসিতের।

চিন্তিত অসিত বলল, 'না, ব্লাড্‌ আনতে দিয়েছি। কাল আসব আবার।'

'ঠিক আসবে? অনেকক্ষণ থাকবে কিন্তু?'

অসিত উঠান পেরিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল।

॥ ২৫ ॥

নীলা বাড়ী গিয়ে সব শুনল মার কাছ থেকে। শুনল, যেমন করে আসামী তার মৃত্যুদণ্ড শোনে!

নিশিকান্তবাবু স্বদেশবাবুর বারণ সত্ত্বেও অসিতের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। নীলাকে অসিত প্রত্যাখ্যান করবে, করতে পারে—এ আশঙ্কা নিশিকান্তবাবুর মনে হয়নি তাই আঘাতটা বড্ড বেশী বেজেছে।

কিন্তু নীলা মনে মনে যে মন্দির গড়েছিল. সে মন্দির তার ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। অনেক অন্ধকারের মধ্যে, সে একটি মাটির প্রদীপের আলো জ্বেলেছিল, সে আলো তার প্রথম ভালোবাসার আলো।

সারা রাত বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেঁদেছে সে। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় নিজের মৃত্যু কামনা করেছে বার বার।

জগত বড় জটিল, বড় কঠিন—এ সত্য নীলা বুঝতে পারেনি। তার সরল কিশোর মন, সে মন প্রেমের বিচিত্র বর্ণ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ।

নীলা কেঁদেছে। কেবল কেঁদেছে. তার প্রথম যৌবনের প্রথম ভালোবাসার ব্যর্থতার কান্না!

জীবনে অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। নীলারও তাই ঘটল, কয়েকদিন পরেই খুব সকালে, হোস্টেলে বেরোবার আগে। তার সেই ফাজিল বন্ধু অশ্রু হঠাৎ তার বাড়ীতে এসে হাজির।

নীলা আশ্চর্য হয়ে বলল, 'কিরে তুই এদ্দিন স্কুলে যাসনি কেন?'

নীলাকে ঘরে টেনে নিয়ে অশ্রু বলল—'আমার বড় বিপদ ভাই। তুই কেবল আমাকে বাঁচাতে পারিস। বল্ বাঁচাবি আমায়। কথা দে আমাকে।'

সবচেয়ে ফাজিল, সবচেয়ে গোপন সংবাদসন্ধানী সেই অশ্রু, আজ নীলার হাত ধরে অনুরোধ করছে।

অশ্রুর বিচিত্র জীবনকাহিনী শুনতে শুনতে নীলা বারবার চমকে উঠেছিল। অশ্রুর কাহিনী—সে এক কলঙ্কিত অধ্যায়।

অনেক দ্বিধাসংকোচ কাটিয়ে অশ্রু বলল, 'তুই শুনে থাকবি, হাইস্কুলের সেই ছেলেটির সঙ্গে আমার ভাব ছিল। আমরা চিঠিপত্র লিখতাম। কখন-সখন দেখা হত স্কুল থেকে যাবার সময়। এমনি করে পরিচয়টা ঘন হল। সে তখন বাড়ীতে আসত। আমরা গল্প করতাম। মা বাধা দিত না।'

'তা শোন। এমনি করে চলতে চলতে, একদিন সন্ধ্যায় মা বাড়ী ছিল না! ও গল্প করছিল। না, নামটা তুই জানতে চাস্‌নে ভাই। কি হবে জেনে? আমার ক্ষতি করেছে. তাই বলে আমি তার ক্ষতি করব কেন? তবে আর ভালোবাসাই কেন? তুই বল? ভালোবাসব যখন, তখন জীবন দিয়ে ভালোবাসব, সুখে দুখে বিপদেও ভালোবাসব —নয় কিনা?'

নীলা শুনছিল—অশ্রু বলছে, ভালোবাসব যখন, তখন জীবন দিয়েই ভালোবাসব। এই মুহূর্তে নীলার চক্ষে সেই শীর্ণা অপূর্ণ অসুন্দর অশ্রু পরম সুন্দর হয়ে উঠল। এই শীর্ণতার মধ্য দিয়ে যে স্রোত বইছে, সে নির্মল ভালোবাসার স্রোত, সে স্রোত, পবিত্র। তার কাছে নীলার মাথা নুয়ে এল। আজ নীলা ছোট হয়ে গেল তার কাছে!

'কিরে, শুনছিস্ আমার কথা?'

নীলা বলল, 'তুই বলে যা, আমি খুব মন দিয়ে শুনছি।'

'হ্যাঁ, তারপর সেই সন্ধ্যায়—বাইরে মেঘ করেছে। উঠানে শিউলি ফুটেছিল। তার গন্ধ আসছে। আমি কয়েকটা ফুল তুলে তার হাতে দিলাম। ঘরে এসেছি। আমার বিছানার কাছে সে ফুলগুলি রেখে দিল। দু'জনে কতক্ষণ গল্প করেছিলাম সেই অন্ধকার

ঘরে, সেই প্রথম নির্জন রাত্রে এক সময় সে আমাকে কাছে টানল। না, বাধা আমি দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তুই বুঝবি না নীলা—সে আমাব সব কিছুর বাধা ভাঙবে, এই বাধা ভাঙার আনন্দের লোভ, সেদিন আমিও সামলাতে পারিনি।'

অশ্রু চুপ করল।

অনভিজ্ঞ নীলা তবু তার দিকে চেয়ে ছিল, সেই ইতিহাসের কোন শেষ অধ্যায় আছে কিনা জানবাব জন্য।

'এখন শোন'—অশ্রু আবার বলতে লাগল, 'তুই আমাকে বাঁচাতে পারিস।'

নীলা অবাক হয়ে বলল, 'কি কবে বাঁচাব তোকে?'

তোব অসিতদাকে তুই একটু বল—আমার বাঁচবার পথ আছে কিনা?'

নীলা চমকে উঠল। অশ্রু জানে না—নীলার সেই অশ্রুসিক্ত কাহিনী—যার জন্য সেদিন সারারাত সে কেঁদেছে।

অশ্রু আবাব অনুরোধ কবল, হাত দুটো জড়িয়ে ধরল নীলার, 'তোকে কিছু বলতে হবে না, তুই শুধু আমাকে নিয়ে চল। শুধু বলবি এ আমার বন্ধু, এঁকে আপনাকে একবার দেখতে হবে।'

গ্রামেব ভেতরেব বাস্তা দিয়ে দ্রুত হেঁটে; নীলা আর অশ্রু যখন অসিতেব বাড়ীর কাছে পৌছল তখন প্রায় ন'টা বেজে গেছে।

নীলা সারা পথ ভেবেছে—কেমন কবে অসিতদার সামনে গিয়ে সে দাঁড়াবে। অসিতদা কি ভাববে—ভাববে নীলা নিজে এসেছে তাকে বিয়ের কথা বলতে। এ কথা ভাবতে গিয়ে নীলা লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল।

তবু সকল ভালোবাসার মধ্যে একটা কঠিন, অথচ পরম সত্য আছে, যে সত্য মানুষকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার অধিকার দেয়। ভালোবাসা —সে যে জীবনকে হিমালয়ের মত ব্যাপ্তি দেয়, গম্ভীর সৌন্দর্য দেয়। নীলা সেই ভালোবাসার জোরে গিয়ে দাঁড়াল অসিতের কাছে।

ডাক্তারখানায় রোগী দেখা শেষ করে ক্লান্ত অসিত চা খেতে বাড়ী এসেছিল। নীলাকে দেখে চমকে উঠল।

নীলা দেখছিল ট্রাউজার আর সার্টপরা সেই অসিতদাকে।

'খুব দরকারে এসেছি অসিতদা',—নীলা মুখ নিচু করে আস্তে আস্তে বলল।

অসিত হাসছিল।

'না ঠাট্টা নয়, সত্যি খুব দরকার। আমার এক বন্ধুকে আপনাকে দেখতে হবে একটু।'

অসিত হাসতে হাসতে বলল, 'ও এই কথা? আমি ভাবছি কী না কি বলবে! কই তোমার বন্ধু কোথায়?'

অশ্রুকে নিয়ে নীলা ঘরে ফিরে এল।

'—দেখুন! এ আমার বন্ধু অশ্রু।'

অসিত তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল 'দেখেছি। অশ্রুই।'

অসিত কি ভাবল একটু। বাড়ীর সব খবর নিল অশ্রুর। তারপর ঘরে পায়চারি করতে করতে অশ্রুর সব কাহিনী শুনল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে সোজা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ভালোবাস তাকে?'

অশ্রু মুখ নিচু করে রইল।

'তাহলে এ তোমাদের ভালোবাসার সন্তান। সব সন্তান ভালোবাসায় হয় না। কোন কোন সন্তান ভালোবাসা ছাড়াই জন্ম নেয়। কিছু ভেবো না অশ্রু। তুমি নার্সিং শিখবে? তোমার সাহস আছে, বুদ্ধি আছে, তুমি পাবরে। মা'কে সব বল। বল অসিতদা বলেছেন নার্সিং শিখতে। চিঠি লিখে দিচ্ছি, কলকাতা চলে যাবে। ছেলে হওয়া পর্যন্ত সেইখানেই থাকবে। তারপর নার্সিংয়ে ভর্তি হবে। তিন বছরের মধ্যে নার্সিং পাস করে ফেলবে। ওতে জীবিকার অভাব হবে না। ছেলেকেও মানুষ করতে পারবে। ওষুধ লিখে দিচ্ছি, খাবে। এ সময় শরীর ভাল রাখতে হয়।'

অসিত একটু থেমে আবার বলল, 'আর শোনো, ভয় পেও না।

মনে কোন গ্লানি রেখো না, অন্য কোন দেশে রাখে না। তারাও সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। মহাভারতের কুন্তীও কোথাও মাথা নিচু করেন নি।

গভীর কৃতজ্ঞতায় অশ্রুর চোখে জল ভরে আসছিল

ওরা চলে গেছে অনেকক্ষণ।

অসিত ঘরে একা বসে বসে ভাবছিল, নীলাপুরের ইতিহাসে আর একটি অধ্যায়ের সংযোজন হল আজ। অপবিমেয় কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়েও অশ্রু বলেছে 'সে ছেলেটিকে ভালোবাসে।' এই তো নতুন যুগের ইতিহাস।

অবশ্য বাইরে জানাজানি হলে এবং একদিন তা হবেই—আবার একটা চাপা আলোড়ন সৃষ্টি হবে। নীলাপুর গার্লস স্কুলটার বিরুদ্ধে প্রাচীন, জীর্ণ সমাজটা আর একবার আঘাত হানবার চেষ্টা করবে বর্তমান সভ্যতাকে আর একবার অভিশাপ দেবে তারা। অসিত চেষ্টা করল সে পথ বন্ধ করতে কিন্তু একদিন এ কাহিনী বাইরের আলোকে আসবে। তখন কি হবে? তবু ওরা জানুক, জীবন অত ছোট নয়, ঠুনকো নয়, অত ভঙ্গুর নয়—সে ব্যাপ্ত, বিরাট। চলার পথে এগুলো হালকা বাধা মাত্র। আর কেন এই প্রাচীন পঙ্গু সমাজটা ভুলে যাবে যে, অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব মানব সৃষ্টির আদি যুগ থেকে চলে আসছে সর্বকালে, সর্বদেশে।

অসিত নীলাকে দেখল অনেকদিন পরে। নীলা খুব সুন্দর দেখতে। রক্ত মাংস অস্থির সমন্বয়ের ঊর্ধ্বে আরো কিছু, আরো কিছু—যা একটা গন্ধরাজের মত সকালে ফুটে ওঠে। নীলা বোধহয় জানে না, সে নিশিকান্তবাবুর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে।

অসিত ভাবতে লাগল, নীলা সুন্দর। তবু, শুধু সুন্দর বড় সাধারণ, বড় অগভীর। আজকের জীবন ত কেবল গৃহের জন্য নয়! সে জীবন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে, সে জীবন বৃহৎ, সে জীবনের গণ্ডী সীমিত নয়। এই জীবনের প্রয়োজনের কাছে, শুধু সৌন্দর্য

অর্থহীন বিলাস মাত্র। আজকের জীবন শুধু সুন্দরকে নিয়ে কাটে না, শুধু কোন সুন্দরও—আজ জীবনকে সুন্দর করে না। তাই রুচি চাই ব্যবহারিক জীবনে, শিক্ষা চাই মনের, বুদ্ধি চাই, জ্ঞান চাই, চাই সংস্কৃতিবোধ। বিপদের মুখে দাঁড়াবার মত সাহস এবং প্রজ্ঞাও চাই। কাজেই তার জীবনে নীলার কোন নিমন্ত্রণ নেই।

না থাক্। নীলা তবু সুন্দর, সত্যি সুন্দর। আজ সকালের প্রসন্ন রোদের মত এই ভালোলাগাটুকু—যা নীলার কথা ভাবতে গিয়ে তার মনে করুণ সুরের মত বেজে উঠছে—তা কিছুতেই তার চিন্তা থেকে সরে যাচ্ছিল না। দূরাগত পুষ্পের বিষণ্ন সৌরভের মত, তা বার বার গন্ধ ছড়াতে লাগল।

॥ ২৬ ॥

দীর্ঘ স্থির গভীর চিন্তার পর স্বদেশবাবু একটি কঠিন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। বহুদিন থেকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, সরকারী এবং সমাজের সকল স্তরের দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটা দেশব্যাপী আন্দোলন হওয়া উচিত। সমাজের সর্বত্র পাপে ভরে উঠেছে যা কয়েকবছর আগেও ছিল না। তখন দেশে কিছু খাঁটি জিনিস পাওয়া যেত, দেশের লোক মানুষের খাদ্যবস্তুতে ভেজালের বিষ দিতে দ্বিধা করত, সেখানে পাপের ভয় ছিল, ভয় ছিল শাসনের। কিন্তু আজ সে ভয় একটুও নেই। যারা শাসন করবে তারাই দুর্নীতির পাপে আকণ্ঠ ডুবে গেছে। সরষের তেলে ভেজাল দিয়ে লাখ লাখ টাকা করা চলতে পারে, যদি ইনস্পেক্টরকে ঠিকমত তেল দেওয়া চলে। আর যদি কখনও নেহাৎ ধরা পড়ে, তখন দু'শত টাকা জরিমানা। আর কিছু নয় কারণ আইনে নাকি এর বেশী শাস্তির বিধান নেই। যে দুধ খেয়ে শিশু

বাঁচে সেই দুধে পচাপুকুরের জল, ময়লা নোংরা জল মেশালে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হতে পারে। সরকার জেনে বসে আছে, সব খাদ্যেই ভেজাল চলছে এখন। এই মহাজ্ঞান অর্জ্জনই তাঁদের শেষ কর্তব্য। আর সরকারী অফিস মাত্রেই, আদালত, থানা সবরেজেস্ট্রী অফিস, সাপ্লাই অফিস মাত্রেই, দুর্নীতি ও ঘুষেব এক একটি নরক। বেসিক স্কুলের কিছু সিমেণ্ট দরকার ছিল। এনকোয়ারী হয়ে গেছে আজ বছরখানেকেরও বেশী। কিন্তু সিমেণ্ট পাওয়া যায়নি। জানা গেল, কণ্ট্রোলার ও ইনস্পেক্টারকে ঘুষ না দিলে পাওয়া যাবে না, গেলেও বছর কয়েক বাদে।

স্বদেশবাবু বসে বসে ক্ষুব্ধ মনে ভাবছিলেন, অথচ কী আশ্চর্য, সমাজের কোন স্তবের মানুষের কাছ থেকে এর বিরুদ্ধে একটা বলিষ্ঠ প্রতিবাদ আজো ধ্বনিত হয়নি। কোন রাজনৈতিক দল কংগ্রেস, কি কম্যুনিস্ট কেউই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়নি। কংগ্রেস জানায়নি কারণ সরকার তাদের। কম্যুনিস্টরা জানায়নি কারণ, সরকারী কর্মচারীর শতকরা প্রায় পঁচাত্তব জন কম্যুনিস্টপন্থী। সরকারকে হাতে রাখতে হলে এবং একদিন সরকার দখল করতে হলে, সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেপান চলবে না। এখন দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক দল যেন নির্বাচনের এক একটি প্রতিষ্ঠান। তবু কম্যুনিস্ট পার্টি, লোকচক্ষুর অন্তরালে খুব সতর্কতার সঙ্গে পার্টির কাজ করে চলে! কিন্তু কংগ্রেস এখন কেবল একটা দল রক্ষার আর অর্থ সংগ্রহের প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠছে। শেষ লক্ষ্য, নির্বাচনে জিততে হবে এবং জেতার জন্য অর্থ চাই। আর অর্থ আসবে ক্যাপিট্যালিস্টদের কাছ থেকে, যে অর্থ দুর্নীতি, ভেজাল ও শোষণের রক্তে রঞ্জিত।

স্বদেশবাবুর চোখে এই সমাজের নগ্ন রূপটা দিনে দিনে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। দেশের এই ভবিষ্যতের জন্য গান্ধীজী সংগ্রাম করে ছিলেন? নেতাজী জীবন সঁপেছিলেন? কত অসংখ্য অচেনা মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিলেন? কী অর্থ এই স্বাধীনতার?

রাজনীতি থেকে অনেক দূবে সরে এসেছিলেন স্বদেশবাবু। এখন

তাঁর কাছে ছিল কেবল অখণ্ড অবসর, নিজের মত করে কিছু পড়াশোনা। সহসা সেই অবসরের মাঝখানে তিনি অনেক অনুচ্চ কণ্ঠ শুনতে পেলেন, শুনতে পেলেন অনেক শহীদের জীবন উৎসর্গের ব্যর্থ প্রতিদান, অনেক মহাজীবনের অশ্রুত বেদনা।

তাঁর আশ্চর্য লাগে, এত বড় জমিদারী উচ্ছেদ ব্যবস্থা, কেবল কর্মচারীদের জন্য ব্যর্থ হয়ে গেল। জমি চলে গেল অন্ধকারের গর্ভে, আইনের আওতার বাইরে। গভীর রাত্রে কেবল টাকার খেলা চলল। লোকে বলে, এইত কিছু দূরে ঘোলডোবার এটেস্টেশান অফিসার একরাত্রেই দু'হাজার টাকা নিয়ে কলকাতা চলে গেল। সব জমি রাতারাতি পুরনো তারিখের শিখণ্ডী দাঁড় করিয়ে বেনামীতে বেহাত হয়ে গেল। ভূমিহীন চাষী এ পর্যন্ত এক ছটাকও জমি পেল না। এটা কি স্বাধীন দেশ? এখানে কি সভ্য সরকারের কোন অস্তিত্ব আছে?

মন্ত্রী কুঞ্জবাবুর চিঠি আজ স্বদেশবাবু পেয়েছেন। তিনি লিখেছেন, বিভাগীয় মন্ত্রীকে তিনি অনুরোধ করেছিলেন রণজিতের বদলীর আদেশ বাতিল করে দিতে। তিনি অস্থায়ী কমিশনারকে বলায়, কমিশনার ফাইল দেখিয়েছিলেন। অভিযোগগুলির সত্যতা সম্পর্কে বলিষ্ঠ প্রমাণ অনুপস্থিত। তা ছাড়া রণজিৎবাবুর কাজেরও রেকর্ড ভাল। কিন্তু যেহেতু এর সঙ্গে নারীঘটিত ঘটনা জড়িত বলে অভিযোগ করা হয়েছে এবং এই নিয়ে প্রকাশ্যে পোস্টার পড়েছে, সেহেতু প্রশাসনিক সততা ও মর্যাদার জন্য তাঁকে বদলী হতে হবে। বদলীর অর্ডার শীগ্‌গিরই যাচ্ছে।

স্বদেশবাবু চিঠি পড়ে কি একটা গভীর ক্ষোভে জ্বলতে লাগলেন। এত বড় অবিচার মন্ত্রীমহোদয় স্বীকার করে নিলেন মিথ্যা সরকারী প্রেষ্টিজের জন্য! স্বদেশবাবু অনুভব করছেন, এই দুর্নীতি, এই অযোগ্যতা, এই পুঞ্জীভূত পাপকে একবার অন্ততঃ আঘাত দেওয়া দরকার, নাড়া দেওয়া দরকার। গান্ধীজীর বাণী তাঁর মনে পড়ল— প্রবল অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার হাতিয়ার তিনি নগণ্য ব্যক্তিকেও

দিয়ে গেছেন। সে হাতিয়ার—সত্যাগ্রহ। সে পথ দুঃখের ও তপস্যার পথ, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সত্যের ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার পথ।

স্বদেশবাবু আবার নীলাপুর আর তার পাশের পুরনো সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করতে লাগলেন। গ্রামে গ্রামে ঘন ঘন ঘরোয়া বৈঠক করতে লাগলেন। বলতে লাগলেন—'ঘুষ দিও না, কারণ ঘুষ যে দেয়, সেও সমান পাপী, দোষী। খাদ্যে ভেজাল দিও না, ওর মত পাপ আর নেই। নরঘাতী, শিশুঘাতী অপরাধ করো না অর্থের লোভে।'

দেখতে দেখতে নীলাপুরের পাশের গ্রামগুলিতে একটা আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল। একটা জনমত তৈরী হল—ঘুষ না দেবার পক্ষে, খাদ্যে ভেজাল না দেবার পক্ষে।

সেদিন সেটেলমেণ্ট অফিসে কেরানী মহলে কথা হচ্ছিল। সেই কৈ মাছের ঝোল-বিলাসী মদনবাবু, ডিলিং ক্লার্ক অনিলবাবু, পেশকার বাবু সকলে মিলে কথা বলছিলেন। মদনবাবু বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন, 'রাখুন মশায়, আপনাদের সত্যাগ্রহ। গান্ধী নিজেই ফেল মেরে গেছে। আবে মশায়, ঘুষ নাই কোন্ দেশে কন্ত, কোন্ কালে, কোন্ যুগে, আপনারা কই পারেন? আপনারা দেবতাগো যে পূজা করেন সেটা কি? সেটা কি ঘুষ না? সরকার থাকলেই ঘুষ থাকব, এই জল থাকলেই যেমন মাছ থাকে। কাজেই চালাইয়া যাও বাপ, ডান হাতে বাম হাতে, যে ক'দিন আছ। কোই পরোয়া নাই।'

পেশকারবাবু, অনিলবাবু, সকলেই কথাটা সায় দিলে।

কিন্তু যতই মুখে লাফালাফি করুন, মনে মনে ভয় পেয়েছেন বাবুরা। লোকজনও সেটেলমেণ্ট অফিসে কম আসছে। এ্যাটেশ-টেসন অফিসারও যেন একটু ভয় পেয়েছেন। দু'হাতে ঠিক লুঠতে পারছেন না। দালালরাও আজকাল কম আসছে অফিসে। দেখতে

দেখতে একটা আবহাওয়া তৈরী হয়ে গেল। শোনা গেল—স্বদেশবাবু সেটেলমেণ্ট অফিসে শীগ্‌গির সত্যাগ্রহ করবেন।

সেদিন সকাল থেকে রণজিতের বিশ্রাম নেই। ডিপার্টমেণ্ট থেকে অস্থায়ী কমিশনার, সেচ-দপ্তরের সেক্রেটারী, পূর্ত-দপ্তরের সেক্রেটারী তদন্ত করতে আসছেন। কালিনগরের মরানদীটা সংস্কারের পরিকল্পনার পেছনে যুক্তি কতখানি আছে, কি সুফল ফলবে নদীটা কাটানো হলে।

সকাল হতেই চারপাশের গ্রাম থেকে লোক জড় হচ্ছে। কংক্রীটের পুলটার কাছে লোক জমছে বেশী। ঐখানে কয়েকটা জীপ দাঁড়িয়ে আছে। দামী কোট প্যাণ্টপরা একদল লোক মুখে কারুর পাইপ, কারুর চুরুট, কারুর সিগারেট। লোকগুলি যেন বাইরে থেকে আমদানী করা, এদেশের মাটির নয়।

থানার দারোগাবাবু সিপাহীদের নিয়ে ভিড় সরাচ্ছেন। পুলের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অফিসাররা রণজিৎবাবুর দেওয়া প্ল্যান্‌টা দেখছিলেন।

একজন অফিসার রণজিৎবাবুকে আদৌ সহ্য করতে পারছেন না। কোথাকার-কে এক বি. ডি. ও. একজন অর্ডিনারি গেজেটেড্‌ অফিসার প্ল্যান দিয়ে বসল। মিনিস্টারের অর্ডার। তাই আবার সর্‌জেমিনে গিয়ে দেখতে হবে। যতো সব নন্‌সেন্স।

রণজিৎবাবু প্ল্যানটা বুঝিয়ে দিতে লাগলেন।

সেক্রেটারী দিশি সাহেবরা বাংলাতে কথা বলেন না। ইংরেজী না বললে কথা বলে আরাম কোথায়? বড় অফিসারের মর্যাদা কোথায়? বি. ডি. ও. বাংলাতেই বলছিলেন। কিন্তু বারবার হোয়াট হোয়াট শুনে তাঁর মেজাজ খারাপ হয়ে আসছিল।

কিন্তু ডাইরেক্টার এই খদ্দরপরা তরুণ অফিসারটিকে আদৌ সহ্য করতে পারছিলেন না। পাইপটা মুখে রেখে চিবিয়ে চিবিয়ে ইংরেজীতে তিনি বললেন—'হোয়াট্‌ ইন্‌টারেস্ট হ্যাভ—'

রণজিৎবাবু প্রতিবাদ করে উঠলেন। বললেন—'ক্ষমা করবেন। আমার নিজের কোন ইন্টারেস্টই নেই। এই অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ লোকের ইন্টারেস্ট এই প্ল্যানেব সঙ্গে জড়িত। কাজেই প্ল্যানটা মঞ্জুর হওয়া উচিত।'

ঐ ডাইরেক্টাব আবার বললেন—'প্ল্যান্ এ্যাপ্রুভ করবেন ক্যাবিনেট।'

রণজিৎবাবু বললেন, 'তা হ'ক। আমি শুধু প্রতিনিধিদের বোঝাতে চাইছি, আমাব পবিকল্পনার মধ্যে যুক্তি আছে কিনা!'

গ্রামের লোকগুলি অবাক হযে শুনছে বণজিৎবাবুব কথা। কী একটা দরদ ছিল ওঁর কথার মধ্যে। প্রতিনিবিদল বাংলোতে ফিরে গেলেন। কোন ফলাফল তাঁবা জানালেন না। কোন সহানুভূতির চিহ্ন পাওয়া গেল না তাঁদের কথায, তাঁদের আচবণে। যেন একদল প্রভু এসেছিলেন দযা কবে, তাঁরা চলে গেলেন।

স্থানীয এম. এল এ.র নেতৃত্বে একদল লোক বাংলোতে তাঁদেব সঙ্গে দেখা কবে একটা স্মাবকলিপি দিযে এলেন।

বেলা বেড়ে উঠল দেখতে দেখতে। চারধারেব গ্রাম থেকে যারা ভিড কবে এসেছিল তাবা বোদে এখানে ওখানে, গাছেব নীচে, হাটেব চালায এখনও জড়ো হযে আছে।

সকলেব মুখে বণজিৎবাবুর প্রশংসা। রণজিৎবাবু একদিনেই তাদেব জয় করে নিযেছেন।

মবানদীতে আবার সমুদ্রেব যৌবন এসেছে, ক্লান্ত রণজিৎ পুলেব ওপর দাঁড়িয়ে দূবেব দিকে চোখ মেলে হযত সেই স্বপ্নেই বিভোর ছিলো। অসিত সাইকেল থেকে নেমে দ্রুত এগিয়ে এসে তার ডান হাতটা টেনে নিযে বলল, 'নীলাপুরের সকলের হয়ে তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

॥ ২৭ ॥

সত্যের নিজের মধ্যে যে আগুন আছে, সে আগুন আপনা আপনি ছড়িয়ে পড়ে। নইলে স্বদেশবাবুর সত্যাগ্রহের খবরটা এত শীগগির পাশের গ্রামগুলোয় শুধু নয়, সে-ই দক্ষিণে কালিনগর, উত্তরে ভগবানপুর পশ্চিমে পটাশপুর, এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে পড়ত না। নৌকো-ঘাটে বা মাঠে কাজ করতে করতে বা সপ্তাহের হাটের দিনগুলিতে সর্বত্র এক কথা, সত্যাগ্রহ হবে, আবার নাকি আন্দোলন হবে, সেই সেবার যেমন লবণ আইন ভঙ্গের আন্দোলন হয়েছিল। পুলিস বেত মারবে, জেলে দেবে, তবু পুলিসকে সত্যাগ্রহীরা কেউ কিছু বলবে না। সত্যাগ্রহীকে নাকি অহিংস হতে হয়। সেই আন্দোলনের দিনগুলির মত আবার গান বাতাসে ভেসে বেড়াবে 'বেত মেরে কি মা ভুলাবি' বা 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে।'

সে সব আন্দোলনের কথা গ্রামের অনেকে এখনো ভুলে যায়নি। পটাশপুরের বাজারে সেবার কালীপদবাবুকে কি মারটাই না মারলে পুলিস। গেরুয়া রঙের খদ্দরের জামার পিঠের দিকটা রক্তে ভিজে উঠল। হাণ্টার পড়ছে, দোহা সাহেবের হাতের হাণ্টার—একটার পর একটা বিরাম নেই তবু কালীপদবাবু বলছেন, 'মরার আগে পর্যন্ত বলব—নুন মারব, আমাদের দেশের খালের জলে যে নুন হয়, সেই নুন ফেলে বিলেত থেকে বয়ে আনা নুন আমরা খাব না।' মার খেতে খেতে কালীপদবাবু অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

গ্রামে গ্রামে রটে যাচ্ছে সেই রকম আন্দোলন নাকি আবার হবে।

যারা একটু খবর রাখে লেখাপড়া জানে, তারা বলে, এ আবার কি রকম সত্যাগ্রহ! এ যে নিজেদের পুলিস, নিজেদের মন্ত্রী, নিজেদের সরকার।' তবে এইসব লোকের সংখ্যা কম।

সাধারণ নিরক্ষর মানুষ, যারা খেটে খায়, ঋণ আনতে সার আনতে সরকারী অফিসে যায়, সাবডিভিসন্যাল কণ্ট্রোলারের অফিসে তু'বস্তা সিমেণ্টের জন্য যায় বা যারা সাবরেজেস্ট্রী অফিসে বিক্রী কবালা রেজেস্ট্রী করতে যায়, তারা শুনে খুশি হয়েছে। আর হয়তো ঘুষ দিতে হবে না সরকারী অফিসে।

কী একটা প্রবল চাপা উত্তেজনায় নীলাপুরের চারপাশের গ্রামগুলির আকাশ, বাতাস অস্থির হয়ে উঠতে লাগল। সর্বত্রই একটা খবর ছড়িয়ে পড়েছে, সত্যাগ্রহ হবে। স্বদেশবাবু বৃদ্ধ বয়সে আবাব নাকি একটা আন্দোলন করবেন। পুরাতন কিছু কিছু কংগ্রেস কর্মী বুনিয়াদী স্কুলটায় প্রতিদিন যাওয়া-আসা করছে। স্বদেশবাবু এস. ডি. ও-কে লিখেছেন, কোন্ তারিখে তিনি সত্যাগ্রহ করবেন এবং সত্যাগ্রহ করার কারণ কি কি?

দেখতে দেখতে সেই দিনটি ঘনিয়ে এল। ভোর হতে বুনিয়াদী স্কুলটায় প্রথম একবার শঙ্খধ্বনি হল। তারপর পাশের বাড়ী থেকে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তর থেকে সেই শঙ্খধ্বনি নতুন সংগ্রামের বার্তা নিয়ে বেজে উঠল। আবছা আলোয় মাঠ আর মরানদীর তীর পার হয়ে সেই ধ্বনি ক্রমশঃ পূবে, দক্ষিণে, পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ছে।

স্বদেশবাবু প্রার্থনা শেষ করে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। ঘাসের উঠোনে তখনো ভোরের রোদ এসে পড়েনি। বুনিয়াদী স্কুলের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক সকলেই ভোরে উঠে স্বদেশবাবুর সঙ্গে প্রার্থনায় বসেছিলেন। স্কুল সম্পর্কে যা করার ছিল, স্বদেশবাবু তা শেষ করেছেন। এবার তাঁর ছুটি।

ছাত্রীরা স্বদেশবাবুব কপালে চন্দনের তিলক পরিয়ে দিল।

খদ্দরের ঝোলানো ব্যাগটা কাঁধে ফেলে স্বদেশবাবু গেট খুলে ধীরে ধীরে পথে এসে দাঁড়ালেন। হাতের জাতীয় পতাকাটা শান্ত বাতাসে উড়ছে।

নদীর ধারের রাস্তাটা সোজা সেটেলমেণ্ট অফিসের দিকে চলে গেছে সেই শ্মশান আর কবরখানাটাকে বাঁ হাতে রেখে।

স্বদেশবাবু ধীরে ধীরে চলতে লাগলেন সেই পথ দিয়ে। কোন উত্তেজনা নেই, কোন বেদনা নেই। পুরনো দিনের একজন সেনাপতি চলেছেন, নতুন দিনের সংগ্রামের উদ্বোধনে।

পাশের গ্রামগুলির মেয়ে, পুরুষ, ছেলে সব জড়ো হয়েছে। এমনি করে কিছুদূর যেতেই দেখা গেল প্রায় হাজার খানিক লোক সারি দিয়ে স্বদেশবাবুর পেছন পেছন চলেছে। কেউ তাদের আহ্বান জানায়নি, তবু তারা যাচ্ছে, যাচ্ছে স্বদেশবাবুর সঙ্গে নতুন সংগ্রামে।

আস্তে আস্তে সেই মিছিলটা শ্মশান পেরিয়ে, কাঠের পুলটা পেরিয়ে, মুসলমান বস্তি আর বাবলা বনের ধার দিয়ে নীলাপুরের দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে আসতে লাগল।

গার্লস স্কুলের কাছে এসে মিছিলটা দাঁড়ালো একটু।

নমিতা দাঁড়িয়েছিল। প্রণাম করল স্বদেশবাবুকে। ছাত্রীরা তার ললাটে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দিল।

স্বদেশবাবু নমিতার মাথায় হাত রেখে বললেন, 'আমার স্কুলটা একটু দেখ মা।'

নমিতা মৃদু হেসে বলল, 'বুনিয়াদী শিক্ষার আমি কি জানি?'

'কিছু জানার দরকার নেই। তোমার মত একটি মেয়ে চাই মা, যার প্রাণ আছে। প্রাণ থাকলেই সব কিছু থাকে!'

নমিতা মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। আর কিছু বলল না।

মিছিলটা পুরনো বটগাছের তলা দিয়ে সেটেলমেণ্ট অফিসের দিকে এগিয়ে চলল।

সেই ভোর থেকে নীলাপুরে চারপাশের গ্রামের লোক জমতে শুরু করেছে। গাছতলায়, হাটচালায়, পোস্টাফিসের ধারে সর্বত্র তারা এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। মিছিলটা আসছে দেখে সমস্ত লোক ভিড় করে এল।

কংক্রীটের পুলটার ওপরে একটা 'জীপ' আর একটা 'বাস' এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। জীপে এস. ডি. ও এসেছেন, আর রিজার্ভড বাস-এ আর্মড পুলিস।

মিছিলটা এগিয়ে আসছে সেটেলমেণ্ট অফিসের দিকে। মিছিলের সামনে স্বদেশবাবু। পেছনে পেছনে হাজার হাজার গ্রামবাসী।

মিছিলটা আর অগ্রসর হতে পারল না। সামনে আর্মড পুলিস সেটেলমেণ্ট অফিসের গেটের সামনে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে।

থমকে দাঁড়াল মিছিলটা।

স্বদেশবাবু স্তব্ধ মিছিলটার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ কি ভাবলেন। তাবপর সকলকে উদ্দেশ্য করে জোরে জোবে বলতে লাগলেন, 'আজ থেকে নীলাপুবে সত্যাগ্রহ শুরু হল। একদিন আমরা সর্বস্ব পণ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলাম, সেই স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি। আজ প্রশ্ন, সেই অর্জিত স্বাধীনতার সুফলকে দরিদ্রের দ্বারে পৌঁছে দেবার। আমরা স্বাধীনতা চেয়েছিলাম, সাধারণ দরিদ্র মানুষের জন্য। কিন্তু সেই স্বাধীনতার সমস্ত সুফল, সমস্ত সম্ভাবনা আজ ব্যর্থ হতে চলেছে। এর জন্য দায়ী সরকার, তার কর্মচারী এবং অংশতঃ জনসাধারণ। সবকাবী শাসনযন্ত্র দুর্নীতির গলিত শবে পরিণত হয়েছে। এই যদি বিনা প্রতিবাদে চলতে থাকে, বিনা প্রতিবাদে যদি শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, খাদ্যে, এবং সমাজের সমস্ত স্তরে এই দুর্নীতি, ভেজাল চলতে থাকে তাহলে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমাদের এই সত্যাগ্রহ, তারি প্রতিবাদ।'

এস. ডি. ও. বিনীতভাবে বললেন, 'একশ' চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল।'

ধুলা উড়িয়ে গর্জন করতে করতে জীপটা এগিয়ে এসে কাছে দাঁড়াল।

স্বদেশবাবুর দিকে তাকিয়ে এস. ডি. ও. বললেন, 'উঠুন।'

চারদিকে আবার শঙ্খধ্বনি বেজে উঠল। আকাশে বাতাসে নদীতে সেই মুখরিত শঙ্খধ্বনির মধ্যে জনতা স্বদেশবাবুর গলায় মালা পরিয়ে দিতে লাগল। মালার পর মালা, অজস্র মালায় স্বদেশবাবু ঢাকা পড়ে যাচ্ছেন! কেবল জাতীয় পতাকাটি হাওয়ায় উড়ছে।

দেখতে দেখতে বিপুল জনতাকে পেছনে ফেলে রেখে জীপটা পুল পার হয়ে পুবদিকে ছুটে চলল।

জনতার মধ্য থেকে হঠাৎ কে একজন চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'বন্দে মাতরম'। 'গান্ধীজী কি জয়'।

'আমরা ঘুষ দেব না।'

'তুর্নীতি নিপাত যাক।'

'বন্দে মাতরম।'

হাজার হাজার কণ্ঠে সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হ'ল।

আকাশ ভরে উঠল সেই শব্দে।

বেলা বেড়ে উঠছে ক্রমশঃ। রোদের তাপ তীব্র হয়ে উঠছে।

সকলেরই আজ কাজের বিরতি।

আজ নীলাপুরে হরতাল।

সেটেলমেণ্ট অফিস খুলতেই, অর্জুন এসে দাঁড়াল, অফিসার বাবুর টেবিলের সামনে। বিক্ষুব্ধ এ্যাটেস্টেসান অফিসার ধমকে উঠলেন, 'তোমার আবার কি?'

অর্জুন কাগজটা এগিয়ে দিল, 'চাকরী ছেড়ে দিলাম, স্যার।'

কাঁচা হাতের বাংলায় লেখা দরখাস্তটা সাহেবের টেবিলের ওপর রেখে অর্জুন বেরিয়ে গেল অফিস থেকে।

এ্যাটেস্টেসান অফিসার কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সেদিকে। তারপর দরখাস্তটা টেনে নিয়ে নোট লিখতে বসলেন।

বেলা বেড়ে উঠেছে এখন। নীলাপুরের জনতা ক্রমশঃ ঘরে ফিরে চলতে লাগল। স্কুল, রেজেস্ট্রী অফিস, সেটেলমেণ্ট অফিস, বি. ডি. ও. অফিস খুলেছে। কিন্তু কোথাও লোকজন নেই। ছাত্রছাত্রীরা আজ স্কুলে আসেনি। প্রখর রোদে কোলাহলপূর্ণ নীলাপুর এখন বোবার মত নিঃসাড় পড়ে আছে।

মিছিল আর সত্যাগ্রহ দেখে ঘরে ফিরছিল পাশের গ্রামের নগেন আর হরিপদ। কংক্রীটের পুলটাকে বাঁয়ে রেখে ওরা দক্ষিণে যাচ্ছিল।

পুলের কাছে একটা প্রকাণ্ড লরী অচল হয়ে পড়ে আছে, আর তার তলায় একজন মোটা পাঞ্জাবী যন্ত্রপাতি নিয়ে কি সব কাজ করছে।

যেতে যেতে নগেন বলে উঠল, 'স্বদেশবাবুকে ধরে নিয়ে গেল, এর পর আবার কে সত্যাগ্রহ করবে? শালার কেরানীগুলোর ঘুষ খাওয়া ডকে উঠল।'

হরিপদ অন্যমনস্ক ছিল একটু। নগেনের কথায় তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক কথা, ঘুষে রাজত্ব ছেয়ে গেল। সেবার গুরুপ লোন নিতে গেলাম, এই ছোকরা বি. ডি. ও. আসেনি তখন। তা, সকলকে দু'টাকা করে দিতে হল।'

নগেন কথাটায় সায় দিয়ে বলল, 'সরকাবী অফিসেব যেখানে যা, কেবল ঘুষ, ঘুষ চাই। এই যে সাবেজেস্ট্রী অফিস। এখানে সব বাঁধা বন্দোবস্ত। সাবরেজেস্টাব বাবু থেকে মায় চাপরাসী পর্যন্ত। দিনের শেষে হিসেব হয়, দলিল পিছু তিন-চার টাকা। আবার আদালতে যা, তোর আদালত নাকি ন্যায় বিচার, সত্যেব জায়গা! আসলে, শালা নরক যদি কোথাও থাকে, তবে তোর ঐ আদালতগুলো। এসব যুগযুগান্তর ধরে চলবে নাকি? তবে আর স্বাধীন হয়ে কি হল দেশের? স্বাধীনতার দরকারটা কি ছিল তোর?'

আস্তে আস্তে নগেন আর হরিপদ বাড়ীর কাছে পৌঁছে গেল। দূরে নগেনের বাড়ীর নারকেল গাছের মাথাগুলো দেখা যাচ্ছে।

নিজের বাড়ীর কাছে সরু আল পথটায় নামতে নামতে নগেন বলে উঠল, 'চাষবাস ছেড়ে দিলাম রে হরিপদ।'

হরিপদ চম্‌কে ফিরে দাঁড়াল, তার কথাটা ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। 'সে কি রে? বাপা-ঠাকুরদার আমলের চাষবাস ছেড়ে দিবি?'

'হাঁ, ও শালা ভাগচাষ পোষায় না, জমি তো নিজের নয়। খাইখরচা মজুর লাঙ্গল সার, ওসব দিয়ে কিছু থাকে না। বুঝলি?'

'তবে কি করবি এখন।'

নগেন বলল, 'নীলাপুরে যে বাস চলছে, সেই বাসে এবার কণ্ডাক্টারী করব।'

নগেন, ধানক্ষেতের মাঝখানের সরু আলটা দিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ী চলে গেল। তাকে আর দেখা গেল না।

হরিপদ গজ্ গজ্ করতে করতে চলতে লাগল, 'শালা কণ্ডাক্টার হবে, কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে টিকিট কাটবে। কাঁচা পয়সা!'

দূরে জালপাই মহলটার দিকে তাকিয়ে হরিপদ ভাবছিল, গ্রামের সব গরীব দুঃখী এবার চলে যাবে। কেউ চাষ করতে চাইবে না, আলুক্ষেত করবে না, মাঠে খেঁসারী বুনবে না। কাঁচা পয়সা চাই, সবার কাঁচা পয়সা চাই। শালা, পয়সাই সব, পয়সায় চাল কিনে খাবে, মুড়ি কিনে খাবে। সব ছুটছে কালীনগরের ধানকলে, কেউ বাসে কণ্ডাক্টারী করতে, ঝাড়ুদারী করতে, কলকাতার বাবুদের বাড়ীতে চাকর থাকতে।

ধান কেটে-নেওয়া জালপাই মহাল আর মরা নদীর ধারে বাবলা বনটার দিকে তাকিয়ে হরিপদের মনে হল, সব খাঁ খাঁ করছে বালিয়াড়ির মত। মানুষের মন মরে যাচ্ছে। এখন সতেজ ধানক্ষেত দেখবে বলে কেউ জালপাই মহালের ধারে এসে দাঁড়াবে না। জীবন পাল্টে যাচ্ছে। হরিপদ কেন, কেউ তাকে আটকাতে পারবে না! কেউ না!

॥ ২৮ ॥

গত কয়েকদিন থেকে নন্দিতা একটু ভাল আছে। বিছানায় উঠে বসতে পারে। উমা কাঁথি থেকে তানপুরার তারগুলো এনে দিয়েছে। সন্ধ্যায় বহু কষ্টে সে তারগুলো পরাচ্ছিল।

তার বাঁধা এক সময় শেষ হল। বাজিয়ে দেখল নন্দিতা, একটা আশ্চর্যরকম মিষ্টি সুর বেজে উঠছে। পুরনো হলেও তানপুরাটা খুব ভাল, খুব সুরেলা। নন্দিতা তারগুলো টানতে টানতে বলল, 'পার্টনার শোন, কেমন সুন্দর সুরে বাঁধা হয়েছে তারগুলো। একটা একটা করে পুরনোগুলো খুলে নতুন করে বেঁধেছি। আশ্চর্য। গীতাঞ্জলির সেই কবিতাটা কেন মনে আসে বলতো!—

"একটি একটি করে তোমার
পুরানো তার খোলো,
সেতারখানি নূতন বেঁধে তোলো
ভেঙে গেছে দিনের মেলা,
বসবে সভা সন্ধ্যাবেলা
শেষের সুর যে বাজাবে তার
আসার সময় হল—"

নন্দিতা বার বার এই শেষের লাইনটা আবৃত্তি করতে লাগল।

উমা বিছানাটা ঠিক করে দিতে দিতে বলল, 'তুই এবার শুয়ে পড় না আমি তানপুরাটা রেখে দি।'

'না, প্লীজ, পার্টনার আর একটু বাজাই। আমি ত ভাল আছি।' নন্দিতা খুব আস্তে আস্তে গুন্ গুন্ করে আলাপ করতে লাগল।

বেলা পড়ে আসছে, এখন ভীলপলশ্রীর সময়।

সাইকেল রিক্সার শব্দ পেয়ে নমিতা বাইরে এসে দাঁড়াল।

সুটকেশটা নামাতে নামাতে অসিত জিজ্ঞেস করল, 'নন্দিতা কেমন আছে? কেউ তানপুরা বাজাচ্ছে বলে মনে হল।'

নমিতা সুটকেসটা হাত থেকে নিয়ে বলল, 'নন্দিতা ক'দিন একটু ভাল আছে। তানপুরা বাজাবে বলে জিদ ধরছিল। তাই উমা তার এনে দিয়েছে। এখন বসে বসে তার বাঁধছিল।'

নন্দিতা চোখ বন্ধ করে একমনে সুর ভাঁজছে। কী আশ্চর্য এই ভীমপলশ্রী! পড়ন্ত বিকালের সমস্ত বেদনাকে নিজের গভীরে ঢেকে দিয়েছে। 'আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস গেলে করব নিবেদন।'

পায়ের শব্দে নন্দিতা তাকাল। একটি শুভ্র আনন্দে সারা মুখ ভরে উঠল তার,—'এই যে পার্টনার, অসিতদা এসে গেছে। বাঃ এবার 'শেষের সুর যে বাজাবে তার আসার সময় হল'। এই দেখুন ত অসিতদা, কত ভাল আছি। তবে পার্টনারটা একটুও গাইতে দিচ্ছে না। গান যদি গাইতে না পারলাম, তবে বেঁচেই বা কি করব?

অসিত চা খেতে খেতে বলল, 'নন্দিতার জন্য হস্‌পিট্যালে সীট ঠিক করে এলাম। মেডিক্যাল কলেজেই হয়েছে, গেলেই ভর্তি করে নেবে।'

'আর নিজের সীট-এর কি হল?' উমা ঘর গুছোতে গুছোতে জিজ্ঞেস করল।

'সেটাও হয়েছে। কুঞ্জবাবুই সব ব্যবস্থা করে দিলেন। পাসপোর্ট, গ্যারেণ্টার সব ঝামেলা চুকিয়ে এলাম।'

তানপুরাটা রাখতে রাখতে নন্দিতা অবাক হয়ে বলল, 'তুমি চলে যাচ্ছ অসিতদা? কোথায়?'

নন্দিতার খুব খারাপ লাগল। 'না, যেও না অসিতদা, তুমি চলে গেলে আমার বড্ড ভয় করবে, আমি মরে যাব।'

অসিত বলল; 'একটা আস্ত পাগল। ভয় করবে কেন? যেখানে যাচ্ছ, সেখানে আমার চেয়ে অনেক বড় ডাক্তার আছেন।'

'ও, হাসপাতালে? হাসপাতালে আমি যাব না অসিতদা, তোমরা আমাকে হাসপাতালে যেতে বোলো না! প্লীজ!' বলতে বলতে নন্দিতা কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'হাসপাতালে গেলে মরার সময় তোমাদের কেউ কাছে থাকবে না। তোমাদের কাউকে দেখতে পাব না আমি!'

অসিত কিছু বলতে পারল না।

নমিতার ঘরে ধীরে ধীরে অসিত তার চলে যাওয়ার কথাই বলছিল। নমিতা একসময় বলল, 'জ্যাঠাবাবুকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে।'

অসিত তেমনি নিরুত্তপ্ত গলায় বলল, 'বাবার তিন মাস জেল হয়েছে। কলকাতার একটা কাগজে দেখলাম। এই আত্মনিগ্রহের কোন অর্থ নেই আমার কাছে। অবশ্য ভাবতে আমার খারাপ লাগছে, আমি বাইরে চলে যাব, বাবা জেলে থেকে যাবেন। শরীর ওঁর ভাল নয়। কিন্তু সে যাক, এই সত্যাগ্রহের কোন মূল্য আমি খুঁজে পাই না। এ জীবনের অপব্যয়।'

নমিতা মৃদু প্রতিবাদ করে বলল, 'অপব্যয় বলছ কেন? তুমি নিজেই বলেছিলে, সরকারী শাসন বিভাগটা একেবারে জাহান্নামে গেছে।'

'গেছে—এ বিষয়ে বাবার সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু জাহান্নামে যাওয়া বন্ধ করার ব্যাপারে একমত নই।'

নমিতা আলোটা কমিয়ে দিয়ে এসে অসিতের কাছে বসতে বসতে বলল, 'এর একটা নৈতিক দিক আছে, সেটা ত তুমি নিশ্চয় অস্বীকার করবে না!'

অসিতের আলোচনাটা ভাল লাগছিল না। তবু বলল, 'শাসন বিভাগের দুর্নীতিটা আজ এমন স্তরে পৌঁছেছে নমিতা, যেখানে এই নৈতিক চাপের কোন প্রভাব নেই। দেহের পচনটা এমন পর্যায়ে এসেছে যখন মেজর অপারেশান দরকার, নইলে রোগী বাঁচবে না। সরকার দৃঢ় না হলে, বলিষ্ঠ না হলে, এই দুর্নীতি দূর করা যাবে না এবং দেশের এই প্রচলিত গণতন্ত্রের মধ্যে তার অবকাশ খুব কম। মনে কর, আজ যে লোকটাকে তেলে ভেজাল দেবার জন্য প্রকাশ্যে হুইপিং-এর আদেশ যে দলীয় সরকার দেবে, সেই দলকেই দু'মাস পরে পার্টি ফাণ্ডের জন্যে, কি ইলেক্‌শানের জন্য, ঐ লোকটারই কাছে টাকা আনতে যেতে হবে। এ হয় না, হতে পারে না, এ অসম্ভব!'

তারপর একটু থেমে অসিত আবার বলতে লাগল, 'ইংরেজের ওপর নৈতিক চাপের তবু একটা মূল্য ছিল, কারণ জাত হিসাবে ইংরেজ উন্নত, মানুষের মূল্যবোধে শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু আমার দেশের মানুষ? আজ বিনোবাজীর মত লোকও ব্যর্থ হলেন। ব্যর্থ হলেন এই জন্য যে, মানুষের নৈতিক মান আজ সাধারণ চিকিৎসার বাইরে চলে গেছে। দূষিত রক্ত, পুঁজ বের করার জন্য অপারেশান চাই। তুমি একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে আমার কথাটা। দেখবে তু'দিন পরে এ আন্দোলনও মরে যাবে। সত্যাগ্রহ করার মত লোকের সংখ্যা এদেশে আর বেশী নেই। এ কথা তুমি জানবে।'

নমিতা শান্ত হয়ে কথাগুলো শুনছিল। তার মনে হচ্ছিল, আজ ঠিক এই মুহূর্তে আলোচনাটি না উঠলেই ভাল হত। বিষয়ান্তরে যাবার জন্য সে এবার বলল, 'আমি একটা কথা ভাবছি, এখন বলব কিনা বুঝতে পারছি না। অথচ তুমি ত চলে যাবে। আর সময় কোথায়?'

'বল না, ক্ষতি কি। আমি টায়ার্ড, তা হোক্।'

নমিতা বলল, 'তাহলে শোন, টাকার কি করলে বাইরে যাবার? কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে আমার কিন্তু কিছু টাকা আছে।'

অসিত হেসে বলল, ধন্যবাদ 'না, টাকার দরকার নেই। আমার শুধু প্যাসেজটাই দরকার ছিল। ওখানে গেলেই কাজে জয়েন করব।'

'কদ্দিন পরে আসবে?'

অসিত কোন উত্তর দিল না। পরে এক সময় বলল—'হয়ত দেরি হবে।'

নমিতা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে মুখ নিচু করে বলতে লাগল, 'ততদিনে তোমার গ্রাম তোমার দেশ আমার হয়ে উঠুক। তোমার আসার আগে তোমার গ্রামের ধুলোয় আমি পবিত্র হয়ে উঠি। অসিত, শহরের যে ময়লা নিয়ে এসেছিলাম তা সব ধুয়ে মুছে যাক্ ততদিনে।'

কথাগুলো বলতে বলতে নমিতা কেঁপে উঠছিল ; কেঁপে উঠেছিল এক অপরিমিত আবেগে, আনন্দে, বেদনায় !

বোধ হয় কুয়াশা নামছে রাত্রে। সামনের নদীতীরের উঁচু পথ আর বাবলা বন, মরানদীটা এখন আবছা ছায়ার মত চোখে পড়ছে।

নিস্তব্ধ রাত্রিটা ভেদ করে এক সময় পুলটার কাছে গাড়ীর হর্ন বেজে উঠল। বোঝা গেল, নরঘাট থেকে শেষ বাস এসে গেছে যাত্রী নিয়ে।

॥ ২৯ ॥

অফিসে এসে একটা এক্সপ্রেস চিঠি পেয়ে রণজিৎবাবু অবাক হয়ে গেলেন। ডি. ও. লেটারটি লিখেছেন সেচমন্ত্রীর সেক্রেটারী। কালীনগরের নদী-সংস্কারের ব্যাপারে সেচমন্ত্রী কয়েকটা বিষয় সম্পর্কে আরও সুস্পষ্ট হতে চান। যে প্রতিনিধিদল সরেজমিন তদন্তে এসেছিলেন, তাঁরা এই নদী সংস্কার পরিকল্পনা সুপারিশ করেননি। তাঁদের মতে এটা অপব্যয়, অযৌক্তিক। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী এই রিপোর্ট এখনো মেনে নেননি। এখন ক্যাবিনেটে যাবার আগে তিনি কয়েকটি বিষয় জেনে নিতে চান।

সঙ্গে সেই প্রতিনিধিদলের রিপোর্টের ট্রু কপি।

কপিটা পড়তে পড়তে রণজিৎবাবু তীব্র জ্বালা অনুভব করতে লাগলেন। পল্লীর মানুষের প্রতি সামান্যতম সহানুভূতি থাকলে এই পরিকল্পনা গৃহীত হতে বাধ্য। কিন্তু বড় বড় অফিসারদের পল্লীর মানুষের প্রতি দরদের কোন প্রয়োজন নাই, কারণ চাকুরীর উন্নতির পক্ষে এই মানবিক মূল্যবোধ বস্তুতঃ অপ্রয়োজনীয়। ওখানে কলম-

বাজি একমাত্র বস্তু। জিনিসকে যত জটিল করা যাবে, ফাইল যত বড় হবে, রেফারেন্স যত দুর্লভ হবে, অফিসারের মূল্য ত তত বেশী!

কালীনগরের নদীসংস্কার পরিকল্পনাটি অফিসারদের ফাইলের গোলকধাঁধা পেরিয়ে মাননীয় সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি পড়েছে এতেই রণজিৎ-বাবুর আনন্দ। হেড এ্যাসিস্ট্যান্টকে ডেকে তাড়াতাড়ি তিনি কিছু রেফারেন্সের কপি দিতে বললেন। নিজের কাগজপত্র, ম্যাপের ব্লুপ্রিণ্ট, সার্ভের রিপোর্ট ঠিক করে রাখলেন। মাননীয় মন্ত্রীর সেক্রেটারীর কাছে টেলিগ্রাম করে একটা সময় এপয়েণ্টমেণ্ট করে নিলেন।

নির্দিষ্ট সময়ে সেচমন্ত্রীর সঙ্গে রণজিৎবাবু দেখা করতে গিয়ে দেখলেন, সেখানে সেই প্রতিনিধিদলের কয়েকজন আছেন। একটা প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিলের চারিধারে সারি সারি চেয়ার। একটি সেল্‌ফে কিছু বই। টেবিলে দুটো টেলিফোন। দেয়ালে পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র, একটা দেয়াল-ঘড়ি। তাতে কাগজ দিয়ে ক্রুশচিহ্ন দেওয়া, যার অর্থ—আউট অব অর্ডার। অর্থাৎ সময়ের স্পন্দন এ ঘরে এসে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

সেচমন্ত্রী কাগজপত্রগুলো অনেকক্ষণ ধরে গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখলেন। তারপর একসময় মুখ তুলে রণজিৎবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কদ্দিন নীলাপুরে আছেন?'

'বছরখানেক স্যার।'

'এর মধ্যে আপনি বুঝতে পারলেন, নদীটার সংস্কার একান্ত দরকার?'

'হাঁ, স্যার। আমি সারা অঞ্চলটায় ঘুরেছি। প্রতিটি গ্রামের সঙ্গে আমার যোগ আছে। সবখানেই আমি এই মরানদীর কথা শুনেছি। সকলেই বলেছে, নদীটার সংস্কার হলে জলনিকাশের খুব সুবিধা হবে, নদীপারের হাজার হাজার একর জমিতে দু'বার ফসল হবে। এই অঞ্চলের লোকের হাতে বছরে চার মাসের বেশী কাজ

থাকে না, স্যার। অথচ জমি খুব উর্বর, নদীর পলিপড়া জমি। এ জমিতে ধান, পাট, রবিশস্য প্রচুর ফলবে। পাম্পে নদী থেকে জল তুলে আমি কৃষি এ্যাসিস্ট্যাণ্টকে দিয়ে চাষ করে দেখেছি। ফলন প্রচুর হয়।'

'আপনি নিজে চাষ করতে জানেন?' সেচমন্ত্রী সোজা প্রশ্ন করলেন।

'জানি স্যার, আমি চাষী পরিবারের ছেলে।'

অফিসাররা সেচমন্ত্রীকে লুকিয়ে মুখ টিপে হাসতে লাগল।

মুখ কঠিন হয়ে উঠল সেচমন্ত্রীর। তাঁদের দিকে তাকিয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'কিছু মনে করবেন না। আমিও চাষীপরিবারের ছেলে। নিশ্চয়ই আপনারা কেউ নন। এতে কিন্তু লজ্জার বা হাসির কিছু নেই। দেশের শতকরা নব্বুই জন লোক চাষ করেই খায়, আপনাদের সমাজকে তারাই আহার জোগায়।'

আবহাওয়া হঠাৎ কিছুটা গম্ভীর হয়ে গেল।

সেচমন্ত্রী এবার রণজিৎবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার রিপোর্ট আমি পড়েছিলাম। আপনার যুক্তি, পরিচ্ছন্নতা এবং আত্মবিশ্বাস দেখে মুগ্ধ হচ্ছি। কিন্তু পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা সম্পর্কে একটা বাধা হচ্ছে, যে বাধাটা এঁরা বার বার আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ও দিচ্ছেন। তা হল, টাকা নেই। ফাইভ ইয়ারপ্ল্যান-এ নেবার সময় চলে গেছে। পরের প্ল্যান এখন অনেক দেরি। অথচ এই নদী-সংস্কার পরিকল্পনাটা আমার ভাল লেগেছে। ফসল বেশী ফলবে, এইটিই আজকের দিনের বড় কথা। দু'বার ফসল হবে—এ কথা শুনে আমি খুবই উৎসাহ বোধ করছি।'

একজন অফিসার হঠাৎ রণজিৎবাবুকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন, 'আপনার বিরুদ্ধে ডিপার্টমেণ্ট প্রসিডিংস্ ড্র করছে না?'

রণজিৎবাবু চমকে উঠলেন। বললেন, 'হ্যাঁ করেছিল।'

সেচমন্ত্রী অবাক হয়ে বললেন, 'তাই নাকি? অভিযোগটা কি?'

রণজিৎবাবু সেচমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি স্যার অফিসে কয়েকটা নতুন নিয়ম চালু করেছিলাম। যেমন, কেউ ঘুষ নিতে পারবে না, প্রতি দিনের কাজ ফেলে রাখবে না, লোকের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা চলবে না। এই জন্য অফিসে একটা অসন্তোষ জমে ওঠে। তখন থেকে আমার নামে ডিপার্টমেণ্টে বেনামী চিঠি আসতে থাকে।'

তারপর সেই অফিসারকে জিজ্ঞেস করলেন রণজিৎবাবু, 'প্রসিডিংস্ উইথড্র করে নিয়েছে গভর্ণমেণ্ট এ খবরটা সম্ভবতঃ আপনি শোনেননি?'

'কিন্তু আপনি ত আণ্ডার অর্ডার অব ট্রান্সফার।'

'না সে রকম কোন অর্ডার আমি পাইনি।'

সেচমন্ত্রী বলে উঠলেন, 'ওঁর ট্রান্সফারের সঙ্গে এই স্কীমের কি সম্পর্ক আছে?'

সেচমন্ত্রীকে বিনীতভাবে রণজিৎবাবু বললেন, 'স্যার একটা প্রার্থনা আছে।'

'বলুন।'

'নদী সংস্কারের পারমিশন আপনি আমাকে দিন, নদী বাঁধবার অর্ডার দিন আমাকে। আমি স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে নদী সংস্কার করব, বেশী টাকার প্রয়োজন হবে না।'

সেচমন্ত্রী সোজা হয়ে বসলেন; বিস্মিতভাবে বললেন, 'তা, তা কিভাবে সম্ভব?'

'অন্যান্য গরীব দেশে, এই ধরনের কাজ প্রচুর হয়েছে স্যার। রাশিয়া, চীন, যুগোশ্লাভিয়ার সাধারণ মানুষ, যুবক বৃদ্ধ সকলে মিলে বিরাট বিরাট কারখানা গড়েছে, হাজার হাজার একর জমিতে আবাদ করেছে, রেলপথ তৈরি করেছে। আমাদের এই গরীব দেশে তা একবার হয় কিনা চেষ্টা করতে ক্ষতি কি? নদী সংস্কার হলে যারা উপকার পাবে আমি তাদের কাছে বলব, এ কাজ আমাদেরই। প্রতি বাড়ী থেকে একজন করে লোক দাও, যে বিনা মজুরীতে

কাজ করবে। এতেই দু'তিন মাসের মধ্যে কাজ অনেকটা এগিয়ে যাবে, হয়ত শেষও হয়ে যাবে। আপনি আমাকে একটা সুযোগ দিন স্যার।'

সেচমন্ত্রী অবাক হয়ে রণজিৎবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। একথা কেউ কখনো তাঁকে বলেনি। এতদিন তিনি শুনে এসেছেন, জেনে এসেছেন, পরিকল্পনাব কাজ মানে টেণ্ডার, কণ্ট্রাক্টার। এতে মোটা টাকা যায় কণ্ট্রাক্টার আর অফিসারদেব পকেটে। কাজ হয় বড় জোর অর্ধেক টাকার, তাও সময়মত হয় না, ভাল করে হয় না। এ তাঁরা জানেন। কিন্তু প্রতিকারের পথ নেই। অথচ এই টাকাটা যোগায় দেশের দবিদ্র মানুষরা যাদের পেটেব ভাত আর পরনেব কাপড় জোটে না, না হয় বিদেশ থেকে ঋণ করে আনতে হয়। পরিকল্পনার নামে অর্থের এই ধরনের অপচয় ভারতবর্ষ বলেই সম্ভব। তাঁরা একথা জানেন, জেনেও চোখ কান বন্ধ করে থাকেন!

একটু পবে কি ভেবে সেচমন্ত্রী বললেন, 'আপনি পারবেন এই স্কীমে হাত দিতে, গভর্ণমেণ্ট যদি টাকা না দেয়?'

'পারব স্যার। আর যদি ব্যর্থ হই, তাতে সবকাবেব কিছু ক্ষতি নেই। বড় জোর নদীতে ক্রশ বাঁধ দেবার ফলে হয়ত নৌকা চলাচল কয়েকমাস বন্ধ থাকবে।'

সেচমন্ত্রী আবার কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন। মনে করলেন, হোক্ না নতুন পরীক্ষা, যদি কাজ হয়, তবে একটা নতুন দৃষ্টান্ত তৈরী হবে। পরিকল্পনার নামে কোটি কোটি টাকাব অপচয়েব অন্ততঃ একটা সার্থক প্রতিবাদ হবে। রণজিৎ বাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাব শুভেচ্ছা রইল, আমি কাজ দেখতে যাব।' বেল টিপলেন তিনি।

দৌড়তে দৌড়তে উর্দীপরা চাপরাশী এসে দাঁড়াল।

সেচমন্ত্রী বললেন, 'স্টেনোগ্রাফার'।

সেই নিষ্ঠুর লাল বাড়ীটার সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলেন রণজিৎ-বাবু। সারা পশ্চিম বঙ্গের শাসনের স্নায়ুকেন্দ্র, এই হৃদয়হীন কঠিন

বাড়ীটা। ওর লালরঙ যেন গরীব চাষীদের তাজা রক্ত। যারা অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটায়, যাদের অনেকের মাথা গোঁজার ঠাঁই থাকে না, তাদের অর্থ নিয়ে অফিসাররা সেক্রেটারীরা, রাজা বাদশার মত রাজত্ব করেন এখানে। বিদেশী পোশাকে পাইপ টান্‌তে টান্‌তে চিবিয়ে চিবিয়ে ইংরেজী বলেন, চাষীর ছেলে শুনে হাসি সামলাতেই প্রাণান্ত ! আশ্চর্য ! একটা পরগাছা শ্রেণী দরিদ্র মানুষের সব রক্ত শুষে নিয়ে, গড়ে উঠেছে এখানে। অথচ এদের ঘৃণা সেই মানুষদের ওপরেই বেশী।

ভাবতে ভাবতে রণজিৎবাবু ডালহৌসী স্কোয়ারের প্রকাশ্য পথে-এসে দাঁড়ালেন। অজস্র গাড়ী চলেছে, মানুষ চলেছে, যেন একটা মমির মিছিল।

এই রৌদ্রদগ্ধ ডালহৌসী স্কোয়ারের এক পাশে দাঁড়িয়ে রণজিৎ বাবুর মনে হল, এখানে এলে মনে হয় না কোনকালে কোথাও গ্রাম ছিল, সে গ্রামে দরিদ্র মানুষেরা বাস করত, ছিল খাল, বিল, নদী। এসব যেন স্বপ্ন। পেছনে দাঁড়িয়ে সেই উদ্ধত রাইটার্স বিল্ডিংস। এখানে অনেক উত্থান-পতন, অনেক মানুষের অদৃশ্য ভাগ্যলিপি তৈরী হচ্ছে ফাইলের পাতায়।

তাঁর চাকুরী জীবনের ভাগ্যলিপিও হয়ত তৈরী হচ্ছে রাজভবনের নীচের তলায়। ডেভোলাপমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টে একবার যাবেন নাকি ! গিয়ে বলবেন তাঁর বদলীর অদেশটা বাতিল করে দিতে।

একটি খালি ট্যাক্সি যাচ্ছিল। রণজিৎবাবু হাত তুলে ট্যাক্সিটা থামিয়ে তাতে উঠে বসে বললেন, কলেজ স্ট্রীট।

কিছুদিন আগে কয়েকটা বইয়ে-এর অর্ডার পাঠিয়েছিলেন তিনি, একটি বিখ্যাত বইয়ের দোকানের কাছে। বইগুলো বিদেশ থেকে আনতে হবে। এসে থাকলে তিনি নিজেই নিয়ে যাবেন।

ট্যাক্সিটা লালবাজারের সামনে এসে দাঁড়াল। সামনের রাস্তায় গাড়ীগুলো আটক হয়ে পড়েছে। রাস্তায় একটি মিছিল চলছে।

রণজিৎবাবু নিজের কথাটা চিন্তা করতে লাগলেন। যদি বদলীর

অর্ডার আসে তবে তিনি কি করবেন। অর্ডারটা সত্যি দু'চার দিনের মধ্যে এসে যাবে, ঐ অত্যুৎসাহী অফিসার খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পাঠিয়ে দেবেন। আচ্ছা, তার উপর ঐ অফিসারের এত রাগ কেন? মাঝে মাঝে এমনি হয়, যার সঙ্গে একটি কথাও জীবনে হয়নি, পরিচয়ও নেই, অথচ মন আপনা আপনি তার বিরুদ্ধে কেন যেন তৈরী হয়ে থাকে। মনের এ এক বিচিত্র গতি!

তবুও মনে হল, এ ছাড়াও এক্ষেত্রে কোন কারণ থাকতে পারে। মনে হচ্ছে কোথাও যেন এই লোকটিকে তিনি দেখেছেন। বিস্মৃতি থেকে যোগসূত্রটা উদ্ধার করতে চেষ্টা করলেন তিনি। হাতের ফাইলটা খুলে দেখলেন, রিপোর্ট-স্বাক্ষরকারীদের নামগুলো। হ্যাঁ, নামটি পাওয়া গেছে। নামটি দেখেই তাঁর মনে পড়ল, কাঁথিতে বিয়াল্লিশের আন্দোলনের সময় ইনি ছিলেন। চেহারাটা মোটা হয়েছে। পাইপ টানার অভ্যাসটা ঠিক আছে। একবার তর্ক হয়েছিল ঠিক আন্দোলনের আগে। রণজিৎ তখন ঈশ্বরপুর স্কুলের ছাত্র। মনে পড়েছে, ঠিক মনে পড়েছে—এই সেই শয়তান, যে তার বন্ধু বিভূতিকে থানা আক্রমণের সময় পশুর মত গুলি করে মেরেছিল।

হাঁ, মনে পড়েছে। জেল থেকে সব শুনেছিলেন, সেই থানা আক্রমণের ইতিহাস। মহকুমা থেকে এই অফিসারটি এসেছিল থানা রক্ষা করতে। মনে পড়েছে, পাখির মত নিরস্ত্র মানুষগুলোকে গুলী করে মেরেছিল ঐ লোকটা। বিভূতি সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল, হাতে কংগ্রেসের পতাকা। তার বন্ধু বিভুতি, নামকরা ছেলে ঈশ্বরপুর স্কুলের। উনিশ শ' বিয়াল্লিশের আন্দোলনে পড়া ছেড়ে দিল। বললে, আগে দেশ স্বাধীন হোক্, তারপর পড়াশুনো।

এগিয়ে যাচ্ছিল বিভূতি থানার দিকে, সে থানায় পতাকা তুলবে। গর্জে উঠেছিল এই শয়তানের হাতের বন্দুক। বিভূতি লুটিয়ে পড়েছিল মাটিতে। তারপর কেবল গুলীর শব্দ, পাখির মত সত্যাগ্রহীরা ঈশ্বরপুরের সেই রাস্তাটায় পড়ে যেতে লাগল, ধুলো লাল হল মানুষের তাজা গরম রক্তে।

এখন সব মনে পড়েছে তাঁর, মনে পড়বেই। এ ঘটনাকে কে ভুলতে পারে? যেমন করে শিকারী আহত পাখিটার ঠ্যাং ধরে টেনে আনে, তেমনি করে এই শয়তান, বিভূতির পা ধরে থানা কম্পাউণ্ডের মধ্যে টেনে এনেছিল। না, কোন চিকিৎসা করা হয়নি, করার প্রশ্ন ওঠে না। কারণ যে মানুষ মরণোন্মুখ বিভূতিকে এক ফোঁটা জল খেতে দেয়নি, সে চিকিৎসা করাবে—এ যে চিন্তারও অতীত! বিভূতি পরদিন থানায় মারা যায়। পরিচ্ছন্ন স্যুট আর পাইপের আড়ালে সেই সরীসৃপের মত মানুষটা এখনও লুকিয়ে আছে! আশ্চর্য পরিহাস! আজ সেই বন্ধু-হত্যাকারীর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। যদি সেইখানেই তিনি জানতেন, চিনতেন তাকে? তবে কি করতেন? টুঁটি টিপে ধরতেন তাঁর? বলতেন, বাংলা দেশের একজন যুবক অন্ততঃ একটা নরঘাতী পশুর প্রকাশ্য প্রতিশোধ নিতে চায়, তাতে বিভূতির আত্মার কল্যাণ হত।

আশ্চর্য একটা নির্বীর্য দেশ! এতবড় ঘৃণ্য কসাই খুনীগুলো সমাজে মাথা উঁচু করে বেড়ায়! হাঁ, সব মনে পড়েছে রণজিৎবাবুর। একটা পাগল-করা বেদনায় অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। একবার ইচ্ছা হল, ফিরে গিয়ে সেই অফিসারটিকে তিনি জিজ্ঞেস করবেন, বিভূতিকে এক ফোঁটা জল দেননি কেন আপনি? বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট না বলেছিল? জল দিলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ রসাতলে যেত? যারা অত্যাচারের এই জঘন্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে, তাদের কাছে দেশের দরিদ্র মানুষ উপকার পাবে, সহানুভূতি পাবে, সাহায্য পাবে, এত বড় ভুল মিথ্যা বিদ্রূপ পরিহাস আর কিছু হতে পারে না! জনকল্যাণের নামে এ একটা প্রহসন, অভ্রভেদী তামাসা! স্বাধীন সরকার কেন, কেন এই মানুষগুলোর বিচার করেনি? কর্তব্যবোধ নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু তার বেশি চাই মানবতাবোধ। এই মানবতাবোধকে পদদলিত করে যারা ইংরেজের পদলেহনের তৈলসিক্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, কেন সরকার তাদের বিচার না করে তাদের মাথায় তুলে নাচবে! কেন? কেন?

॥ ২৮ ॥

সূর্য নেভার আগে পশ্চিম দিগন্ত থেকে হঠাৎ মেঘের আবরণ সরে গেলে যেমন অরৌদ্র প্রান্তরে আবির আলোর রং বিছিয়ে পড়ে, নন্দিতা তেমনি কয়েকদিনের জন্য ভাল ছিল। এই ভালর আসল ছবিটা শুধু অসিতের চোখে ধরা পড়েছিল। তাই সে কলকাতা থেকে ফিরে নন্দিতার ভাল থাকায় খুশি হয়নি আদৌ। নন্দিতার সেই তানপুরার জন্য কান্না, হাসপাতালে না যাওয়ার জন্য কান্না, এগুলির প্রতিটির তাৎপর্য অসিত বুঝতে পেরেছিল। সে আশঙ্কা করছিল, যে কোন সময় একটি ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে পারে।

সারাদিনের ক্লান্তি নমিতার চোখে মুখে। স্কুল থেকে বাসন্তী, গৌরীশংকরবাবু চলে গেছেন। নমিতা শুনেছে বাসন্তীর ছেলে হবে। নতুন মিস্ট্রেস এখনো আসেনি। উমা, নন্দিতার অসুখের জন্য প্রায়ই স্কুলে যেতে পারে না। নমিতা নিজেই এখন বেশী ক্লাস নেয়। তা' ছাড়া, কাজ এখন বেড়েছে। প্ল্যান, এস্টিমেট এখনও মঞ্জুর হয়নি, হয়ত এ বছর হবে না, ফাইন্যানসিয়াল ইয়ার শেষ হয়ে যাবে। যাক্, নমিতা ঘুষ দিতে রাজী হয়নি। সে ঘুষ দেবে না, স্কুল যদি উঠে যায় যাবে। দরকার হলে সে চাকরি ছেড়ে দেবে, তবু দুর্নীতির পথে যাবে না।

অবশ্য হেডমিস্ট্রেসের কাজ যে গভর্ণমেণ্টের অফিসে গিয়ে তদ্বির-তদারক করা, অফিসারদের মন জুগিয়ে চলা, কেবল পড়াশুনোর কাজ নয়—এ কথাটা নিশিকান্তবাবু নমিতাকে বোঝাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। শুধু পড়িয়ে কি হবে, নিশিকান্তবাবু তা বুঝতে পারেন না। ওতে কি নাম হবে? বড় বড় বাড়ী হবে? তবে আখেরটা কি? নীলাপুর এখন গড়ে উঠেছে। কে না জানে হয়ত একদিন এটা গার্লস কলেজ হবে, আর নিশিকান্তবাবু হবেন তার গভর্নিং বডির

চেয়ারম্যান। কিন্তু নমিতার দৃষ্টি সেদিকে নেই। এমন অপদার্থ হেড্‌মিস্‌ট্রেস তাঁর সেক্রেটারী জীবনে নিশিকান্তবাবু কখনও দেখেননি। নমিতা এসব শুনেছে, কিন্তু কিছু বলেনি।

অসিত চলে যাবে, অসিতের দেশ ছেড়ে সে যাবে না। অসিতের সমস্ত স্মৃতি, স্বদেশ বাবুর ইতিহাস, সব কিছুকে নিয়ে নমিতা এইখানেই থাকবে। এই খানেই সে শবরীর মত প্রতীক্ষা করবে, একদিন কে যেন আসবে, যেমন করে সে একদিন অপরিচিতার মত এসেছিল এই নদী দিয়ে। তখন আর অপরিচয় নয়—তখন বিস্ময়—সুন্দর বিস্ময়! ··· বহুদিন পরে অসিত দেশে ফিরেছে। কতদিনের অদেখা, কতদিনের প্রতীক্ষিত জীবন, কত আনন্দ, বেদনা, কান্না তখন এ পথের নির্জনতায় বেজে উঠবে।

ওরা দু'জনে নন্দিতার বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছিল।

বিছানার সঙ্গে মিশে শুয়ে ছিল নন্দিতা। অস্নাত চুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল বালিশে। শীর্ণ হাতের শীর্ণতর আঙুলগুলোতে মলিনতা জড় হয়েছে।

'আমাকে একটু দেখ না অসিতদা'—নন্দিতা নিজেই আজ আস্তে আস্তে বলল।

উমা বলল, 'ও সারাদিন কেবল বলছে অসিতদাকে ভাল করে দেখতে বল। অথচ এম্‌নি ভাল আছে, যন্ত্রণা নেই, ব্লাডও যাচ্ছে না।'

অসিত স্টেথস্‌কোপটা কানে লাগাতে লাগাতে বলল, 'আচ্ছা তোমাকে খুব ভাল করে দেখছি। তাহলে খুশি?'

রোগশীর্ণ মুখে নন্দিতা সুন্দর করে হাসল।

দেখতে দেখতে অসিত বলল, 'খুব গান গাইতে ইচ্ছে করছে নন্দিতা, তাই না?'

'খু—ব খু—ব ইচ্ছে করে। পার্টনার গাইতে দেয় না। আঃ সব ভুলে যাচ্ছি অসিতদা। কতদিন জয়জয়ন্তী, দরবারী কানাড়া, গাইনি। জান অসিতদা, সে—ই যেবার ওস্তাদ কাদের বক্সের বাড়ী

গেছলাম, লালবাগে ; ওস্তাদজী বলেন কিনা,—লিখাপড়া শিখ্-কে ক্যা হোগা বেটি—গান করো, আচ্ছাসে গলা সাধো। গাও ত বেটি একঠো ইমন। একটা সাইকেল রিক্সা যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে, হর্ন দিচ্ছিল। আমাকে হঠাৎ ওস্তাদজী বলে উঠলেন, সুর পকড় লেও বেটি—বোলো, হর্নমে কোন সুর বোলতা হ্যায় ?

'আমি ত অবাক ! একদম বোকা বনে গেছি। তারপর খুব মন দিয়ে শুনে বললাম—বি ফ্ল্যাটেব কড়ি মধ্যম বলছে। আঃ, ওস্তাদ কি খুশি তখন ! তা উনি আমাকে সেদিন নিজেরই লেখা একটা ইমন একটু শুনিয়েছিলেন।

'আঃ, কি গলা অসিতদা ! ইস্ ! আজ আবার ইনজেকসান ?'

নন্দিতা একদৃষ্টে ইনজেকসানেব সিরিঞ্জটাব দিকে তাকিয়েছিল। তাকাতে তাকাতে তার চোখে জল এল !

নন্দিতা কী এক গভীর অনুভূতির স্পর্শে আজ অসিতদার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল বোবা চোখ মেলে !

নমিতার ঘরে এসে চুপ কবে চেয়ারটায় বসেছিল অসিত। নন্দিতার হার্টের অবস্থা খুব খারাপ। চোখের চারধাবে ছায়া। অসিত বহুদিন হাসপাতালে বোগীর চোখে এ ছায়া দেখছে। এ ছায়া, ছুটিব ছায়া।

নমিতা চা করে নিয়ে এসে কাছে বসতে বসতে বলল, 'তুমি মৃত্যুর কথা ভাবছ কেন ?'

অসিত এ প্রশ্নের কোন জবাব দিল না।

ধীরে ধীরে বাত বেড়ে উঠেছিল। ওঘরে নন্দিতা তানপুরা বাজাতে বাজাতে খুব নিচু গলায় আলাপ করছে, ওর সব চেয়ে প্রিয় রাগ জয়জয়ন্তী।

তাবপর খুব নিচু পর্দায় একটা রবীন্দ্র সংগীত ধরল, 'পথ এখনো শেষ হল না মিলিয়ে এল দিনের ভাতি '।

রাত্রি আরও ঘন হল। অন্ধকার জড়ো হয়ে উঠল কবরের মত দূরের মাঠে, মরানদী আর বাবলা বনে।

নন্দিতা খুব আস্তে আস্তে গাইছে, 'ভালো করে মুখ যে তোমার যায় না দেখা সুন্দর হে—'

অন্ধকারে সুন্দরের মুখ অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ঘরের আবছা অন্ধকারে অসিতের মুখটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। নমিতা অনেকক্ষণ চেয়েছিল সেদিকে। অসিত যেন একটা ক্যানভাসে আঁকা করুণ স্থিরচিত্র!

নমিতার আজ কেন যেন মনে হল, সে একবার বলে—তুমি ত চলে যাবে। আজ এখানে থেকে যেও না। আমি ভাবব, এই ঘরে সারা রাত তুমি একদিন ছিলে। জানো, তুমি ঘরে এলে আমার ঘর ভরে ওঠে। আমি ভাবব, এই বিছানায়, চেয়ারে, এই বইগুলোর মধ্যে তোমার স্পর্শ আছে। তুমি যখন থাকবে না, তখন প্রতিদিন এগুলো গুছোতে গুছোতে সেই কথা আমার মনে পড়বে।

কিন্তু একথা সে কিছুতেই বলতে পারল না!

নির্বাক নমিতা শুনতে পেল, অসিত অন্ধকারে সাইকেল নিয়ে চলে যাচ্ছে। আজ আর সে বাইরে দাঁড়িয়ে তার যাবার দিকে তাকিয়ে থাকল না।

ঘুমুবার আগে অসিত নমিতার কথাই ভাবছিল। ভাবছিল, কিছু ক্ষণ আগে ফেলে আসা একটি সুন্দর প্রথম রাত্রির কথা। অসিত যেন ধীরে ধীরে কোথায়, কোন্ গভীরে হারিয়ে যাচ্ছিল। নমিতার কথা ভাবলেই—সে একটি সুন্দর বেদনার আভাস পায়। যে বেদনা অসিত জীবনে আর কখনো পায়নি। এই বোধ হয় প্রেম—এই বোধ হয় জীবনের সবচেয়ে ঐশ্বর্যময়, সবচেয়ে মধুর, সুন্দর পরিচ্ছেদ।

নমিতা সমস্ত ভালবাসাকে আজ রাত্রির প্রথম প্রহরে একটি সতেজ গন্ধরাজের মত তার কাছে তুলে ধরেছিল। নমিতা এতো সুন্দর, এতো উজ্জ্বল, এতো স্নিগ্ধ অসিত তা জানত না। সেই মুদ্রিত দুটি চোখ, পিঠে ছড়ানো দীর্ঘ অজস্র চুল, বাইরে অন্ধকার—সমুদ্রের মত গভীর, গম্ভীর। একটি পবিত্র আলিঙ্গনের মধ্যে যে এতো আনন্দের পুঞ্জীভূত অতলতা আছে, অসিত তা জানত না।

তার সমস্ত দেহ, মন, জীবন, এক অজানা ফুলের গন্ধে আজ ভরে গেছে !

আশ্চর্য ! তার পাশেই মৃত্যুর ছায়া।

অসিত ভাবছিল, আজ নন্দিতা কেঁদেছিল। কেন কেঁদেছিল ? ওর কান্না কেন আমি সইতে পারি না ! ও কি কোন জন্মে আমার বোন ছিল ! কেন এতো ইচ্ছা করে ওর সকল যন্ত্রণাকে নিজের বুকে তুলে নিতে ? নন্দিতা আমার কে ?

নন্দিতা এত যন্ত্রণা পেয়েছে, কই, কোনদিন কাঁদেনি ত !

আজ কেঁদেছিল, হয়ত চলে যাবার বেদনায়। নন্দিতা বুঝতে পেরেছে, ওর ইন্দ্রিয়াতীত চেতনা আছে। নন্দিতা কবি, নন্দিতা যে সত্যিকারের শিল্পী। জীবনে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু পবিত্র, যা কিছু আনন্দ, নন্দিতা তারই প্রতিনিধি। কবিকে, শিল্পীকে চেতনার সীমার বাইরে চোখ মেলতে হয়, যেখানে কত বিচিত্র জগৎ উৎসারিত, সাদা চোখে যা আমরা দেখি না।

সেই অন্ধকার ভরে-আসা ঘরে নন্দিতা জয়জয়ন্তী আলাপ করেছিল। আশ্চর্য লেগেছিল অসিতের। এ ঘরে যখন জীবন প্রেমের স্পর্শে পূর্ণ হয়ে উঠেছে, কানায় কানায় ভরে উঠেছে, ওঘরে তখন মৃত্যুর সংগীত। 'পথ এখনো শেষ হল না—মিলিয়ে এল দিনের ভাতি'........

ধীরে ধীরে ঘুম আসছে অসিতের। তবু এই দু'টি ছবি তার ঘুমের আসন্ন মুহূর্তগুলির মধ্যেও দূরাগত বাঁশির সুরের মত ভেসে ভেসে আসছিল।

নমিতা আজ একটুও ঘুমোয়নি। এমন সুন্দর রাত্রিকে সে ঘুমের মৃত্যুর মধ্যে হারাতে চায় না। সারা জীবনের রাত্রিগুলো ত ঘুমের জন্য তোলা আছে। আজ সে এই অনিদ্র ঘরে, এই অন্ধকারে একজনের ধ্যান করবে। এই অগোছালো বইগুলির অলস ছবিতে অসিতের স্মৃতি ছড়িয়ে আছে, যে অসিত তার জীবনের ভিত্‌কে কঠিন

নাড়া দিয়ে তাকে একটি রাত্রির আনন্দে পাগল করে গেছে। যার স্পর্শে দেহের সমস্ত অঙ্গ মগ্ন হয়েছে, পুণ্য হয়েছে, ধন্য হয়েছে। জীবন যে এতো গভীর, সুন্দর, স্তব্ধ, নমিতার সমগ্র অনুভূতির উপলব্ধির বাইরের প্রাঙ্গণে তা এতদিন পড়েছিল।

অসিত আজ তার সব আবরণ দূরে সরিয়ে তাকে ভালবাসার এক আশ্চর্য বিশুদ্ধ আলোকে টেনে এনেছে। এই অন্ধকার রাত্রিতে, দূরের নদীর প্রশান্ত, নিদ্রিত, প্রবাহিত জীবনধারার নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে, বাবলা বনের ধ্যানমৌন ছবিতে, নমিতা নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করল!

রাত্রি শেষ হতে চলেছে।

কতটুকু পথ এখান থেকে নীলাপুব স্কুল? অসিত চলেছে, জোরে চলেছে, যত জোরে পাবে চলেছে তার বহুদিনের বিশ্বস্ত সাইকেলটায়।

পথটা যেন শেষ হচ্ছে না আজ! কিছুতেই না! ঐ ত সামনে শ্মশান, অন্ধকারের শূন্যতায় হাঁ করে তাকিয়ে আছে। অসিত কবরখানাটা, শিরীষ গাছগুলো পেরিয়ে এল। সামনে একটি ছোট নালার মত। খেয়াল ছিল না। যাবার সময় নেমে গেছল অসিত। এখন নামল না, তারি উপর দিয়ে জোরে চালিয়ে দিলে সাইকেলটা। চেন আর মাডগার্ডের বিশ্রী শব্দটা নদীর কালো জলের উপর বিছিয়ে পড়ল।

দূরের কোন গ্রাম থেকে কুকুরের চীৎকার ভেসে আসছে! সামনে ওটা কি জ্বলছে? না কিছু নয়, খেঁকশিয়ালের চোখ রাত্রে এমনি জ্বলে। আবার ওটা কি? প্রকাণ্ড কালো দৈত্যের মত কি একটা যেন এগিয়ে আসছে? মাঠে নেমে গেল দৈত্যটা—একটা কালো ষাঁড়। এখন কেবল মাটিতে সাইকেলের চাকার শব্দ।

নমিতা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল।

অসিত নেমেই জিজ্ঞেস করল, 'এখন কেমন ?'

নমিতা শুধু বলল 'ভেতরে চল।'

নন্দিতা শুয়ে আছে। বিছানায় রক্তবমির ছাপগুলো এখনো এখানে-ওখানে লেগে আছে। নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে নন্দিতা। এখন আর রক্তবমি করছে না, হয়ত শরীরে রক্তের উৎস শুকিয়ে গেছে।

অসিত কপালে হাত রাখল নন্দিতার।

নন্দিতা চোখ মেলে চাইল। সে ঘোলাটে চোখে দূরের যাত্রার আভাস।

অসিত নাড়ী দেখল, বুক দেখল, চোখের পাতা টেনে টেনে দেখল।

একটা ইনজেকসান দিল তাড়াতাড়ি।

মৃত্যুকে অপেক্ষা করতে হবে কিছুক্ষণ, থমকে দাঁড়াতে হবে একবার।

উমা একটা নিষ্প্রাণ ছবির মত দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে ছাত্রী, শিক্ষিকারা ভীড় করে এসেছে।

নমিতা আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন ?'

ইন্‌জেকসানের সিরিঞ্জটা খাপে বন্ধ করতে করতে অসিত বলল; 'ভালই।'

'ভয়ের কোন কারণ নেই ?'

'না, নির্ভয়। নিশ্চিন্ত !'

উমা বলে উঠল, 'নন্দিতার হাতগুলো কেন বড় ঠাণ্ডা অসিতদা ?'

অসিত নন্দিতার হাতটা টেনে নিয়ে বলল, 'কই, না ত ?' পায়ে হাত দিয়ে দেখল অসিত—মৃত্যু যেখানে তার শীতল আস্তরণ ধীরে ধীরে বিছিয়ে চলেছে।

নন্দিতা ঘোলাটে চোখ মেলে একবার তাকাল। অসিতকে দেখে অস্পষ্ট ভাষায় বলল, 'আমি কোথায় অসিতদা ?'

'এইত ঘরে।'

'কই, তোমার হাতটা দাও না?'

নন্দিতা অসিতের হাতটা জড়িয়ে ধরল। 'পার্টনার? পার্টনার কোথায়?'

উমা নন্দিতার কপালে হাত রেখে বলল, 'এই যে আমি, তোর কাছেই!'

'কই তোর হাতটা দে না রে? না আমি হাসপাতালে যাব না। নমিতাদি? নমিতাদি কোথায়? বাবা, বাবা আমি তোমার কাছে যাব—বাড়ী যাব। তারগুলো এনেছিলি পার্টনার? 'শেষের সুর যে বাজাবে তার আসার সময় হল!'

চোখ বুজে আসছে নন্দিতার। নন্দিতা ঘুমিয়ে পড়ছে বালিশে মাথা রেখে। খোলা চুলগুলো বালিশে ঢেকে গেছে। সেই চুলের অরণ্যে নন্দিতার মুখটাকে এখন একটা রক্তপদ্মের মত মনে হচ্ছে অসিতের।

'ও কি? উমা, ও রকম করে না, ধৈর্য ধর, মনকে শক্ত কর।'

পাগল উমা নন্দিতার বুকে লুটিয়ে পড়ল—'নন্দিতা চলে গেছে অসিতদা। তুমি পারলে না, তাকে বাঁচাতে পারলে না, তুমি এত বড় ডাক্তার। তবু নন্দিতাকে বাঁচাতে পারলে না?'

একি! নমিতার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে কেন? কিন্তু ওরা সবাই কাঁদুক, অসিত কাঁদবে না। সে ডাক্তার, মৃত্যুকে সে দেখেছে, চিনেছে। সে জানে জীবন ও মৃত্যু, সংসারে বড় সহজ, বড় সাধারণ ঘটনা!

তবু এই রাত্রির শেষে, এই মৃত্যুর কাছে দাঁড়িয়ে, নন্দিতার চলে যাবার দিনে তাকে স্পর্শ করে, আশীর্বাদ করে, অসিতের চোখ জলে ভরে আসতে চায় কেন?

সারা নদীতে, বাবলা বনে, মাঠে এখন রাত্রিশেষের অন্ধকার-ভাঙা আলোর জাগরণ। পূর্ব দিগন্ত ফাঁকা হয়ে আসছে। রাত্রির কালো আবরণ খুলে ফেলে এবার ভোরের আলো ফুটবে।

অসিত আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।

কে যেন সাইকেল থেকে নামল। হ্যাঁ। বি. ডি. ও. রণজিৎবাবু এসেছেন।

সাইকেলটা দেয়ালে ঠেকিয়ে রেখে অসিতের হাত ধরে রণজিৎবাবু অবাক হয়ে বলে উঠলেন, 'এ কি! আপনার চোখেও জল?'

ওস্তাদের শেষশয্যা যেখানে পাতা হয়েছিল তারই একপাশে নন্দিতাকে শুইয়ে রাখার আয়োজন শেষ হল। নীলাপুরের লোক ভিড় করে এসেছে আজ। এসেছে সেটেলমেণ্ট অফিস, বি. ডি. ও. অফিস, কো-অপারেটিভ্ অফিসের স্টাফরা, বয়েজ স্কুল আর গার্লস স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা। ট্রাকের ড্রাইভাররাও বাদ নেই। নন্দিতা যে খুব সুন্দর গান গাইত, সেই নন্দিতা মারা গেছে। নীলাপুরের লোক শেষবার দেখতে এসেছে তাকে।

অজানায়, অগোচরে কখন নন্দিতা সকলের মন জয় করেছিল হতভাগী তা নিজেই জানত না।

নন্দিতার মুখাগ্নি করেছে উমা। তারপর সারা সময় নমিতার কোলে হাত রেখে বসেছিল চিতার আগুনের দিকে তাকিয়ে। তার জীবন শূন্য হয়ে গেছে, নন্দিতা নেই। অথচ সে চলে গেছে, এই সত্যটা উমার চেতনায় আসছে না।

কী অসীম শূন্যতা, কী একটা গভীর বেদনায় উমা মৃত্যুর মত স্তব্ধ চোখে শুধু চিতাটার দিকে তাকিয়ে ছিল। কয়েক বছর ধরে নন্দিতা তাকে ঘিরে ছিল ছায়ার মত। জীবন এত ক্ষুদ্র, এত অনতিদীর্ঘ হয় কেন? কেন মানুষ হারিয়ে যায়, এমনি করে তাকে দাহ করতে হয়? আশ্চর্য! নন্দিতা ঠিক জায়গাটা বেছে নিয়েছে। ওস্তাদের চিতার পাশে, নদীর একেবারে কোলে, শিরীষ গাছগুলোর আড়ালে। জোয়ারের জল ঠিক ছুঁয়ে যাবে তাকে। মহাসমুদ্রের সংগীতের স্পর্শ পাবে নন্দিতা, এইখানে শুয়ে শুয়ে, মাটির বিছানায় মাথা রেখে, অজস্র ঘাসের সবুজের মধ্যে। আর বিরাট আকাশ বিছিয়ে থাকবে ধ্রুপদের আলাপের মত।

॥ ২৯ ॥

আজ মিটিংএর দিন। বিকেল থেকেই নীলাপুরে লোক জমতে শুরু করেছে, হাজার হাজার লোক। গ্রামের মেয়েরাও এসেছে। নদীর উঁচু পাড়ে, পুলের ওপরে, হাটচালায় এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে তারা। স্বেচ্ছাসেবকরা চেয়ার-টেবিল পাতছে, মাইক আনছে।

দেখতে দেখতে মাঠটা ভর্তি হয়ে গেল। কোথাও আর এতটুকু জায়গা নেই। ধীরে ধীরে মঞ্চে এসে বসল অসিত, রণজিৎ বাবু, নমিতা, উমা।

বি. ডি. ও. রণজিৎবাবু উঠে দাঁড়ালেন। অসিতকে সভাপতির আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ জানিয়ে বললেন, আপনাদের এক নতুন অভিযানে অংশগ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। আপনারা জানেন, এই যে মরানদী কতকাল থেকে আপনাদের জীবনের সঙ্গে মিশে আছে, এই নদীর সংস্কারের জন্য আমি সরকারকে লিখেছিলাম। সরকার যে প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন, আমি সব রকম যুক্তি দিয়েও, এই পরিকল্পনার প্রতি তাঁদের সহানুভূতি জাগাতে পারিনি। কিন্তু মাননীয় সেচমন্ত্রী এই পরিকল্পনার উপকারিতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েছেন। তখন প্রশ্ন এল, টাকা নেই। টাকা আসবে কোত্থেকে! পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ওটা নেবার সময় নাই, পরবর্তী পরিকল্পনায়— এটি নিশ্চয়ই নেওয়া হবে একথাও কেউ বলতে পারেন না। এবং তারও অনেক দেরি। এই অবস্থায় আমি আপনাদের লোক হিসেবে, আপনাদের ভালবাসার দাবিতে, সেচমন্ত্রীকে বলেছিলাম, আপনি নদী বাঁধবার আদেশ দিন, আমি স্বেচ্ছাশ্রমের দ্বারা এই নদী সংস্কার করব। আজ আপানাদের কাছে আপনাদের সমর্থন ভিক্ষা করতে দাঁড়িয়েছি। এই নদী জীবন্ত হলে, এর চারপাশের শত শত

গ্রাম জীবন্ত হয়ে উঠবে, জমিতে দু'বার ফসল ফলবে। কাজেই এ কাজ আমাদের, তা আমাদেরই করতে হবে। পৃথিবীর নানান নতুন স্বাধীনতা-পাওয়া দরিদ্র দেশে এর চেয়েও বিরাট বিরাট পরিকল্পনা দেশের মানুষ স্বেচ্ছায়, কোন মজুরী না নিয়েই, করেছে। এই ভারত-বর্ষে, নীলাপুরই প্রথম সেই পথের শপথ নেবে।'

চারদিক থেকে হাততালি পড়তে লাগল। সেই হাততালির শব্দ থামলে, অসিত আস্তে আস্তে মাইকের সামনে এগিয়ে এল। তাকিয়ে দেখল, চারদিকে কেবল মানুষ, হাজার হাজার মানুষ। নীলাপুরে এতো বড়ো জনসমাবেশ আর কখনও হয়নি!

বিস্মিত অসিত শান্ত কণ্ঠে বলতে লাগল, 'আমার পরম বন্ধু রণজিৎ বাবু যিনি নীলাপুরকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছেন, তাঁর ব্রতের কথা আপনারা শুনেছেন। এই ব্রত উদ্‌যাপনে অংশ গ্রহণ করার আমি সময় পেলাম না। আমি বিশ্বাস করি, মানুষকে আহ্বান করতে জানলে মানুষ না সাড়া না দিয়ে পারে না। রণজিৎ বাবুর আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে আমারও অনুরোধ যুক্ত করলাম। নীলাপুরের নতুন অভিযানের সৈনিক নতুন সৃষ্টির কর্মীদল আমার যুবক বন্ধুগণ এগিয়ে আসুন। যে নদী আমাদের জীবন দেবে—নতুন জীবন, সেই নদী আমাদের শক্ত হাতের কোদালের আঘাতে আঘাতে প্রস্তুত হোক। সমুদ্রের বিস্তীর্ণ প্রাণ, দুর্বার স্রোত এই শীর্ণ নদীর জীবনে নতুন স্রোতের আশীর্বাদে আবার অবারিত হোক। নীলাপুরের সমস্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে আমার আবেদন, আপনারা মাটির ঋণ, দেশের ঋণ, স্বাধীনতার ঋণ শোধ করুন—এই সৃষ্টিযজ্ঞের সঙ্গে যুক্ত হয়ে।'

সমবেত জনতার মধ্য থেকে মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হল 'আমরা নিজেরাই মাটি কাটব।' 'আমরা সরকারের টাকা চাই না।' 'কবে থেকে কাজ হবে।' সেই শব্দ কতক্ষণ প্রতিধ্বনি হ'ল নীলাপুরের আকাশে, মাটিতে আর মরানদীর জলে। অসিত থামল ক্ষণকালের জন্যে।

তারপর বলল, 'এই সাড়া না পেলে, আমি ভাবতাম এই গ্রামের মানুষকে ভালবাসা আমার ব্যর্থ হয়েছে।

সভা এখন নিঃশব্দ।

নমিতা আস্তে আস্তে উঠে এল মাইকের সামনে। তারপর খুব শান্ত গলায় বলল, 'নীলাপুরের এই নতুন অভিযানে একজন সাধারণ স্বেচ্ছাসেবিকা রূপে কাজ করার সুযোগ পেলে আমি ধন্য হব।'

সভার এককোণ থেকে নীলা আস্তে আস্তে মঞ্চের দিকে এগিয়ে এল। তারপর অসিতের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমিও কাজ করব, অসিতদা।'

অসিত হেসে তাকাল নীলার দিকে।

সারা সভায় যেন একটা উৎসাহ ও উন্মাদনার ঝড় বয়ে গেল। কিছুক্ষণ কারুর কোন কথা বোঝা গেল না। ভিড় ঠেলে কে একজন এগিয়ে আসছে বুক ফুলিয়ে? হাঁ, এগিয়ে আসছে অর্জুন, সেটেলমেণ্ট অফিসের পিয়নের চাকরী ছেড়ে দিয়ে তার ছাতিটা আরও চওড়া হয়েছে। চীৎকার করে বলল অর্জুন, 'আগে আমার নামটা লিখুন ডাক্তার বাবু।

আমি মাটি কাটব। আমার নাম লিখুন—আমার নাম লিখুন।'

নাম আসছে একের পর এক, অজস্র। স্বেচ্ছাসেবকেরা লিখে উঠতে পারছে না।

নীলাপুরের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের উদ্বোধন হল আজ।

॥ ৩০ ॥

গভীর উদ্বেগ নিয়ে জেল গেটে অনেকক্ষণ বসেছিল অসিত। বাইরে যাওয়ার আগে বাবার সঙ্গে দেখা করে যেতে চায়। একটা প্রকাণ্ড লোহার কপাট সামনে, যেন দু'শ বছরের একটা কঠিন

অচলায়তন। খুব উঁচু লাল রঙের শক্ত পাঁচিল-ঘেরা এই সাব্‌জেলের ভেতরে কারা আছে, তাদের জীবনযাত্রা কি রকম, কি অপরাধে বা কি অভিযোগে তারা এই প্রাচীরের অন্তরালে বন্দী রয়েছে, অসিত তার কিছুই জানে না।

এ যেন চেনা জগতের বাইরে একটা একান্ত অচেনা রহস্যময় দ্বীপ। লোহার গেটের মাঝখানে একটা কাটা দরজা রয়েছে। দু' একজন খাঁকি পোশাকপরা সেপাই, মাথা নিচু করে তার মধ্য দিয়ে মাঝে মাঝে যাতায়াত করছে।

অসিত মনে মনে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল।

সামনের হাতলহীন জীর্ণ চেয়ারটায় বসে যিনি কাজ করছেন, তিনি জেলার না কেরানী, তা অসিত ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না।

একটু দূরে গেটের সামনে একজন পাকা গোঁফওয়ালা বৃদ্ধ সিপাই খৈনি তৈরি করছিল বসে বসে। কোলেব ওপর একটা কাঠের রুল জাতীয় ছোট্ট হাতিয়ার। একধারে ছেঁদা করে দড়ি বাঁধা।

অসিত ভাবছিল, বন্দীদের ওপর বোধ হয় এটার ব্যবহার হয়ে থাকে। আচ্ছা! বাবার ওপরেও কি এর দুর্ব্যবহার করে? বাবার খুব কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়ই। এবং এ বয়সে জেলের কষ্ট সহ্য হওয়া, স্বাস্থ্যের পক্ষে অসম্ভব। বাবাকে সে কি অবস্থায় দেখবে এখনও ঠিক ভাবতে পারছে না।

অসিতের কাছে স্বদেশবাবুর এই আত্মনিগ্রহ অর্থহীন। তার বড় দু;খ হয়, বাবার রাজনৈতিক জীবনের আদর্শ, ধারণা বড় পুরনো। কখানো এঁরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে অহিংসা, সত্যাগ্রহ—এগুলোকে বিচার করে না। সবটাই অপরিণত ভাববাদ, এ যুগে তা অচল। সত্যি ত, কয়েকদিনের মধ্যেই নীলাপুরের আন্দোলনটা কেমন স্তিমিত হয়ে গেল!

'আমি স্বদেশবাবুর সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই অনেকক্ষণ বসে আছি।'

খাঁকির হাফপ্যান্টপরা সেই রোগা লোকটা কোন উত্তরই দিল না। বোধ হয় অনাবশ্যক বলে।

অসিত আরও অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। লোকটা কালা নাকি?

'শুনছেন, স্যার?'

স্যার বলার জন্য বোধ হয় লোকটা এতক্ষণে মুখ তুলে চাইল।

অসিত বুঝতে পারল উনি কেরানীকুলেরই কেউ হবেন। নতুবা স্যার শব্দে এত শীগ্‌গির বরফ গলার ত কথা নয়!

'দেরি হবে।' লোকট. গম্ভীর গলায় বলল।

অসিত বলল, 'দেরি ত হয়েছে। আর কত দেরি হবে সেইটাই বলুন।'

লোকটা একটা বিড়ি বের করে ধরাল। 'এ সব মশায় সরকারী কাজ, ঘোড়ায় জিন্‌ দিয়ে এলে হয় না।'

'কিন্তু আপনাদেরই-দেওয়া-সময় যে চলে যাচ্ছে।'

'যাক্‌, মশায় যাক্‌, 'সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়'। সময় ত মশায় যাবেই।' দার্শনিক বিভূতি ঘোষ জোরে বিড়িতে টান দিয়ে গল্‌গল্‌ করে ধোঁয়া ছাড়ল।

তা বিভূতিবাবুকে দস্তুরমত মান্যগন্য অফিসার বলেই মনে হয়। সাব্‌ জেলের হর্তাকর্তা বললেই চলে। সিপাইরা ওর জন্যে সব সময় তটস্থ।

বিভূতিবাবু উঠে কোথায় গেলেন।

একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে সেই বুড়ো সিপাইটি এগিয়ে এল অসিতের কাছে। তারপর ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলতে লাগল, 'বাবুজী, স্বদেশবাবুর তবিয়ৎ বহুৎ খারাপ আছে। বুখার হোতা হ্যায়।'

অসিত ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কবে থেকে?'

'সাত আট রোজ হো স্যকৃতা। লেকিন বড্ড কমজোরী হো যা রহেঁ।'

অসিত অবাক হয়ে বলল, 'ডাক্তার দেখছে না?'

'ক্যা কহতে হেঁ বাবুজী? জেলখানাকা ডাক্তার? ও বাত্ ছোড় দিজিয়ে আপ। হম্ বহুৎ দিনসে স্বদেশবাবুকো পহচানথা। উনিশ-শ' ত্রিশ সালসে। আলিপুর জেলমে থা। হাঁ, দেওতা আদমি আছে স্বদেশবাবু। এ বিভূতি বাবু হারামি আছে। হামেশা ঘুষ মাংগ্তা। দেখিয়ে, গবরমেণ্ট ভি ঘুষখোর হো গিয়া। আজাদিকো ঝুটা বনা দিয়া শালালোগ!

বিভূতিবাবুকে দূরে দেখতে পেয়ে চট করে সরে গেল সিপাইজী।

মাথা নিচু করে কাটা দরজা পেরিয়ে স্বদেশবাবু খুব আস্তে হেঁটে আসছিলেন। পেছনে রুল হাতে একজন সেপাই। বাবার পরণে চটের মত মোটা ডোরাকাটা জাঙ্গিয়া আর গায়ে বগলকাটা ফতুয়া।

অসিত চমকে উঠল। এই পোশাকে বাবাকে দেখার কথা সে ভাবতেও পারে নি। বাবার মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না সে। অসিত কি বলবে বুঝতে পারছিল না। বাবার শরীর এতো ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে যে চিনতেই কষ্ট হয়!

পিতা পুত্রেব মধ্যে অন্তরের স্নেহ যত গভীর থাক, ব্যবধান চিরদিনই দুস্তর।

স্বদেশবাবু হাসলেন। সে হাসি মৃত্যুর মত ম্লান, বিষণ্ণ।

অসিত আস্তে আস্তে বলল, 'তোমার পা ফোলা ফোলা লাগছে! ডাক্তার কি দেখেছেন?'

'ডাক্তার সবদিন আসে না। সপ্তাহে দু'তিন দিন। তা, তিনি দেখছেন।'

অসিত গম্ভীর হয়ে বলল, 'কি রকম দেখছেন?'

'অনেককে দেখতে হয় ত। আধ ঘণ্টায় ত্রিশ-চল্লিশ জনকে। তাতে যেমন হয়।'

অসিত কি ভেবে বলল, 'বাবা তোমার কেসটা নিয়ে আমি হাই-কোর্টে মুভ্ করতে চাই, করা দরকার। তোমার শরীর একেবারে ভেঙে গেছে। বোধ হয় অল্প অল্প জ্বর হয়। তাই না?'

স্বদেশবাবু নিঃশব্দে একটু হাসলেন। সত্যাগ্রহীকে আদালতে মামলা লড়তে নেই। যে সরকারের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ, তারই সঙ্গে কোনরূপ সহযোগিতা করা যে সত্যাগ্রহীর উচিত নয়, অসিত কি তা বুঝবে ?

'দেখি, হাতটা দেখি তোমার।' অসিত পাল্‌সটা দেখতে চাচ্ছিল একবার।

গোয়েন্দা অফিসার রূঢ় গলায় ধমকে উঠল, 'কাছে যাবেন না মশায়। গায়ে হাত দেবেন না।'

অসিত কঠিন স্বরে বলল, 'আমি ডাক্তার।'

'ডাক্তার ফাক্তার রাখুন মশায়। আইন ইজ আইন'।

'রোগীর চিকিৎসা না করাও আইন নাকি ?' অসিত গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল।

বিভূতি ঘোষ বলে উঠল, 'এ্যাঃ চিকিৎসা হচ্ছে না ? বলেন কি মশায় ? সিভিল সার্জেন রোজ আসেন। তিনি ত জেলার।'

অসিত বলল, 'যে সার্জেনই তিনি হোন্, বাবার চিকিৎসা হচ্ছে না এটা আমি বলতে পারি।'

স্বদেশবাবু অসিতকে থামিয়ে দিলেন। ক্ষীণ গলায় বললেন, 'থাক্, খোকা থাক্। ক'দিন আর বাঁচব। ওদের আইনগুলো ওদেরই থাক্। তা, তুই বাইরে যাচ্ছিস কবে ?'

অসিত ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল। বাবার এই সরলতাও তার অসহ্য। ঘড়ি দেখতে দেখতে বলল, 'আসছে সপ্তাহে যাওয়ার কথা। কিন্তু সব যে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে বাবা!'

কিছু খাবার নিয়ে এসেছিল অসিত বাবাকে দেবে বলে। গোয়েন্দা অফিসার তা দিতে দিল না। কেন দিল না, অসিত বুঝতে পারল না। কিন্তু বড় খারাপ লাগছিল তার। মনটা বেদনায় যন্ত্রণায় ভরে উঠছিল।

সময় হয়ে গেছে বলায় স্বদেশবাবু ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন।

অসিত বাবার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল, স্বদেশবাবুর চোখ দু'টো ছল ছল করে উঠছিল তখন।

বড় ক্লান্ত, বড় ভারাক্রান্ত মন নিয়ে অসিত জেল গেটের বাইরে এসে দাঁড়াল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সামনের ঝাউ শ্রেণী আর বালিয়াড়ির ওপর বিষণ্ণ ধূসর ছায়া বিছিয়ে পড়ছে এখন।

সামনে দিয়ে একজন ভিখিরী মেয়ে যাচ্ছিল। অসিত তাকে স্বদেশবাবুর জন্য নিয়ে যাওয়া সবগুলো খাবার দিয়ে দিল।

একটা অবিশ্বাসের চোখ নিয়ে ভিখিরী মেয়েটা তাকাল অসিতের দিকে! তারপর লোভীব মত সবগুলো খাবার নিয়ে চলে গেল।

অসিত কোন কথা বলল না। বলার ইচ্ছাও ছিল না তার। তাড়াতাড়ি রাস্তাটা পেরিয়ে এস. ডি. ও.র অফিসের সামনে এসে দাঁড়াল অসিত।

একজন লোক বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসেছিল। হাতে ঘড়ি মুখে সিগারেট।

অসিত একটু ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞেস করল, 'সাহেব আছেন অফিসে?'

'কেন? কি দরকার আপনার?' কথা বলার ভঙ্গীতে, ভাবে, যেন সে-ই এস ডি. ও.।

তা কেনাবাম চক্রবর্তী যে সে লোক নয়!

অসিত বলল, 'আমি একটু ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'আজ হবে না।'

'কিন্তু আমার খুব দরকার।'

কেনারাম চেয়ারে বসে বসেই কথা বলছিল। তেমনি সিগাবেট টান্‌তে টান্‌তে বলল, 'বললাম ত, আজ হবে না।'

'এখানে কোন পিয়ন বা চাপরাসী নেই?' অসিত গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করল।

একটু চমকে উঠল কেনারাম। হকৃচকিয়ে গিয়ে বলল, 'আছে।'

'তাকে দিয়ে এই শ্লিপটা পাঠিয়ে দিন তবে।'

আশ্চর্য! শ্লিপটা নিজে নিয়ে বসে রইল সে। ওঠার নাম-গন্ধও নেই।

অসিত ধৈর্য ধরতে পারছিল না।

এতক্ষণে কেনারাম বলল, 'বুঝলেন কিনা, এই আমরা কিছু পেয়ে থাকি। হেঁ হেঁ—'

অসিতের সারা শরীর জ্বলে যাচ্ছিল। ইচ্ছা করছিল, কপাটটা লাথি মেরে ভেঙে ফেলে সে।

সুয়িং ডোরটা খুলে ধরে অসিত জিজ্ঞেস করল, 'ভেতরে আসতে পারি?'

এস. ডি. ও.র কপালের রেখায় স্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন। তবু বললেন, 'আসুন।'

আলোচনা ক্রমশঃ উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। এস. ডি. ও. মান্‌তে রাজী নন যে, স্বদেশবাবুর চিকিৎসা ঠিক মত হয়নি।

অসিত বোঝাতে চাচ্ছিল, চিকিৎসা যা হওয়া উচিত, যে ভাবে হওয়া উচিত, তা হচ্ছে না।

এস. ডি. ও. বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কি করে বুঝলেন আপনি? অসিত বলল, 'বুঝলাম ওঁকে দেখে!'

'দেখেই বুঝতে পারলেন? যতো সব ঝামেলা!'

'হাঁ পারলাম। আমি একজন 'এম. ডি.' ডাক্তার।

এস. ডি. ও একটু নড়ে চড়ে বসলেন। কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, 'আচ্ছা, আপনি কাল ছু'টোয় আসুন। আমি জেলারের সঙ্গে কথা বলে রাখব।'

'অনেক ধন্যবাদ!' অসিত বেরিয়ে এল অফিস থেকে।

রাত্রি নেমেছে শহরের ওপর। ঝাউগাছগুলোর মাথায় দক্ষিণ সমুদ্রের শীতল হাওয়া কেমন একটা বিষণ্ন সুর একটানা বাজিয়ে চলেছে।

সুটকেশটা হাতে নিয়ে, ধীরে ধীরে সামনের পার্কে গিয়ে বসল অসিত। নির্জনে চুপ করে একটু বসে থাকা দরকার এখন।

নমিতার কথা খুব মনে হচ্ছিল তাব। এই বিপদের দিনে সে নিশ্চয়ই কোন যুক্তিপবামর্শ দিতে পারত। অসিত বুঝতে পারছে, এ ভার সে বোধ হয় বইতে পারবে না।

অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীবে অসিত সহজ হচ্ছিল, শান্ত হয়ে উঠছিল।

ডাকঘর থেকে হোটেলের ঠিকানা দিযে দু'টো জরুরী টেলিগ্রাম পাঠাল অসিত।

ঠিক দু'টোয় অসিত এস. ডি ও.ব অফিসে পৌঁছে ভীষণ অবাক হয়ে গেল। চাপরাসী কেনাবাম একেবারে বিনযে বিগলিত হয়ে বলল, 'আসুন, স্যার আসুন।' চেযারটা এগিযে দিল আজ।

অসিত হঠাৎ এই আবহাওয়া পবিবর্তনের কারণ বুঝতে পারছিল না।

'শুনেছেন স্যাব,' কেনারাম দু'চোখ কপালে তুলে বলল, 'মিনিস্টার নিজে ট্রাঙ্ককল কবেছিলেন আপনার বাবাব খববেব জন্য। হেঁ, হেঁ। কিছু মনে করবেন না স্যার, কালকে...মানে...।'

এস. ডি. ও. আজ নিজে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন। সিগাবেটেব টিনটা খুলে ধবলেন, 'প্লীজ।'

অসিত বলল, 'না ধন্যবাদ। আমি সিগারেট খাই না।'

ঘটনাটা এস. ডি. ও-ই সবিস্তারে বললেন। আজ সকালে অনারেবল মিনিস্টাব নিজে ট্রাঙ্ক কল্ কবেছিলেন স্বদেশবাবু কেমন আছেন জানাব জন্য। বললেন, চীফ মিনিস্টার ওঁকে ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছেন। বিকেল নাগাদ অর্ডারটা এসে যেতে পারে। আপনি ত মশায় গতকাল বললেন না, মিনিস্টারের সঙ্গে আপনার পরিচয় টরিচয় আছে। স্বদেশবাবু ওঁর খুব বন্ধু।'

অসিত গম্ভীর হয়ে বলল, 'মন্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় থাকার কোন 'আনডিউ অ্যাডভাণ্টেজ' আমি নিতে চাই না। বাবাও তা চাইবেন না।

আমি শুধু ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা চেয়েছিলাম—একজন অসুস্থ প্রিজনার যেটুকু পেতে পারেন, সেইটুকু মাত্র, তার বেশি নয়।'

এস. ডি. ও. বললেন, 'যাক এ সব। ফরগিভ এণ্ড ফরগেট।'

অর্ডারটা এসে গেলে বিকেল পাঁচটা নাগাদ ওঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে। নেহাত না হলে কাল দশটা নাগাদ। আর যদি কিছু সাহায্য চান, এই যেমন ধরুন হাসপাতালে সীট কি বরাবর কলকাতা নিয়ে যেতে চাইলে গাড়ীর ব্যবস্থা—সবই আমরা করে দেব। খড়্গপুর পর্যন্ত আপনি কিছু ভাববেন না।'

বিকেলে জেল গেটে যাওয়ার জন্য অসিত তৈরী হচ্ছিল। ঠিক সেই সময় নমিতার গলা শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল।

হাঁ, নমিতা এসেছে। নমিতা এখন তার সবচেয়ে বড় নির্ভর, সবচেয়ে বড় আশ্বাস। ওকে আজ খুব দরকার। কিন্তু সে কথা কি তাকে বলা যায়? না বলা যায়—নমিতা তার বিপদের দিনে চলে আসার জন্য সে খুশি হয়েছে, তৃপ্তি পেয়েছে, সান্ত্বনা পেয়েছে।

না, বলা যায় না!

দু'জনেই চুপ করে কয়েকটি মুহূর্ত দাঁড়িয়েছিল।

নমিতাই প্রথম কথা বলল, 'কেমন আছেন উনি?'

অসিতও সহজ হতে চেষ্টা করল। বলল, 'ঠিক বলতে পারছি না। আজ এখন বা কাল গভর্ণমেণ্ট ছেড়ে দিচ্ছে বাবাকে।'

নমিতা ব্যগ্র হয়ে বলল, 'তাই নাকি? কি করে ছেড়ে দিচ্ছে? আচ্ছা আমি যাব তোমার সঙ্গে?'

অসিত সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলল, 'আপত্তি নেই। তবে একটু বিশ্রাম করে নাও। কখন টেলিগ্রাম পেলে?'

'রাত্রে। ইস্, যা ভয় পেয়ে গেছলাম না?'

নমিতা পাশের ছোট ঘরটা দেখছিল। এই ঘরটা তারজন্য অসিত ঠিক করে রেখেছিল, যদি এসে পড়ে। এই নতুন জায়গায়, নতুন ঘরে অসিতের খুব কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। কেমন আশ্চর্য লাগছে তার। জীবনের নতুন স্বাদ, নতুন স্পর্শ।

দূরে উঁচু বালিয়াড়ির বুকে বিরাট বাদাম বনের ওপর সন্ধ্যার স্তব্ধ ছবি। কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে নমিতা একটা অজানা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এল।

হোটেলের চাকর দু' কাপ চা, খাবার বেখে যাচ্ছিল।

অসিত তাকে ডেকে বলল, 'ম্যানাজার বাবু আছেন? একটু বল, আমি যাচ্ছি।'

তারপর নমিতার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'খেয়ে নাও।'

নমিতা একটু সহজ হওয়ার জন্য চা খেতে খেতে হাল্‌কা সুরে বলল, 'ইস্‌, আমি কি তোমার গেস্ট নাকি? মনে রাখবে এখন থেকে সব রেসপনসিবিলিটি আমার। তুমি শুধু প্রেস্‌ক্রিপশন লিখবে। ব্যস, তোমার ছুটি।'

নমিতা নিজেই তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

চা খাওয়া শেষ হয়ে আসছিল। নমিতা একটু হেসে বলল, তোমার ঘরে গিয়ে বস একটু! আমি কাপড়টা পাল্টে আসছি।'

বালি-ঢাকা পথটা দিয়ে হাঁটতে বেশ লাগছিল নমিতার। গাড়ী-ঘোড়ার ভিড় নেই। আফিস কাছারি শেষে শহরের রাস্তা দিয়ে লোক চলেছে গ্রামের দিকে।

স্বদেশবাবু লোহার কাটা দরজাটা পেরিয়েই অসিত আর নমিতাকে দেখতে পেলেন। নমিতা এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল।

স্বদেশবাবু হেসে বললেন, 'তুমিও মা এসে পড়েছ? যাক্‌, তবে আমি বেঁচে যাব এ যাত্রা। আমি ত ভাবছিলাম, হঠাৎ ছেড়ে দিল। খোকা কোথায় নিয়ে যাবে, কি করবে আমাকে নিয়ে।'

নমিতা অসিতের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে হেসে বলল, 'কিন্তু সবকিছুই ত উনি করলেন। এস. ডি. ও.র সঙ্গে ঝগড়া থেকে শুরু করে হোটেলের সব ব্যবস্থা করা পর্যন্ত। আসলে আপনার এখনও ছেলের ওপর ভরসা হয় না।'

স্বদেশবাবু তেমনি হেসে বললেন, 'বুড়োরা মেয়ের ওপর ভরসা করতেই বেশি ভালোবাসে মা!'

অসিত একটা রিক্সা ডেকে বাবাকে ওঠাতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

সেই প্রকাণ্ড পাকা গোঁফওয়ালা বুড়ো সেপাইটি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

স্বদেশবাবু আস্তে আস্তে বললেন, 'চললাম তেওয়ারীজী। আর দেখা হবে না হয়ত। কতদিনের চেনা তোমার সঙ্গে,কত উপকার করেছ আমার।

নমিতা লক্ষ্য করল স্বদেশবাবুর গলার স্বর ভেজা ভেজা লাগছে।

'হাঁ, আইয়ে বাবুজী। কুছ দিনকে লিয়ে বাহার যাইয়ে। তবিয়ত ঠিক হোগা।'

'তবিয়ত? আর দরকার নাই তেওয়ারীজী। তবিয়তের আর দরকার নাই। আমাদের জমানা চলে গেছে! দরকারও ফুরিয়ে গেছে একালের।'

তেওয়ারী স্বদেশবাবুকে নমস্কার করে ধীরে ধীরে তার ডিউটির জায়গায় চলে গেল।

নমিতা বুঝতে পারছিল, বিদায়ের ভাষা এর জানা নেই। কিন্তু এই একটি নমস্কারে সে সব কথা বলে গেল!

রিক্সায় যেতে যেতে স্বদেশবাবু অন্যমনস্ক হয়ে উঠছিলেন। এই তেওয়ারী আলিপুর জেলে একবার পাগলা ঘণ্টি বাজবার সময় তাঁকে বাঁচিয়েছিল। নইলে সেদিন মরতেন কি বাঁচতেন কে জানে! সে আজ কতদিন হল! ভেতরে ভেতরে স্বদেশীদের ওপর খুব টান ছিল লোকটির। ওর নিজের ছেলেই বিয়াল্লিশের আন্দোলনে গুলীতে মারা গেল! ওর দুঃখের কাছে আমাদের দুঃখ কত ছোট!

কে খবর রাখে, এই স্বাধীনতার জন্য কত অচেনা অজানা লোক কত দুঃখ, বিপদ, অত্যাচার সহ্য করেছে! তবু তারাই ইতিহাসের উচ্ছিষ্ট হয়ে অবহেলায় কোথায় পড়ে রইল!

রিক্‌সাটা খুব আস্তে আস্তে যাচ্ছিল। স্বদেশবাবু দেখতে দেখতে যাচ্ছিলেন। প্রতিবার জেল থেকে বেরোবার সময় এই পথঘাট, গাছপালা আকাশ, সব কিছু নতুন মনে হয় তাঁর কাছে। মনে হয়, এই মুক্ত সন্ধ্যাটিকে তিনি জীবনে প্রথম দেখছেন আজ!

জেলের ভেতরে থাকলে এখন তাঁরা কম্বলের ওপর প্রার্থনা করতে বসতেন। অবশ্য এখন আব ক'জন! তবু পুরানো দিনের কর্মীরা এক জায়গায় নীরবে বসেন কিছুক্ষণ।

অবিনাশের গীতা মুখস্থ আছে। আবৃত্তি করত। অন্নদা, হরিহর, অনন্ত, ওবা কবে ছাড়া পাবে? আশ্চর্য! জেলখানাও কি করে একটা ছোট পবিবারের মত হয়ে উঠেছিল। অনন্ত কত যত্ন করত তাঁর। থালাটা ধুতে দিত না। হাত থেকে কেড়ে নিয়ে নিজে ধুয়ে দিত। আর সেই হারু সর্দার। কালো যমদূতেব মত চেহারাটা। ডাকাতির মামলায় জেল হয়েছে দশ বছরের। মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেবে কিছুদিন পরে। এই ডাকাত লোকটাই তাকে কত যত্ন করত! কাছে এসে বসে দু'টো ধর্মের কথা শুনতে চাইত!

জেল-জীবনেব যে অধ্যায়টা স্বদেশবাবু এইমাত্র শেষ করে এলেন, তার ছবিটা এই সন্ধ্যায় কেমন বড় করুণ হয়ে উঠেছিল।

॥ ৩১ ॥

সেদিন বিকেলে নমিতা স্বদেশবাবুর জন্য ফল কাটছিল। অসিত ঘরে ঢুকে বলল, 'ব্যস, এবার ছুটি।'

নমিতা অবাক হয়ে বলল, 'ওমা, কিসের ছুটি?'

'কেন? ঐ যে সেদিন তুমি বলেছিলে, প্রেস্‌ক্রিপশন লিখেই আমি খালাস। সেটাও আর বেশী দিন লিখতে হবে না। এবার নিশ্চিন্তে বাইরে যেতে পারব।'

স্বদেশবাবু কয়েক দিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠছিলেন। জ্বরটা চলে গেছে। এ বয়সে হার্টের অসুখ সামলাতে অবশ্য অনেক দেরি হয়।

নমিতা ফল আর এক কাপ গরম দুধ ওঘরে রেখে এসে হাসতে হাসতে বলল, 'তুমি খুব আনগ্রেটফুল কিন্তু! এতো করছি তোমার জন্য, অথচ বাইরে যেতে পারবে, এতেই খুশিতে মাটিতে পা পড়ছে না তোমার! আর আমি যে কতদিন একা একা থাকব? তখন?'

না, অসিত সে কথা সত্যি খুব একটা ভাবে না। নিজেকে নিয়েই যারা সম্পূর্ণ, যারা আত্মকেন্দ্রিক, অসিত কিছুটা সেই জাতের মানুষ।

স্বদেশবাবুর ডাক শুনে নমিতা ওঘরে উঠে গেল।

একটু পরে ফিরে এসে বলল, 'জ্যাঠা মশায় কি বললেন জান? তোমাকে নিয়ে যেন আমি একটু বেড়িয়ে আসি।'

সত্যি, কতদিন নমিতা মনে মনে অসিতের সঙ্গে একটু বেড়াতে যেতে চাইত! নির্জন পথে অসিতকে কাছে পেতে বড় লোভ হত তার। কিন্তু নীলাপুরে তা সম্ভব হয়নি। এমনিতেই অসিতকে নিয়ে তার সম্পর্কে কথা উঠেছিল। নমিতা অবশ্য এতে ভয় পায় না। ভালোবাসার হাতিয়ার এত ভোঁতা নয়! সে পাথর কেটে পথ করে নেয়, নিতে জানে। অসিতকে নিয়ে তার সব কলঙ্ক সোনা হয়ে ওঠে!

দু'জনে আস্তে আস্তে হেঁটে যাচ্ছিল। শহর পেরিয়ে দক্ষিণে বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেলেই দু'পাশে ধান ক্ষেত। শহরে কাজ শেষ করে লোকজন বাড়ী ফিরে চলেছে। কেউ কেউ ওদের দুজনকে ফিরে ফিরে দেখে গেল। অনেক দূরে দূরে গ্রামের নীল রেখা। ঐ গ্রামগুলো পেরিয়ে গেলেই সমুদ্র। বঙ্গোপসাগরের দীর্ঘশ্বাস এখন বালিয়াড়ি, বাদামবন, নারকেল শ্রেণীর নিঃসঙ্গ নির্জনতায় সায়াহ্নের শেষ স্পর্শ রেখে যাচ্ছে।

অসিত নমিতাকে দেখছিল। কী সুন্দর ওর চলার ভঙ্গী শুধু সুপুষ্ট কবরী, আনত মগ্ন চোখ দু'টি নয়, দীর্ঘ গ্রীবার মৃদু আন্দোলন-টুকুও যেন, অপরূপ ভাস্কর্যের সংগীতের মত! এত মর্যাদাবোধ, গাম্ভীর্য, সৌন্দর্য, সে সারা জীবনে আর কারুর মধ্যে দেখেনি! এত পরিণত, সুবিন্যস্ত উজ্জ্বল শরীরও তার বহুদিন চোখে পড়েনি। নমিতা এক আশ্চর্য সম্পদ, যে সম্পদ আজ তাকে পাগল করে তুলছে!

নমিতা মৃদু হেসে সুন্দর করে তাকাল। দেখল, ওর চোখে সেই প্রেমিক পুরুষের আলো, যার ছায়া প্রায়ই নমিতার মনের শান্ত উপকূলের ওপর পড়ে না।

অসিতকে নমিতার এ এক নতুন আবিষ্কার।

একটি সকাল বেলার সূর্যমুখী নির্ভয়ে, সূর্যের দিকে মুখ ফেরালো এবার।

নমিতা খুব আস্তে আস্তে বলল, 'আচ্ছা, বাইরে গিয়ে আমার কথা মনে থাকবে তোমার? সত্যি করে বল ত?'

অসিত কোন উত্তর দিল না। নৈঃশব্দ্যের মত সে আজ পরিপূর্ণ। শুধু গোপনে নমিতার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল। এ মুহূর্তে নমিতার চোখে জল ভরে আসছে!

হোটেলে ফিরেই অসিত একটা চিঠি পেল। কম্পাউণ্ডার লিখেছে, কাল সকালের জোয়ারে নৌকো থাকবে কালিনগরে। কাজেই নীলাপুর পৌঁছতে বড় জোর দশটা।

নমিতা কিন্তু চিঠিটা দেখে কেন যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। এই-ক'দিনের একটি সংক্ষিপ্ত, অসম্পূর্ণ ঘরকন্নার ওপর এবার যবনিকা নেমে আসবে। একটি মধুর সান্নিধ্যের স্বাদ এবার হারিয়ে যাবে! তারপরের অধ্যায়গুলি বড় অনুজ্জ্বল। অসিত বিদেশে চলে যাবে, সে ফিরে যাবে তার কোয়ার্টারে। নীলাপুরের সেই মরা নদী, বাবলা বন, অসিত ছাড়া এবার কি গভীর নিষ্ঠুর হয়ে উঠবে নমিতার সেই কথাটা কেবল ফিরে ফিরে মনে হচ্ছিল।

রাত বাড়ছিল ক্রমশঃ।

বিকেলে কয়েকজন কর্মী স্বদেশবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। অনেকক্ষণ ধরে কথা বলার জন্য তিনিও ক্লান্ত আজ।

খাওয়ার সময় কাছে বসেছিল নমিতা।

স্বদেশবাবু খেতে খেতে ধীরে ধীরে বলছিলেন, 'ঐ দূরে সেই শ্মশানটা, বাদাম বন আর বাঁশঝাড়ের মধ্যে। সবটাই বালু-ঢাকা। বিয়াল্লিশের আন্দোলনের সময় পুলিস মফঃস্বল থেকে 'পাখি শিকার' করে আনত। 'পাখি শিকার' কি জানো মা?—গুলী করে মানুষ খুন করা! এই যেমন করে শিকারী গুলী করে পাখি মারে, তেমনি করে পুলিশও নিরীহ লোককে গুলী করে মারত। মেরে হাহা করে হাসত! বৃটিশ সরকারের জয়ধ্বনি দিত! আর সেই মরা মানুষগুলোকে যেমন তেমন করে ময়নাতদন্তের পরে ঐ শ্মশানে পোড়াত। ওই শ্মশানটায় বহু শহীদের হাড় আজো বালির নিচে জমা আছে, মা! স্বাধীন দেশ সেসব খবর রাখেনা!'

নমিতা জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল, জ্যোৎস্নায় সারা শহর, বালিয়াড়ি, বাদাম বন ঢেকে গেছে। তার-ই একধারে বিস্তীর্ণ শ্মশানভূমি কেমন একটা ভয়ঙ্কর শূন্যতা নিয়ে শুয়ে আছে। তার মনে হচ্ছিল, ঐ বাদাম বনের শেষে পাহাড়ের মত উঁচু বালিয়াড়ির ওপর যেন একজন কাপালিক আজো বসে আছে, নরবলি ছাড়া যার পূজা শেষ হয় না!

মহাকাল হয় ত কাপালিক!

নমিতা ভয় পাচ্ছিল। আজ সন্ধ্যার সুরটা কি করে তার কাছে বড় বিষণ্ণ বেসুরো হয়ে উঠছে।

স্বদেশবাবু জ্যোৎস্না-ঢাকা শ্মশানটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। নমিতা ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে চলে এল।

অসিত কোথায় বেরিয়েছে। নমিতা তার ছাড়া সার্ট, পাজামাটা তুলে গুছিয়ে রেখে এল।

এই কাজগুলি করতে আজ বড় ভাল লাগছিল তার। হয়ত

ক'দিনের আতিথ্যটুকু বেলা নিভে আসার মত শেষ হয়ে আসছিল বলে!

নমিতা, অসিত ভাবতেই পারেনি, এতরাত্রে স্বদেশবাবু কষ্ট করে দেয়াল ধরে ধরে এ ঘরে আসবেন, বসে বসে দুজনের খাওয়া দেখবেন।

আজ এখন বড় খুশি মনে হচ্ছিল তাঁকে। কেমন যেন একটা গভীর স্নেহের আলো এই মুহূর্তে তাঁর মুখে ছড়িয়ে পড়ছিল।

অসিত ছেলে বেলায় কি কি খেতে ভালবাসত, প্রতিটি জিনিসের নতুন নতুন নাম দিত, স্বদেশবাবু তা আস্তে আস্তে সুন্দর করে হেসে হেসে বলছিলেন।

অসিতের বড় সংকোচ হচ্ছিল।

স্বদেশবাবু বলছিলেন, 'খোকা চেনা শব্দগুলোকে নিজের মত তৈরি করে নিত। আর ওর মা, আমরা সেই শব্দগুলোই মেনে নিতাম, নিজের কথায় ব্যবহার করতাম। হাঁরে, খোকা তোর মা'র কথা মনে পড়ে না? বড় কষ্ট পেয়েছে, বড় যন্ত্রণা সহ্য করেছে ওর মা।'

'স্বদেশীদের স্ত্রী হওয়া বড় দুঃখের মা! সারা জীবন জ্বলতে হয়, দুশ্চিন্তায় থাকতে হয়, দারিদ্র্য মেনে নিতে হয়। অবশ্য শেষেরটা ওর মাকে হয়ত ভোগ করতে হয়নি। কিন্তু অন্যান্য কর্মীদের ত দারিদ্র্য নিত্য সঙ্গী। ছেঁড়া আধ ময়লা খদ্দরের জামার ওপর ত কিছু পেল না ওরা! তবে নতুন যারা আসবে, এসেছে, তাদের কথা আলাদা। রাজনীতির সংজ্ঞাটাই আজ পাল্টে গেছে, পাল্টে যাচ্ছে। এখনকার রাজনীতি আর সততা, আদর্শ ত্যাগ, তিতিক্ষার দাবি করে না, ভবিষ্যতেও করবে না। যে কোন ভাবেই হক দল ঠিক রাখতে হবে, ভোট পেতে হবে, ক্ষমতা দখলে রাখতে হবে। এজন্য ন্যায়-অন্যায়ের, সত্য-মিথ্যার, হিংসা-অহিংসার, নীতি-দুর্নীতির প্রশ্ন অবান্তর। এ হ'ল নতুন দিনের রাজনীতি!'

অসিত ধীরে ধীরে বলল, 'এবার শুয়ে পড় বাবা। আজ বিকেল থেকে অনেক কথা বলা হয়ে গেছে তোমার। কাল সকালে আবার চলে যেতে হবে।'

স্বদেশবাবু হেসে বললেন, 'তা ঠিক, তা ঠিক। শরীরটাও কেমন বড় ক্লান্ত লাগছে আজ। নীলাপুরে ফিরে যেতে বড্ড ইচ্ছে করছে। আচ্ছা এক্ষুণি বেরিয়ে পড়লে হয় না? জোয়ার কখন? শেষ রাত্রে? কি যে হচ্চে বেসিক স্কুলটার!'

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে স্বদেশবাবু চুপ করে বসে রইলেন!

নমিতা বুঝতে পারছিল, স্বদেশবাবুর ঠিক উঠে যেতে ইচ্ছে করছে না এখন। আরও কিছুক্ষণ বসে বসে দুজনকে পাশাপাশি দেখতে চান উনি, দেখতে ভালো লাগছে ওঁর।

যে ভবিষ্যতের ছবির কথা উনি ভাবছেন. দেখছেন, সে ছবির কথা মনে হতে, নমিতা লজ্জায় লাল হয়ে উঠছিল।

এখন রাত গভীর। ওঘর থেকে ঘুমন্ত স্বদেশবাবুর নিঃশ্বাসের ক্ষীণ শব্দ আসছে। নমিতা আদৌ ঘুমোয়নি। কী স্তব্ধ, নিথর এই রাত্রির জগৎ! নমিতা বিছানা ছেড়ে উঠে এসে বারান্দায় দাঁড়াল। বালু ঢাকা জনশূন্য পথ, ঝাউশ্রেণী বাদাম বন মৃত জ্যোৎস্নায় ঢেকে গেছে।

অসিত? অসিত একটু আসে না এখানে? দুজনে দাঁড়িয়ে এই রাত্রির নির্জনতাকে দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না? দুজনে চুপ করে থেকে এই প্রশান্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না একটু? এই একটি অবিস্মরণীয় রাত্রি, যেখানে অসিত কাছে আছে, যেখানে অসিত একটি সমুদ্রের মত ভালোবাসার বিশুদ্ধ প্রতীক হয়ে আছে, সে রাত্রিকে জীবনের একটি নিভৃত নিবিড় পবিত্র সঞ্চয় করে তুলে রাখা যায় না?

নমিতা পা টিপে টিপে ওঘরে অসিতের বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অসিত ঘুমিয়ে আছে? ঘুমন্ত অসিতকে দেখতে কেমন

লাগে ? এই সুন্দর, উজ্জ্বল ঘুমিয়ে থাকা শরীরটায় তেমনি করে কি একটা ব্যক্তিত্ব, একটা দূরত্ব বেজে ওঠে ?

নিঃশব্দে মশারিটা তুলল নমিতা। খাটের একধারে বসল, বসে বসে দেখতে লাগল একটি নিদ্রিত মুখের কারুকার্য।

বড় লোভ হল নমিতার, বড় ইচ্ছে করল তার—এই মুহূর্তে সে অসিতকে একটু স্পর্শ করে। আস্তে আস্তে বলে, আমি তোমার জন্য আজ সারারাত ঘুমোইনি অসিত। আমার স্নায়ুর মধ্যে রক্তের মধ্যে একটা বিপ্লব ঘটিয়েছ তুমি আজ সন্ধ্যায়! আমি কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছি। অথচ যেতে চাই না!

কতক্ষণ চুপ করে বসেছিল নমিতা। হঠাৎ ওঘর থেকে একটা অস্বাভাবিক শব্দ ভেসে উঠল! একটা যেন করুণ আর্তনাদ! নমিতার ভয় হল। বড় ভয় হ'ল! একটু সময় কান পেতে রইল। তারপরই ব্যস্ত হয়ে ডাকল, অসিত ওঠো, ওঠো ?'

অসিত চমকে জেগে উঠল। কিছু বুঝতে পারলনা প্রথমে। তারপর দৌড়ে গেল স্বদেশবাবুর ঘরে। চীৎকার করে ডাকল, 'বাবা, বাবা ?'

কিন্তু একটা অবোধ্য স্বর ছাড়া আর কোন উত্তর ভেসে এল না।

অসিত এ ঘরে দৌড়ে এল।

নমিতা ব্যস্ত হয়ে বলল, 'আশ্চর্য! এম্পুলটা ভাঙতে এতক্ষণ লাগছে তোমার ?'

অসিতের হাত থর থর করে কাঁপছিল।

নমিতা দেখছিল, অসিত সিরিঞ্জে ওষুধটা ভর্তি করে উঠতেই পারছে না।

'প্লীজ বি ষ্টেডি,' অসিত! তুমি এত বড় ডাক্তার! তুমি না মৃত্যুর সঙ্গে লড়তে ভয় পাও না! তোমার কব্জির এত জোর....। অসিত নার্ভাস হোয়ো না।'

সিরিঞ্জের নিড্‌লের গা বেয়ে শুধু নয়, বিস্মিত নমিতা দেখল, অসিতের দুচোখ বেয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরছে!

সিরিঞ্জ তৈরী করে নিয়ে অসিত দৌড়ে ওঘরে গেল। কিন্তু ইন্‌জেকশন দেওয়া হল না। মৃত মর্মর মূর্তির মত অনেকক্ষণ খাটের কাছে দাঁড়িয়ে রইল সে !

স্বদেশবাবু জানালায় চোখ রেখে শুয়ে আছেন—যেদিকে রাত্রির ঘুমন্ত শ্মশানটা সম্পূর্ণ চোখে পড়ে। বহু অখ্যাত শহীদের পবিত্র অস্থি যে শ্মশানের বালু সরালে এখনও খুঁজে পাওয়া যাবে ! সে চোখ মৃত্তিকার মতই ভাষাহীন, মৃত, স্তব্ধ। ধীরে ধীরে রাত্রির শেষের প্রহরগুলি ঝাউবন আর বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে ভোরের দিকে এগিয়ে চলেছে। মাঠ গ্রাম পেরিয়ে দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস এই করুণ নিশান্তের বুকে কান্নার মত ক্রমশঃ বিছিয়ে পড়ছে !

॥ ৩২ ॥

জোয়ারের স্রোতে নৌকোটা নীলাপুরের দিকে ছুটে চলেছে। দুপারে বনঝাউর গাছগুলো আজো তেমনি নদীর দিকে তাকিয়ে ছিল। বিকালের বৈরাগী রোদ এখন দু'পারের মাঠে, গ্রামের গাছপালায়, জলের ওপর উদাসীন বিছিয়ে পড়েছে।

অসিত চুপ করে বসে আছে একধারে।

নমিতা ভাবছিল, সেই প্রথম দিনের কথা। সেদিন অসিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। ওরই নৌকোয় করে নীলাপুর যেতে যেতে, পরিচয় হল। তারপর সেই তিনটে নদী যেখানে মিলেছে, সেখানে ঘূর্ণিস্রোতে নৌকোটা টাল খেতে নমিতা পড়ে গেছল। অসিত বলেছিল, 'লাগল নাকি ?'

নমিতা বলেছিল, 'ও তেমন কিছু না।'

'কোথায় লেগেছে ?'

নমিতা আবছা অন্ধকারে হাতের আঙুলটা দেখতে চেষ্টা করল।

অসিত বলেছিল, 'আমি ডাক্তার, মিস্ দাশগুপ্তা।' তারপর ফ্লাস্কের গ্লাসে ডেটল জল করে রুমালটা ভিজিয়ে এগিয়ে দিয়েছিল।

সে আজ কতোদিন! তবু বড়ো উজ্জ্বল, বড়ো সুন্দর, বড়ো করুণ! কোথাও এতটুকু ধূলোবালি পড়েনি। পাথর কেটে কেটে যেন কেউ স্মৃতিব একটি অনিন্দ্য মূর্তি জীবনের দেয়ালে এঁকে গেছে।

নমিতা অসিতেব মুখের দিকে তাকাল। অসিত তেমনি নদীর দিকে চেয়ে স্থির বসে আছে। নমিতা গভীর স্নেহে নিজেই অসিতের হাতটা নিজের হাতেব মধ্যে টেনে নিল।

আজ নদী বাঁধবার দিন।

সকাল থেকেই কাজ শুরু হয়েছে। প্রায় তিন শ' কোদাল পড়েছে।

মাটি বইছেও প্রায় শ'তিনেক লোক। একধারে একটা পাল টাঙানো হযেছিল। তার নিচে ক্লান্ত রণজিৎবাবু একটু সময় বসেছিলেন। ছিল উমা, নীলা, রেখা। অরবিন্দের দেখা পাওয়াই যাচ্ছিল না।

হঠাৎ অসিত আর নমিতাকে নৌকো থেকে নামতে দেখে রণজিৎবাবু, উমা, নীলা ছুটে এল। ফেরার কথা ছিল গতকাল। দেরি হওয়ায় সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল।

কেউ কোন প্রশ্ন করল না। অসিতের চেহারা দেখেই সব বুঝতে পেরেছিল।

রণজিৎবাবু ভাবছিলেন, স্বদেশবাবু চলে গেলেন! নীলাপুরের একটা যুগের অবসান ঘটল।

অসিত দেখছিল, বি. ডি. ও. অফিসের সেই পিয়ন অর্জুন একটা বড় কোদাল নিয়ে দ্রুত মাটি কেটে চলেছে। দীর্ঘ শরীর বেয়ে দর দর করে ঘাম ঝরে পড়ছে। চক্‌চক্ করে উঠছে কোদালের ফলাটা।

অসিতের চোখে জল এল। ঠিক নীলাপুরের নতুন কর্মযজ্ঞের উদ্বোধন দিনে সে ফিরে এসেছে আজ। এই বেলা শেষের আলোর মধ্যে কংক্রীটের পুলটার পাশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ডি. ভি. সি'র ইলেকট্রিক থামগুলোর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ মাঠের মাঝ দিয়ে ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে নীলাপুরের দিকে।

আসছে নতুন সভ্যতার দূত, নতুন জনপদের জন্য। গড়ে উঠছে, গড়ে উঠবে নতুন ইতিহাস। সেই ইতিহাস রচনার জন্য নতুন শিল্পী আসুক, কবি আসুক—যে আঁকবে এই জনপদের কাহিনী, যে লিখবে নদীপারের ফেলে-যাওয়া চাষ-ঘরের কান্না নিয়ে, শীতের সকালের ধান-কাটা মানুষের আনন্দ বেদনা নিয়ে, নতুন উপন্যাস মৃত্তিকার সম্প্রসারিত ইতিহাসের নতুন পরিচ্ছেদ রচনা করবে যে!

রণজিৎবাবু ধীরে ধীরে বললেন, 'ঠিক সময়েই আপনাকে ফিরে পেলাম অসিতবাবু। আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।'

অসিত অবাক হ'য়ে ফিরে তাকাল।

রণজিৎবাবু আবার বললেন, 'হাঁ, আমাকে যেতেই হল শেষ পর্যন্ত। আমার ট্রান্সফারের অর্ডার এসে গেছে। এখন কয়েকদিন ছুটিতে আছি।'

অসিত নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল শুধু।

নমিতা আস্তে আস্তে বলল, 'এখন চল, অসিত।'

একটা গভীর বিষণ্নতার ছায়া নদীতীরে, মাঠে ঘনিয়ে আসছে।

একটু এগিয়ে গিয়েও অসিত আর যেতে পারল না। ততক্ষণে সকলেই ওর চারধারে ভিড় করে এসেছে। অরবিন্দের জামায়, মুখে ধুলো-কাদা ভর্তি। বোধ হয় নিজেই মাটি কাটছিল।

একি! রসময়ও কোদাল হাতে!

রসময়ের বন্ধু ফটকে চীৎকার করে বলে উঠল, 'কুরুক্ষেত্র লাগিয়ে দিলাম ডাক্তারবাবু'!

কোদাল হাতে অর্জুন বুক ফুলিয়ে এসে দাঁড়াল। সে যেন এ যুদ্ধের সেনাপতি।

নীলার মুখ ঘামে ভিজে আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। কোমরে আঁচল জড়ানো। তাহলে, সারাদিন নীলাও কাজ করেছে!

উমা? উমা কোথায়?

ক্লান্ত উমা একধারে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল।

আজ শুধু নন্দিতা নেই। নন্দিতার কথা বড়ো মনে পড়ছে। সেই নন্দিতা, যার গলায় এই দিনান্তের পড়ন্ত রৌদ্রের সকল বেদনা গান হয়ে বেজে উঠত!

অসিত দেখছিল, ক্রমশঃ শেষ রোদ নিভে আসায় নীলাপুরের মাটির ইতিহাসের পাতা ধূসর অস্পষ্ট হয়ে উঠছে। দূর প্রসারিত ধান ক্ষেতের, মরা নদীর, আর বাবলা বনের বিষণ্ণ পাণ্ডুলিপি আর এখন পড়া যাচ্ছে না!

এই ভালোবাসা, স্মৃতি, সম্ভাবনা, এই মানুষ, মাটি আর নির্মীয়মাণ ইতিহাস—এসব ছেড়ে কোথায় যাবে অসিত?

অসিত যেতে যেতে আবছা চোখে তাকাল—নীলাপুরের স্কুলের পাশ দিয়ে, বাবলা বন আর মরা নদীটা ডান দিকে রেখে শ্মশানটার ধার দিয়ে সোজা লোনা মাটির উঁচু রাস্তাটা বেসিক স্কুলের কাছ পর্যন্ত চলে গেছে। তারপর আর কিছু চোখে পড়ছে না। সারা আকাশে এখন আসন্ন সন্ধ্যার ধূসর বর্ণ বিছানো।

অসিত ধীরে ধীরে সেই উঁচু লোনামাটির রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল।